আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

নবম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড।

১৮৪০ শক—১৯১৯ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১৷৽ পাঁচ সিকা।

কলিকাতা।
৭৮নং অপার সার্‌কিউলার রোড.।
বিধান প্রেস।
আর্‌, এস্‌, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভূমিকা।

আচার্য্যের উপদেশ নবম খণ্ড ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। ইহাতে ঊনষাটটী উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইল। তন্মধ্যে বত্রিশটী উপদেশ নূতন—পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। নূতন উপদেশে ষ্টার মার্ক দেওয়া হইয়াছে। অষ্টম খণ্ডে ২৫৭ পৃষ্ঠায় "জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি উপদেশের" স্থান, কুচবিহার দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহাই ছিল। কিন্তু ইহা কমলকুটীর হইবে। সে সময়ে আচার্য্যদেব কলিকাতায় ছিলেন, কুচবিহার যান নাই।

কমলকুটীর,
৮ই জানুয়ারি, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ;
২৪শে পৌষ, ১৮৪০ শক। } গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
আমার আচার্য্যপদে নিয়োগ ঈশ্বর প্রদত্ত মনুষ্য প্রদত্ত নহে	...	১
চোরের ব্যবসায়	...	১০
সর্ব্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন *	...	১৭
সুখবেদ, দুঃখবেদ *	...	২৪
আধ্যাত্মিকতা	...	৩২
ঋষি ও ভক্ত *	...	৩৯
স্বর্গীয় অহঙ্কার	...	৪৭
ব্রাহ্মের তীর্থ	...	৫৪
মাতৃস্তন *	...	৬১
শ্লোকব্যাখ্যা *	...	৬৮
শ্লোকব্যাখ্যা *	...	৬৯
দুর্গতিহারিণী	...	৭১
দুর্গতিহারিণীর বিসর্জ্জন নাই *	...	৭৪
শারদীয় উৎসব	...	৭৯
দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথীবক্ষে	...	৮৫
ঈশ্বরের যন্ত্র	...	৯০
ভাই ভগ্নী	...	৯৭
ঈশ্বর আদরের সামগ্রী	...	১০১
ধার্ম্মিক সংসারী	...	১০৬

সূচীপত্র

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
প্রত্যাদিষ্ট	...	১১১
বিশেষ বিধান	...	১১৮
তপস্যার রহস্য *	...	১২৬
মনুষ্যজাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা *	...	১৩৩
সৃষ্টিবীজ *	...	১৪২
রসনা যন্ত্র	...	১৪৯
ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা (উনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব)	...	১৫৪
পুরুষ-প্রকৃতি ও নারী-প্রকৃতি	...	১৫৮
ধ্যানের উদ্বোধন	...	১৬৯
নামসাধন *	...	১৭১
পতিভক্তি		১৭৬
হরিদাস ও কড়িদাস	...	১৮১
প্রকৃতির ঈশ্বর	...	১৮৪
ভগবান এবং ভক্তদল *	...	১৮৯
উত্তরদাতা জাগ্রত ঈশ্বর *	...	১৯৪
শরীর ব্রহ্মমন্দির *	...	১৯৯
ভক্তদল বৃদ্ধি *	...	২০৫
একে দশ *	...	২১১
দ্বিজ *	...	২১৫
দলের মাহাত্ম্য *	...	২২০
বসন্তোৎসব *	...	২২৪

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ভবিষ্যতের সন্তান *	...	২৩১
দীক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ *	...	২৩৬
দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ *	...	২৩৮
পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে	...	২৪০
বিচিত্রতা	...	২৪৪
ঋণ পরিশোধ	...	২৪৯
সপরিবারে ব্রহ্মসাধন *	...	২৫৬
হাস্য ক্রন্দন *	...	২৬২
নিরাকার সাধন *	...	২৬৯
পরলোকবাসী সাধু *	...	২৭৬
দুই মুখবিশিষ্ট ঘট *	...	২৮৩
স্বর্গীয় কল্পনা *	...	২৮৯
নূতন দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ *	...	২৯৬
প্রেম *	...	৩০৩
ঈশ্বরপ্রেরিত	...	৩১০
নীচ আমি ও উচ্চ আমি *	...	৩১৭
ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ	...	৩২৩
সামাজিক উপাসনা *	...	৩৩০
ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক	...	৩৩৫

আচার্য্যের উপদেশ

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আমার আচার্য্যপদে নিয়োগ ঈশ্বর প্রদত্ত মনুষ্য প্রদত্ত নহে।

রবিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৮০০ শক ; ৫ই মে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ! যখন তোমরা গত রবিবার, প্রণয়ের সহিত প্রেমের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুনরায় গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কথা বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথা আজ শুনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দু পাঁচটী কথা বলিতে পারি; জীবনে সময়ে সময়ে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি, গূঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ একটী বিশেষ কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর আমাকে ডাকিলেন এবং এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সেই কথা শুনিলাম। সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ করা হইল, তখন ইচ্ছা

হইল যে, পাপে তাপে অধীর হইয়া সংসার-অরণ্য মধ্যে যাঁহাকে ডাকিব তিনি কোথায়, তিনি কেমন ভালবাসেন, সজীব ভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন একজনকে ধরিব, যাঁহাকে ধরিলে আমার জীর্ণ তরী ডুবিবে না। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, মনুষ্য নয়। তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস কর অনুরোধ করিতেছি। আমার দীক্ষাগুরু প্রার্থনা, এই প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পূজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম। সময়ে সময়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হইতাম। ইহাতে কি শিখিলাম? কখনও ঘরে কখনও ছাদের উপরে বসিয়া সরল ভাবে মানুষকে যেমন মানুষে জিজ্ঞাসা করে, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া জীবনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম।

অনেক সময়ে মানুষের প্রার্থনা কল্পনার ব্যাপার হয়; এজন্য আশানুরূপ প্রার্থনার ফল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রার্থনায় কল্পনা থাকিলে ঘোর বিপদ, সুতরাং প্রার্থনা বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, এই বিশ্বাসে পদে পদে গুরুকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। হইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবস্ত করা যাইতেছে, তাহা ঠিক ধর্ম্মের অনুমোদিত হইল কি না; যে সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে সেগুলি প্রকৃত কি না জানি না। উপধর্ম্মবাদিগণ গুরু ও ধর্ম্মপুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকেন, মানুষের উপদেশ শুনেন।

যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম সেই দিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল। সংসারের সুশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকটে লোকে শিক্ষা করে; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করে; কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহা জ্ঞানীর নিকটে জিজ্ঞাসা করে। ইহাতে সুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময়ে বিশৃঙ্খল হয়; সৎপরামর্শে অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান করে। এ সকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিবে? এই সকল ভাবিয়া ব্রহ্মের পাদপদ্ম ধরিলাম, তাঁহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয় মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলাম। পথে চলিতেও আবশ্যক হইলে তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতাম। তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। মানুষকে বারবার জিজ্ঞাসা করিলে সে বিরক্ত হয়, এত বড় মহান্ ঈশ্বরকে বারবার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব, এ ভাবিয়া সঙ্কুচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি যাহাতে বারবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়া যায়, তবে একজন ক্রমাগত পাঁচ বৎসর বিপরীত পথে চলিতে পারে এবং কল্পনার কাজ করিয়া পরিশেষে মহা বিপদে পড়িতে পারে। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময় পথে, ছাদের উপরে, ঘরে, বিপদের সময়, সম্পদের সময়, সংসারের কার্য্য করিবার সময়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার কাছে যাইতাম এবং তাঁহার কথা শুনিতে চেষ্টা করিতাম। তাঁহার উত্তর শুনিবার অভিপ্রায়ে

তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, উত্তর না পাইয়া ডাকিলে কেহ কি কখনও সুখী হয়? কাণাও যদি ডাকিয়া উত্তর পায়, তবে কি সে সুখী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিস চাই। যতক্ষণ না তাঁহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম।

প্রথমে ব্রহ্মের স্পষ্ট উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু বুঝিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অল্পে অল্পে অল্প অল্প তাঁহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময় এমন হইয়াছে, কোন স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে গিয়াছি। অমুক লোকের বাড়ীতে যাও বলিলেন, সেখানে গিয়া অমূল্য সত্য লাভ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছি।

ক্রমে জীবনের ইতিবৃত্তে দেখা গেল ছোট ছোট বিষয়েও ঈশ্বরকে ডাকা ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নূতন নূতন পথ দেখিতে পাইলাম। অনন্তর একটী ভারী ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টার পদ আচার্য্যের পদ পাইলাম। ব্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটী উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা। কোন মানুষ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে না। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে তাঁহারই স্বাক্ষর, যিনি ছাদের উপরে ঘরে আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কার্য্য করা একটী লোভের ব্যাপার। মনে করিও না, ইহার জন্য দুই পাঁচ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাসা করিলে, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে এই এই উত্তর

দেওয়া যায় কি দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব কি পড়িব না? অমুক কর্ম্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হাঁ কি না এইটী শুনিবার বিষয়। ক্রমে জীবনে শ্রবণের ব্যাপার আরও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। অনেকে এইরূপে সাধন আরম্ভ করিলে ক্রমে আদেশ শুনিতে পায়। সে যাহা হউক যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রমে ঈশ্বর সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপযুক্ততা নাই, এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি আমায় আচার্য্যের কার্য্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক না কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব? পথে ঘরে ছাদে যাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি, তিনি যখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকট ইহা ঘরের কথা বলিয়া মনে হইল। যিনি আমায় প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন দেন, তিনিই আমায় বেদীতে বসিতে বলিলেন, সুতরাং আমি ইহাকে ঘরের কথা মনে না করিয়া আর কি মনে করিব? উপাসনার সময়ে তাঁহার সঙ্গে যেরূপ বারবার কথা বলিয়াছি, সেই কথাই সকলকে বলিব। সুতরাং ঘরের কথা বলিতে আর সঙ্কোচ কি? আমি সাধারণও বুঝি না, গোপনও বুঝি না, যাহা বলিবার তাহা বলিব। আজ এই কথা বলিলাম ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ যদি চূর্ণ হয়, চারিদিকে গ্লানি নিন্দা হয় হউক, আমি সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। আর সত্যকে গোপন করিলে চলে না।

আমি যদি ব্রহ্মের ভৃত্য হই, তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হই, তাঁহার

অন্ন পান দ্বারা যদি আমার শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম জানাইলেন। অমুক স্থানে যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কর, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর, তিনিই আজ্ঞা করিলেন। সে কালে আমি তোমার কথা শুনিব না, এ বলিয়া তাঁহার সে আদেশ লঙ্ঘন করি নাই, এ আদেশটাও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি একটা আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম, আর একটা আজ্ঞা ছাড়িব কি প্রকারে? যিনি ধন ধান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এইজন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিব? আমার মানুষের কথায় প্রয়োজন নাই। মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে। আমি কোন দিকে তাকাইব না। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাঁচনের কথা। যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাঁচিব, যদি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না বাঁচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। মরিব না, বাঁচিব এই স্থির করিয়া বলিলাম, "যে আজ্ঞা প্রভু, আমি তোমার আদেশ পালন করিব।" বাঁচিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর্ম্ম করিতে হইবে। নিয়োগ পত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়, আমায় প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। তত বড় প্রকাণ্ড ভার কি প্রকারে সম্পাদন করা হইবে? ঘটী হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা দূর করা যেমন সহজ, ইহাও তেমনই সহজ। এত বড় ভার একটী ছোট ভাণ্ড হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার হইল, বুঝি

ভারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে। যখন ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে আসিল ভাবনা কি? কাজ অত্যন্ত ভারি হইল, এ কথা শুনিয়া দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন, "আমি ভারের কাজ করিব।" যদি তিনি না করেন, মৃত্যু। মনে হয় এটী একটী প্রকাণ্ড ভার। এত বড় একটী সমাজ সংস্কারের কার্য্যে অনেক জ্ঞান চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম্ম চাই। এ সকল কথা কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনই সহজ।

ফলতঃ প্রচার করিব, না হয় মরিব, এই মূল কথা। এই প্রচার যত্নসাধ্য নহে; সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমি ত ইহার উপযুক্ত নও, তোমার তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনই ইঙ্গিত হইল "এ কথা ফাঁকি দিবার কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না।" এই কথা বলিয়া কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না। যদি অনুপযুক্ত হই; তবে আমার কি, নিয়োগকর্ত্তার দোষ। বেদী হইতে আমি যাহা বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক সুখ্যাতি কি অখ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয়, আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এ সকল কথার প্রয়োজন কি, এ প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর ভবিষ্যতে লোকে বুঝিবে।

যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটী যোগ্যতা আছে, এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না, আমি ভালবাসি। যে ভালবাসে সেই চাকর হয়। ভৃত্য হইলেই ভালবাসিতে হয়। লোকে ভৃত্যকে ভালবাসে ভৃত্যও প্রভুকে ভালবাসিয়া থাকে। সময়ে সময়ে ভাবি আর মনকে বলি, মন, তুমি ঠিক করিয়া বল দেখি, তুমি কি ভালবাসিয়া মরিতে পার? ভালবাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ উজ্জ্বল আছে। শক্র আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমণ করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভালবাসা যায় না; প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরতা কি, সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ববিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর স্বভাব বল যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। আমি এ ভালবাসা মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভালবাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে ভাই ভাবিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার যাই কর, কার্য্যে থাকিতেই হইবে। যদি তোমরা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পার, ঐ অমুক ব্যক্তি কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহার পূজা

করিব। তাঁহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাঁহাকে আপনি বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই তোমরা একটী কাজ করিও আর একজন যে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে। যতদিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে যতদিন রক্ত আছে, ততদিন দস্যুর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগিনীগণকে সমর্পণ করিব না। আমা অপেক্ষা বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে বলিয়া দাও, দেখ আমি তাহাকে সমুদয় ভার দিই কি না? আমি তোমাদিগের নিকট ঋষি বা মহর্ষি চাই না, তোমাদিগের দুঃখ দেখিয়া কাঁদিবে, প্রচারকগণ এবং তাহাদিগের পরিবারের মুখে যদি অন্ন না যোটে তবে কাঁদিবে এমন একজন চাই। যদি বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে, আমার অস্থির মধ্যে শোকের চিহ্ন আছে কি না? প্রাণেশ্বর যদি বলেন অমুককে তোমার স্থানে প্রেরণ করিলাম, অমনই আমার জীবন শেষ হইবে, প্রাণত্যাগ করিব, আমার কর্ম্ম কাজ তখনই ফুরাইবে। আর একজন আমার ভাই ভগ্নীদের জন্ম কাঁদিবে ইহা বুঝিলেই আমার সমুদয় কার্য্য শেষ হইল।

দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কার্য্য করিতে কার্য্যালয়েও যাই না। আমি যখন বসিয়া থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে শয়ন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্নী কে কোথায় রহিলেন, কাহার কি অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার ভাবিবার বিষয় আর কি আছে? আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই। বল আমি চাব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া

কি করি? কেবল আমার হৃদয়ের পুতুলগুলিকে সাজাই, কাপড় পরাই, প্রাণের ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ন আমার মাণিক বন্ধুগণ। রাত্রি দুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ধুগণকে তবু যাইতে দিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় একাকী কি প্রকারে থাকিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয় আমি কাহাকেও বলি না। ভাইয়েরা দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাঁহাদিগের ভাবনা ভাবিয়া কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্য লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্য লোকের সুখে সুখ, এই আমার সুখ এই আমার কার্য্য। এইজন্য এখনও আছি, এইজন্য এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের আজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখনও ঠকিতে দিব না। কেন না আমার এ ঘরের কথা। আমার এ কথাতে তর্ক বিতর্ক আসিতে পারে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য্য করিব—একজন ভালবাসে এই সম্পর্কে। কেহ অহঙ্কারী বলিতে চাও বল, তবু এ কথা বলিতে ছাড়িব না। আমার ঘরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গের কথা, তাই এ কথা বলিলাম।

চোরের ব্যবসায়।

রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৮০০ শক; ১২ই মে, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

স্থল বিশেষে মনের কথা খুলিয়া বলাতে দোষ নাই। যখন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা যত ছিল, তাহার একজন

বাড়িল; যত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহার একজন বৃদ্ধি হইল। ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, ইহার ফল যাহা হইবার তাহা ভবিষ্যতে হইবে, তবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু একজন চুরি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্দেহ নাই—বলের সহিত বলিতেছি, কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে না; নিশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে না। ইহার সাক্ষী শত্রুগণ এবং মিত্রগণ। শত্রুদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথা সত্য। একজন ভারি প্রবঞ্চক যশোমান লাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার ইচ্ছায়, আপনার ঐহিক অভাব মোচন করিবার জন্য, নানা প্রকার কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে। একজন লোক নানা প্রকার নিগূঢ় কৌশলে গূঢ় ভাবে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ নামে কখন বিনামী করিয়া লোকের হৃদয় চুরি করিতেছে। শত্রু মিত্র দুয়ের কথা ভিন্ন প্রকার কিন্তু মূলে এক। শত্রুরা একজন চোরের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যে ব্যক্তি কপট ধূর্ত্ত বিষয়ী, যাহার ভিতরে এক, বাহিরে এক, সংসার অন্তরে, বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশ ভূষার বাসনা, বাহ্যিক শোভাতে যোগী এবং ধার্ম্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা, মস্তক অবনত, সুতরাং শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভক্ত এবং যোগী বলিয়া গণ্য; ভিতরে বিষয়ের গরল, বাহিরে নিস্পৃহের ভাব। ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ, সংসার লক্ষ্য। এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন্তু অন্য ভাবে, অন্য লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়।

আমি আমাকে চোর বলিতেছি, বিরোধীদল যে চোর বলিতেছে তাহাদের কথা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি যথার্থ কোন্ প্রকারের চোর তাহার বিচার ভবিষ্যতে হইবে। এই বেদী হইতে সাব্যস্ত করা যাইতেছে, একজন চোরের জন্ম হইয়াছে। শত্রু মিত্র, এই দুই দলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে পারি; আমার দ্বারা চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কিরূপে কি কৌশলে চুরি করিব চিত্ত ভাবিতে লাগিল। চোরের ব্যবসায় চোরের কৌশল লইয়া কোন্ স্থলে কিরূপে কার্য্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্তা হইল। একটী অভ্যাস ছিল, সেটী এই; ব্রহ্ম বলিয়া একজন আছেন, তাঁহার মুখ দর্শন করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিতাম, ঈশ্বরের নিকট উত্তর শুনিতাম। আজ বলিতেছি। তাকাইতাম আর এখানে ওখানে উপরের দিকে সমক্ষে পশ্চাতে সুন্দর মুখ দেখিতাম। ঈশ্বরের মুখ চিরসুন্দর। কলিকাতা সমাজে বিষ্ণু গান করিত "ভুলো না চিরসুহৃদে।" চিরসুহৃদ কে? আমরা কি তাঁহাকে দেখিতে পাই না? মানুষ নন, নিরাকার, ইহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু "ভুলো না চিরসুহৃদে" যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, দেখি তিনি কাছে কি না? চক্ষু তুলিলাম, একজনার মুখ দেখিলাম, সে মুখ আর ভুলিবার নহে। মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভুল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি ইহা যেমন সত্য বলিয়া মানি, এ মুখ দেখা যায় আমি তেমনই সত্য বলিয়া মানি। এই সেই মনোহর রূপ ঘরের মধ্যে, ঘরের কোণে, সমক্ষে নিকটে। সেই এই মুখ জীবনের বস্তু, সেই এই শীতল সুকোমল পদ জীবনের সার ধন। এই মনোহর জিনিস আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের ভিতরে রাখিয়াছি।

ঈশ্বর দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। ছেলে মানুষের মধ্যে প্রথা আছে একজন আহ্লাদিত হইলে দশ জন আহ্লাদিত হয়। একজন যদি হাঁ করে, আর দশ জন দর্শক অজ্ঞাতসারে হাঁ করে। একজনের মুখ ম্লান হইলে তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখ ম্লান হয়। তেমনই যদি একজনকে হাসিতে দেখা যায়, নিজের মুখও হাসি হাসি ভাব ধারণ করে। যখন দেখিলাম সেই মুখ কখন কখন ঈষৎ হাস্যযুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মনোবিজ্ঞানের নিয়মে ঈষৎ হাস্যের ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মুখ হাসিতেছে, সুতরাং আমার মুখও হাসিল। সার কেবল এই হাসিমুখ। এই মুখ দর্শনেই চুরির কৌশল শিখিলাম। মুখ দেখিলাম দেখিয়া সুখী হইলাম। এই মুখ দেখিবার জন্য চুরি করিতে হয়, চৌর্য্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয়। পৃথিবীর ইহাতে সায় নাই। কেবল বিপদকালে নিকটে বসিয়া বলিলাম, "মুখ দেখাও" "আর একটীবার দেখাও।" দুঃখ বিপদে সন্তপ্ত প্রাণে তোমার কাজ ভাল লাগে না তোমাকে দেখিতে চাই। যাই আনন্দ-মুখ দেখিলাম, চক্ষু হইতে জলধারা পড়িল, প্রাণ শীতল হইল, অত বিপদ দুঃখ ভুলিয়া গেলাম। যাহাতে দর্শন ঘনীভূত হয় তাহার উপায় ধ্যান তপস্যা যোগ। কিন্তু এ সংক্রান্ত একটী কথা আছে। আমার অনেকক্ষণ দর্শন হয় নাই, দীর্ঘকাল তাঁহার দিকে তাকাইতে পারি নাই, নৈমেষিক দর্শন হইয়াছে। একবারে একটী নিমেষ, পল বা অর্দ্ধ মিনিট দর্শন হইল আর হইল না। ইহাতে বোধ হয় দর্শন পলকের জন্য হয়, দুই ঘণ্টা পাঁচ মিনিট দুই মিনিটের জন্য হয় না। কিন্তু ঐ যে পলকের মত দর্শন, ঐ বিন্দুই সিন্ধুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন্ন মনুষ্যের হয় না, পাপী জীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ,

ইহাই বহুমূল্য রত্ন। একটীবার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়। এইরূপ একবার দুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সঞ্চার হয়; জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই সুখ সকলেরই অর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁহার কথা শুনাও উচিত, তাঁহাকে দেখাও উচিত। দেখা শুনা, শুনা দেখা, একবার দেখা, একবার শুনা, একবার রূপ দর্শন করিলাম একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিলাম, এই দুটী ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র হয়। দর্শনের কথা বলিতেছি, কিন্তু ইহা কি দুর্লভ? এই যে তিনি আছেন ইহা যদি বলিতে না পারিলে তবে দর্শন বহু দূরে। বিনা চেষ্টায় এখনই যদি বলিতে পার এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আর তিনি চলিয়া গেলেন। বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু ভক্তি-চক্ষে এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়।

এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আনিয়া মত্ত করিতে হইবে, সুখী করিতে হইবে। এই আনন্দ এবং মত্ততার মধ্যে সকল কাজ করিয়া লওয়া যায়। পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে মিলিয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, দুর্ব্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হইয়া কেহ সে কথা শুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু হইল না, আস্তে আস্তে নিগূঢ় ভাবে দুই জন পাঁচ জন দশ জন কুড়ি জনকে অধিকার করা গেল। বিনামে অধিকার করা হইল। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, প্রেম, মিষ্ট সম্ভাষণ—এইরূপ একটী প্রকাণ্ড জাল বিস্তৃত হইল। যাঁহারা সংসারের রাজ্যে পথিক, তাঁহারা একজন দুই জন তিন জন

করিয়া ক্রমে জালে পড়িলেন। কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে, কিন্তু আজও তাঁহাদের পায়ে জাল লাগা আছে। এই জালে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে দূরে আছেন, এবং তাঁহারা জানিতেছেন না যে, কেহ তাঁহাদিগের কিছু চুরি করিতেছে। জীবন আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, একজনের হস্তে এখনও সকলে আছেন, ইহাও তেমনই নিশ্চিত বিশ্বাস। এটী অভ্রান্ত মত যে কেহ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। একজন লোক চুরি করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক বা না হউক, সকলের উপরে চুরি চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সুখ আছে। প্রেম লোকের মন চুরি করিতেছে। তাহারা ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিষয়ে ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাব তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে।

ঈশ্বর চোরের কার্য্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহায়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই যে এ চুরি বন্ধ করিতে পারে। চোরের কার্য্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কার্য্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জন্য? এইজন্য যে, জানি যে, যে একবার পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলি করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া কি করিবেন? প্রত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক—এ কথা নিশ্চয় যে দলাদলি স্থাপন করিতে পারেন না। কোন্ কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যদি মনে হয় যে, তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন, জানিও যে তাঁহারা ঘরের বাহিরে গেলেন না,

ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহস্র ক্রোশও কেহ চলিয়া যান যাউন, কস্তু পদ বান্ধা রহিয়াছে। প্রেম দ্বারা ঈশ্বর যাহাদিগকে ধরিয়াছেন, তাহারা কোনরূপে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। একবার যাহারা পরিবারের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহারা সে সূত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছে তাহারা প্রেমের নামে ঈশ্বরের নামে এক একজন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন এবং তাঁহারা চুরি করিয়া সকলকে বদ্ধ করিবেন। যাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারা কখনও পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার যাহা বলুক প্রাণ ইহা কখনও স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখনও শত্রু হইতে পারে না। চোরের ভাগ্যে এইজন্য সর্ব্বদা আহ্লাদ। যাহারা আপনাদিগকে শত্রু বলিবে তাহারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া আছে, সে কিরূপে ভিন্ন হইবে? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের সঙ্গে বিবাদ করিবে? আমি আমার কখনও পর হইতে পারি না। যিনি একবার বদ্ধ হইয়া হৃদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বাহিরে বিদায় হইয়া গেলেও বক্ষঃস্থলে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ আছেন, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহদ্ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। যিনি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, দূরে গেলেন, তাঁহাকে কি ছাড়া যায়, তিনি চিরদিনের জন্য বক্ষে বদ্ধ আছেন। চুরির শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে না। ব্রহ্মনামের সুধা জগতের লোককে দিয়া প্রমত্ত করিয়া তাহাদিগের চিত্ত হরণ কর, দেখিবে

ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি ব্রাহ্মের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন থাকিবেন।

সর্ব্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন। *

রবিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক ; ২রা জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দুজাতির একটী কলঙ্ক আছে। এটী কলঙ্ক কি গৌরব তোমরা বিচার করিবে। হিন্দুজাতি সকল কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্ম সংযুক্ত করে। অন্য জাতীয় লোকেরা হিন্দুগণকে এই বলিয়া উপহাস করে, নিন্দা করে এবং ঘৃণা করে যে, উহারা সকল কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মকে সংযুক্ত করে। ইহাদিগের উঠিতে ধর্ম্ম, বসিতে ধর্ম্ম, খাইতে ধর্ম্ম, শুইতে ধর্ম্ম, সকল কার্য্যেই ইহাদিগের ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান, সময়, অবস্থা, ক্রিয়া, সকলের সঙ্গেই ধর্ম্ম সংযুক্ত আছে। ইহা কলঙ্ক কি গৌরব সহজে সিদ্ধান্ত করা যায়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিচার করা হইবে না। হিন্দুজাতি সম্বন্ধে এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে উহা সত্য কি না তাহাই বিবেচনা করা যাইবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান হইতে রাত্রে পুনরায় শয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যে হিন্দুগণের ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের মালার সঙ্গে সূতার যেরূপ যোগ, ইহাঁদিগের ধর্ম্মের সঙ্গে সমস্ত সাংসারিক কার্য্যের তেমনই যোগ। উঠিতে মন্ত্রপাঠ, বসিতে মন্ত্রপাঠ, প্রাতে গাত্রোত্থান করিতে যাইবেন তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণ, অবগাহন করিতে তাহাতে মন্ত্রোচ্চারণ। বস্ত্র পরিবর্ত্তন, স্থান পরিবর্ত্তন, গৃহ পরিবর্ত্তন, সংসারের সমুদয় অনুষ্ঠান ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত। ঋণ গ্রহণ করিয়া

পরিশোধ করিবেন তাহাতেও ঠাকুরদিগকে নৈবেদ্য দান। বিপদে পড়িলে হরিনাম, সম্পদে হরিনাম। সন্তানের মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিতে দেবতার নাম, সন্তান পীড়িত হইয়া কষ্ট পাইলে ঈশ্বর স্মরণ। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, গৃহের অতি সামান্য কর্ম্ম, কিছুই ধর্ম্ম দ্বারা অচিহ্নিত নাই। তন্ত্র মন্ত্র ছাড়া হিন্দুগণের কিছুই হয় না। শরীর মন তাঁহার সকলই ধর্ম্ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ। জল বায়ু অগ্নি হিন্দুর নিকটে কিছুই ধর্ম্মের সংশ্রব ছাড়া নহে। দুই বিষয়ে ধর্ম্মকে উপেক্ষা কর, আর পঞ্চাশ বিষয়ে ধরা পড়িবে। নাস্তিকতা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও, জীবন আস্তিকতার নিকটে বিক্রয় করিতে হইবে। যদি হিন্দু নাম লইলে তবে ধর্ম্ম ছাড়িয়া হিন্দু হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মের বন্ধন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। যে দিকে যাইবে, যে পথে যাইবে, তোমাকে ধর্ম্মের নিয়ম অবলম্বন করিতেই হইবে।

হিন্দুগণের ধর্ম্মের এ প্রকার বন্ধনটী ব্রাহ্মগণকে অনুকরণ করিতে হইবে। এটী উপহাসের ব্যাপার নহে, গৌরবের ব্যাপার। মানুষ যদি আপনাকে এরূপে ধর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ করিতে পারে, তবে তদপেক্ষা আর উচ্চভাব মহদ্ভাব কি হইতে পারে? উঠিবার সময়ে ধর্ম্ম সাধন করিব, বসিবার সময়ে ধর্ম্ম সাধন করিব, সংসারের যত কিছু কার্য্য সকলেতে ধর্ম্ম সাধন করিব। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতে সকল সময়ে হিন্দুগণের এই বিশেষ ভাবটী জীবনে গ্রহণ করিব। এক সময়ে ছিল একবার ঠাকুর ঘরে গিয়া দশটার সময়ে কার্য্যালয়ে বাহির হইলাম, পাঁচটার সময়ে কার্য্য হইতে ফিরিলাম, হয় ত সন্ধ্যার সময়ে আর একবার উপাসনা করিলাম, সমুদয় রাত্রি নিদ্রাতে গেল। এখন আর একবার দুইবার ঠাকুর ঘরে গেলে চলিবে না।

যৌবনকালে ধর্ম্ম সাধনের সময়ে ধর্ম্ম ছিল, সংসারের সময়ে সংসার ছিল। এখন বৃদ্ধকালের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে। যখন বার্দ্ধক্যের সময় আসিল তখন ঠাকুর ঘরের সঙ্গে সমস্ত সংসার সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রহ্মেতে অবগাহন করিবেন, শয়ন ব্রহ্মের ক্রোড়ে ব্রহ্মের পদতলে করিবেন। পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে ছিল সংসার হইতে গিয়া উপাসনা করা, এখন জীবনব্যাপী ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। যে ধর্ম্ম ইহলোক পরলোকব্যাপী, সে ধর্ম্মকে কখনও প্রতিদিন দুই ঘণ্টা বা রবিবারে আবদ্ধ রাখা যায় না। দিবসের প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মের অনুসারে করিতে হইবে, কখনও অব্রাহ্ম ভাবে কোন কার্য্য করা হইবে না।

হিন্দুগণ যেরূপ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় কার্য্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্পাদন করেন, আমাদিগকেও ঠিক সেইরূপ সকল কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে করিতে হইবে। গঙ্গাস্নান করিতে যাইবে ঈশ্বরের কথাতে, সংসারের প্রত্যেক কার্য্য করিবে ঈশ্বরের কথাতে। ব্রাহ্মের নিকটে ব্রহ্মের আবির্ভাব বিনা কোন ব্যাপার সিদ্ধ নহে। হিন্দুগণ গঙ্গাকে দেবতা বলিয়া মানে, কিন্তু তোমাদের নিকটে গঙ্গা ব্রহ্মের আবির্ভাবে সাক্ষাৎ পবিত্র-সলিলা হইবেন না কেন? জল শরীরের পক্ষে আবশ্যক। জল স্পর্শ করিলে শরীর শুদ্ধ হয়, তৃষ্ণা শান্ত হয়, শরীর মন সুশীতল হয়। সেই জল সেই সুশীতল বারি যদি ব্রহ্মময় না হইল, তবে সকলই বৃথা। যখন সেই জল ব্রহ্মময় হইল, তখন সেই জলে স্নানাবগাহন করিয়া ব্রহ্মসংস্পর্শে গাত্র শুদ্ধ হইল, শরীর মন সুশীতল হইল, শান্তি সুখ

লাভ হইল। হিন্দুধর্ম্মে গঙ্গা সম্বন্ধে যদিও কুসংস্কার সংযুক্ত আছে, কিন্তু ঐ কুসংস্কারে আশ্চর্য্য সত্য নিহিত আছে। গঙ্গা দেবাদিদেব হরিপাদনিঃস্থত, তাই গঙ্গাজলের এত মহিমা! যে জল হইতে শরীর শুদ্ধ, তৃষ্ণা শান্ত, মন প্রসন্ন হয়, সেই জলে সাধক ব্রহ্মের পদসংস্পর্শ অনুভব করিবেন না, তবে তাঁহার সাধন কি হইল? গঙ্গা, তুমি ব্রহ্মের আবাসস্থল; জল, তুমি ব্রহ্মের ভিতরে ব্রহ্ম তোমার ভিতরে বাস করিতেছেন। অগ্নির ভিতরে ঈশ্বর, সূর্য্যের ভিতরে ঈশ্বর, উত্তাপের ভিতরে ঈশ্বর। সেই উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়াছি, পথমধ্যে বটবৃক্ষ ছায়া দান করিল। সেই ছায়া মধ্যে ঈশ্বরের নাম অঙ্কিত আছে। বটবৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, বটবৃক্ষ, এ তোমার ছায়া নহে ইহা ব্রহ্মের পদচ্ছায়া। প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সুশীতল ছায়া লাভ করিলাম, ইহার ভিতরে কি ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই? প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া সুশীতল ছায়া সম্ভোগ করিলাম, ইহাতে আমি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সে সুখ সম্ভোগ করিব কি প্রকারে? বায়ু আসিল, বায়ু আসিয়া আমার সেবা করিল। সেই বায়ুকে বন্ধু বলিব না কি প্রকারে? ঈশ্বরের প্রেরিত মহাজনগণ! তোমাদের ভিতর হইতে যে তাঁহারই প্রেম তাঁহারই করুণা আলিঙ্গন করিতেছে।

হিন্দু কিছুই ছাড়িলেন না, সকল বস্তু সকল বিষয়কে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করিয়া একটী ভয়ানক ফাঁদ পাতিলেন। তাঁহাদিগের নিকট অগ্নি দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, বৃক্ষ দেবতা। ফল ফুল পাতা সকলই বিশুদ্ধ সকলই পবিত্র। ক্রমে ক্রমে কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইল, দেব দেবীর সংখ্যা বাড়িল। আমরা ব্রহ্মকে মধ্যস্থলে

রাখিয়া হিন্দুভ্রাতার বক্ষঃস্থল হইতে তাঁহার ধর্ম্মভাব লইয়া তাঁহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু, বৃক্ষ পত্র ফুল ফল সমুদয় কেবল ব্রহ্ম দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিব। কোন বস্তু স্পর্শ হইবে না যাহাতে ঈশ্বর নাই। কেবল ঘটনাগুলি ঈশ্বরের হস্ত হইতে আইসে তাহা নহে, সংসারের প্রত্যেক কার্য্য পরব্রহ্ম স্বয়ং করিতেছেন দেখিতে পাইব। যাহা কিছু হাতের ভিতরে, ধর্ম্ম তাহারই মধ্যে, ধর্ম্ম কিছু দূরের বস্তু নহে। বেদ পুরাণ আর কি? ইহাই বেদ পুরাণ। যাগ যজ্ঞ আর কি? এই সকল নিত্য কর্ম্মই যাগ যজ্ঞ। মতে নয় কিন্তু ভাবে এইরূপ দেখিতে হইবে। চারিদিক ব্রহ্মজ্যোতিতে পূর্ণ, জল অগ্নি বৃক্ষ-চ্ছায়া সকলের ভিতরেই ব্রহ্মদর্শন হইবে, সমীপস্থ যাহা কিছু সকলেতেই জীবন্ত পরমেশ্বর প্রাণরূপে প্রবাহিত অনুভূত হইবে। গঙ্গাজল স্পর্শ ব্রহ্মস্পর্শ এরূপ বিশ্বাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মের পক্ষে ক্ষতি নহে, অনেক লাভের বিষয়। এখানে সংসার ধর্ম্ম এক হইল। আহার করিতে বসিলাম, অন্নময় ব্রহ্ম দেখিব, নতুবা খাইব না। এরূপ করিলে ধর্ম্মের দ্বারা শরীর পুষ্ট হইবে, অধর্ম্ম দ্বারা কখনও শরীর পুষ্ট হইবে না। অন্ন, তুমি ব্রহ্মের বস্তু হও। ব্রহ্মের বস্তু হইয়া তুমি শরীরস্থ হও। "সত্যং সত্যং সত্যং" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে অন্ন শুদ্ধ করিয়া লইব। অন্নের ভিতরে ব্রহ্মের সত্তা, হস্তের ভিতরে ব্রহ্মের সত্তা। সেই অন্ন শরীরস্থ হইয়া স্বর্গের হেতু হইল, পুণ্যের হেতু হইল, সমুদয় শরীর বিশুদ্ধ হইল। জলপাত্র হস্তে লইলাম বলিলাম, জল, তুমি ব্রহ্মের জল হও, নতুবা আমি তোমাকে পান করিব না। তুমি যদি দেবাদিদেবের পদনিঃসৃত না হও তোমাকে

স্পর্শ করিব না, তোমাকে শরীরে ঢালিয়া শান্তি গ্রহণ করিব না। শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও, শুদ্ধ হও, ব্রহ্মের আবির্ভাবে শুদ্ধ হও, এই বলিয়া জলকে শুদ্ধ করিয়া লইব। শয্যাকেও এইরূপ শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মের ক্রোড়ে শরীর সমর্পণ করিব। এরূপ না করিলে অবিশুদ্ধ শয্যায় শয়ন করিতে পারি না। ব্রহ্মপ্রেরিত শয্যা ভিন্ন প্রাতে নবজীবন লইয়া শয্যা হইতে উত্থান করিব কি প্রকারে, শুদ্ধ শরীর, নব উৎসাহ লইয়া ব্রহ্মের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিব কি প্রকারে ?

নূতন বৎসরে নূতন ফল হস্তগত হইল। নূতন বৎসরের দেবতা সেই ফল আনিয়া হস্তে দিলেন। যিনি বলেন আমার বৃক্ষের এই আমার নূতন ফল স্বহস্তে আনিয়া তোমায় অর্পণ করিতেছি, তাঁহার সেই নাস্তিকতার ফল নাস্তিক মনে কখনও স্পর্শ করিব না। নাস্তিক ভাবে ফল ছুঁইলে সকলই বিফল হইল। ব্রহ্মের বাড়ীর বৃক্ষের ব্রহ্মের ফল ব্রহ্ম স্বয়ং হস্তে তুলিয়া দিলে গ্রহণ করিব। এ কথা শুনিয়া কেহ হাসিও না, একবার সকলে এটী কার্য্যে করিবার জন্য যত্ন কর, সকল বস্তু সকল ঘটনাতে একবার ব্রহ্ম দর্শন কর। ব্রাহ্মগণ! তোমরা সকলে ভাবযোগের নিয়ম জান। অন্ততঃ ভাবযোগের নিয়মে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ কর। ফল ফুলে, জলে অগ্নিতে, সূর্য্যে চন্দ্রে, অন্নে পানীয়ে, সকল বিষয়ে ধর্ম্মের সহিত যোগ সাধন কর। বৃদ্ধ বয়সে দুই ঘণ্টার সুখে কিছু হয় না। সমস্ত দিনের সঙ্গে সেই সুখকে বদ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে ; ইহাতে কত আহ্লাদ বৃদ্ধি হইবে। ধর্ম্ম এক দিকে, সংসার আর এক দিকে ; ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এক দিকে, আহার পান অন্য দিকে ; আর

এরূপ থাকিবে না। প্রাণ ও সংসার এক ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে আবদ্ধ থাকিবে, সমুদয় অনুষ্ঠান ও আহার পান তাঁহাতে নিষ্পন্ন হইবে। আহার করিবার সঙ্গে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, অন্ন উদরস্থ হইয়া আরও ধার্ম্মিক করিবে। উপাসনার সময় ভক্ত যেমন কাঁদিবেন, আহারের সময়েও তেমনই কাঁদিবেন। অন্ন পান ইহাতে সুমিষ্ট হইবে, মন আনন্দে ভাসিতে থাকিবে। হা ঈশ্বর! খাদ্য সামগ্রীর ভিতরেও তুমি, এই বলিয়া ভক্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। উপাসনা ধ্যান ধারণার সময়ে আমাদের প্রাণ বিগলিত হয়, আমরা ক্রন্দন করি, ইহাতে কি হইল? আমরা নাস্তিক অবিশ্বাসী, যদি প্রতিদিন উত্তাপের সময় শীতল জল পান করিতে করিতে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ না করি, প্রেম পূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করি, আনন্দে পূর্ণ হইয়া যে দিকে তাকাই সেই দিকে তাঁহার প্রেম মূর্ত্তি দর্শন না করি। ব্রহ্মমন্দির, বাড়ী, আহার, নিদ্রা, স্বপ্ন, সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় দর্শন করিব। উঠিতে হরিনাম, বসিতে হরিনাম, চলিতে হরিনাম। হরিবিহীন স্থান নাই, হরিবিহীন ঘটনা নাই। হরি সংসার, হরি আকাশ, হরি গঙ্গা। হরি জলে, হরি স্থলে। হরি বক্ষে, হরি হস্তে, হরি কপালে, হরি মস্তকে। হরি আহার, হরি পানীয়, হরি আসন, হরি শয্যা। হরি শয়নে, হরি স্বপনে, হরি জাগ্রতে। সংসারের চিন্তা ভাবনা সম্পদ বিপদ সকলের মধ্যে হরি, হরির অধিষ্ঠানে সমুদয় অনুরঞ্জিত, হরির অধিষ্ঠানে সমুদয় সংসার পবিত্র। এ সময় হরির সময়, এ সময়ে হরি ছাড়া যেন কিছু না থাকে।

বৃদ্ধ ভ্রাতৃগণ! আমি বিনীতভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি, এই সময় সেই সময় যে সময়ে ব্রহ্মময় সকল জগৎ দেখিতে হইবে। এই

ব্রহ্মমন্দিরে এক ঘণ্টা কি চারি ঘণ্টা তাঁহাকে দেখিলেন, ইহাতে আর চলে না। এখন যে সমস্ত দিন তাঁহারই মধ্যে বসিয়া থাকিতে হইবে। এখন যে কোন ছলে সেই পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আহার পান সংসারের কর্ম্ম এগুলি ছলনা মাত্র। এ সকল কাজ কি জন্য, না এ সকলের মধ্যে সেই প্রাণময় ঈশ্বরকে দেখিতে পাই। আসুন সকল বিষয়ে হিন্দুভাব ধারণ করি। স্নান করিতে পান করিতে হরি, উঠিতে বসিতে হরি, চলিতে সঙ্গে সঙ্গে হরি। আহার করি কেন? আহার উপলক্ষ, আহার কেবল হরিপ্রেমে ভাসিবার জন্য। আমি বলি ভাই, তুমি মিথ্যা বলিতেছ এ সকল অন্ন ব্যঞ্জন। এ সকল অন্ন ব্যঞ্জন নয়, ইহাতে কেবল হরির প্রেমমুখ। তুমি ত আর সংসারে বেড়াইতেছ না হরিতে বিচরণ করিতেছ, তোমার পক্ষে আর সংসার নাই জল অন্ন নাই, সকলই তোমার হরি।

সুখবেদ, দুঃখবেদ। *

রবিবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০০ শক; ৯ই জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

জ্ঞানের দুই বেদ আছে। এক সুখের বেদ, আর এক দুঃখের বেদ। উভয় বেদ বহুমূল্য, জ্ঞানগর্ভ এবং মুক্তিপ্রদ। সুখের বেদ পাঠ করা যেমন আবশ্যক, দুঃখের বেদ পাঠ করা তেমনই আবশ্যক। অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী দুঃখকে স্বর্গীয় বলিবেন, কেন না দুঃখ সাধন না করিলে সংসার-রজ্জু ছেদন করা যায় না, কিন্তু সুখ দুঃখ দুইই পাঠের বিষয়, মনঃসংযোগ করিবার বিষয়। সুখ দুঃখ এ দুয়ের

মধ্যে দুঃখের দুই স্ত্রী এবং দুই দুই সন্তান! দুঃখের দুইবার বিবাহ হয় এজন্য তাহার দুই সংসার। দুঃখ প্রথমতঃ পৃথিবীকে বিবাহ করে, সেই পৃথিবী হইতে তাহার দুইটী সন্তান হয়,—নিরাশা এবং রাগ। দুঃখী লোক রাগী হয়, দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা রাগ রহিয়াছে। যে বিষয়ে লোকে কষ্ট পায়, সেই বিষয়ে বিরক্ত হয়। যদি সুখ হয় মানুষ রাগ করে না, বিরক্ত হয় না। অভিলষিত বস্তু পাইতে যত আশা ভঙ্গ হয়, কষ্ট পায়, প্রতিবাসী দ্বারা অপমানিত হয়, রাগ ততই দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ বাড়িতে থাকে। মানুষ যত কষ্ট পাইতে লাগিল তত রাগিতে লাগিল। পরে অধীর অশান্ত হৃদয় হইয়া আপনার প্রতি রাগ করিতে আরম্ভ করিল। নিজ দোষে দুঃখ পাইল, হইলে হয় কি, ভয়ানক ক্রোধের আগুন জ্বলিল, সুতরাং যেমনই রাগ জন্মিল তেমনই নিরাশা জন্মগ্রহণ করিল। নিরাশা জন্মিয়া আর যে আমার কখনও ভাল হইবে এ আশা নির্ব্বাণ হইল। আমি জন্মদুঃখী, কে আমায় মিষ্ট কথা বলিবে? আমার বন্ধু কোথায় যে আমাকে প্রিয় মনে করিবে। সকলেই আমায় হেয় জ্ঞান করিয়া পর বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে। আমি চির-দরিদ্র, আমার আর টাকা হইবে না, আমি মূর্খ আমার আর জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, আমার শরীর অসুস্থ, এ পীড়ার আর কোন দিন বিরাম নাই। আমি দুঃখী ঘৃণিত অপমানিত, আমার দিন কেবলই অন্ধকারময়। ইহার পশ্চাতে পূর্ণিমা আছে, ইহা আমার পক্ষে মিথ্যা। আমার দুঃখের অমানিশার কোন দিন অবসান হইবে না। সুখের মুখ না দেখিয়া দুঃখের ভবিষ্যতে আমার মরিতে হইবে। এইরূপে ঘোর নিরাশায় প্রাণকে গ্রাস করিল। পৃথিবীর সহিত বিবাহ হইয়া এইরূপে ক্রোধ

ও নিরাশা জন্মিল। একটী অশান্তি আনিল, আর একটী শান্তির আশা নিবাইল।

দুঃখের আর এক পক্ষের বিবাহে দুই সন্তান। দুঃখের স্বর্গের সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ঐ বিবাহ হইতে বৈরাগ্য এবং বিনয় এই দুই সন্তান জন্মে। দুঃখী বিনয়ী এটী স্বর্গীয় ভাব। দুঃখের সঙ্গে স্বর্গের মিলন হইলেই হৃদয়ে বিনয় সঞ্চারিত হয়। সুখীর অহঙ্কারের সম্ভাবনা আছে, ইন্দ্রিয়গণের অত্যাচারের সম্ভাবনা আছে, যে দুঃখী তাহার অহঙ্কার করিবার কিছু নাই। হৃদয় বজ্র দ্বারা আহত হইয়াছে, সর্ব্বদা দুঃখের অশ্রু পড়িতেছে, এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিনয়ী হয়। আমি দুঃখী, আমি ধনী নহি, জ্ঞানী নহি, ধার্ম্মিক নহি। অপরে বড় বড় স্থান পাইবার উপযুক্ত, আমার স্থান সকলের নীচে। যেখানে অন্যের পদধূলি পড়ে আমি সেইখানে বসিব। ফলতঃ যে কাঁদে সেই নীচে বসে। যে হাসিল না, যাহার মুখে কখনও হাসি নাই, তাহার বসিবার স্থান নিম্নভূমিতে।

বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বৈরাগ্য নামে আর একটী সন্তান হয়। যথার্থ দুঃখ হইলে বৈরাগ্য ও দীনতা আসিবেই আসিবে। পার্থিব সংসারী লোককে দুঃখ নিরাশ ও ক্রোধী করে, উহাই আবার ধার্ম্মিক লোককে দীন বৈরাগী করিয়া থাকে। এক গুণ দুঃখ চারি গুণ বৈরাগ্যের কারণ হয়। ক্রমে অন্তরের দুঃখ ডুবিয়া গিয়া বৈরাগ্যের সুখ শান্তি বৃদ্ধি পায়; সমুদয় পার্থিব দুঃখ ভুলিয়া গিয়া মনকে সংসার হইতে ধর্ম্মে নিয়োগ করে। এ জন্য যে ধার্ম্মিক যত দুঃখ পাইয়াছেন, তিনি সংসারকে তত জয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে যত দুঃখ হইয়াছে তত তিনি বৈরাগ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

যতবার তাঁহার হৃদয় দুঃখ পাইয়াছে, ততবার উহা ঈশ্বরের দিকে নিয়োজিত হইয়াছে। দুঃখে সংসার হইতে মন বিচ্ছিন্ন হয়, পৃথিবীর লালসা পরিত্যক্ত হয়। কষ্ট দুঃখ যে পরিমাণে, বৈরাগ্য সেই পরিমাণে। অতএব কষ্ট আদরণীয়। দুঃখের এত প্রশংসা কেন? এত আদর কেন? দুঃখ মানুষের মনকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটী বিশেষ স্থানে আনয়ন করে। পৃথিবীর পিতা মাতারও করুণা সুখী সম্পন্ন পুত্রের প্রতি নহে, যদি কোন একটী সন্তান কাণা হয় তবে তাহার প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ করুণা হয়। মাতা অন্ধ সন্তানের পক্ষপাতী। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বভাবে মাতা অন্ধ পুত্রকে এত ভালবাসেন। যখনই তাহাকে ক্রোড়ে করেন, তখনই তাঁহার চক্ষে জল পড়ে। অন্য সন্তানকে ক্রোড়ে করিলে তাঁহার এরূপ হয় না। তিনি সর্ব্বদা ভাবেন, আহা, আমার এই অন্ধ সন্তানটী নিরাশ্রয়, বিপদে পড়িলে ইহাকে কে দেখিবে? যতই ভাবেন ততই তিনি ব্যাকুল হইয়া আরও কোলে জড়াইয়া ধরেন। দেবদত্ত মাতৃস্বভাব কেমন সুকোমল! সন্তান রুগ্ন হইলে, কষ্টে পড়িলে, পয়সা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে পিতা মাতার মন অত্যন্ত সস্নেহ হয়।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ! জিজ্ঞাসা করি পিতা মাতার মনে এইরূপ দুর্ব্বল রুগ্ন অসহায় সন্তানের প্রতি স্নেহ করুণা কে দিলেন? যিনি জননীর জননী পিতার পিতা তিনিই স্নেহ করুণা দিলেন। তিনি জননী হইয়া পিতা হইয়া কি করেন? অনেককে কষ্ট দেন। দুঃখের পিতা মাতা নাই, দুঃখ অকস্মাৎ আইসে এরূপ মনে করিও না। সুখও যাঁহার হস্ত হইতে আইসে, দুঃখও তাঁহার হস্ত হইতে আইসে। দুঃখ প্রেরিত বন্ধু, ঈশ্বর আমাদিগের হিতের জন্য উহাকে

প্রেরণ করেন। ঈশ্বর প্রেরিত দুঃখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেলে সাধকের চৈতন্য হইবে, এ জন্য সাধকেরা দুঃখকে সৌভাগ্য মনে করেন। উহা না হইলে স্বর্গীয় জননীর ক্রোড়ে বসিতে পারা যায় না। মান সম্ভ্রম সুখ্যাতি প্রশংসা সুখ সম্পত্তি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া মাতার ক্রোড়ে গিয়া কেহ তেমন বসিতে পারে না, সে ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে না। আজ দুঃখ পাইয়া সন্তান মাতার ক্রোড়ে গিয়া লুকাইল, এমন ভাবে তাঁহার দিকে তাকাইল যে, তাঁহার স্তন হইতে স্বর্গীয় সুধা, তাঁহার চক্ষু হইতে স্নেহের অশ্রু পড়িতে লাগিল। এটী আর অনুমানের কথা নহে, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ ব্যাপার।

এরূপ কেন হয়? এরূপ হইবার কি কোন নিয়ম নাই? মাতা পিতা যেন পক্ষপাতী হইলে হইতে পারেন, ঈশ্বর পক্ষপাতী কি প্রকারে হইবেন? ইহাতে কোন নিয়ম নাই, অথবা ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন, এ কথা বলিও না। যিনি ঈশ্বরের দুঃখী সন্তান, দুঃখ তাঁহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন দিকে রাখে যে, সেই দিক হইতে তিনি ঈশ্বরের করুণা সহস্র গুণ দেখিতে পান। দুঃখের অবস্থায় এমন ভাবে তাঁহার দিকে তাকান যায় যে, তাঁহার স্নেহ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আজ আমায় অন্ন দিয়াছেন, আজ সন্ধ্যার সময় ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলাম, একবার কাঁদিলাম আর ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া কিছু খাইতে দিলেন। দুঃখে পড়িয়া কাঁদিলাম, আর বলিলাম হা পিতঃ! আমার ন্যায় দুঃখী আর কেহ নাই। তিনি আমার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিলেন। স্মরণ হইল অমুক সময়ে তিনি আমায় আহার দেন নাই, যাই আমি তাঁহার নিকটে চীৎকার করিলাম, অমনই আমায় তাঁহার প্রেমমুখ

দেখাইয়া সকল কষ্ট দূর করিলেন। তাই বলি ঈশ্বর যাহাকে দুঃখ দেন তাহাকে বড় ভালবাসেন। তিনি চক্ষু কাণা করিয়া দিলেন কেন? খুব ভালবাসিবেন বলিয়া। তিনি খুব ভালবাসেন বলিয়াই কষ্ট দেন, পয়সা কাড়িয়া লন, সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেন। এই যে সমুদয় দুঃখ দেখিতেছি ইহা কি জননীর স্নেহের লীলা? সমুদয় স্বর্গের ইতিহাস বলিতেছে, হাঁ, সাধকের প্রতি অতুল স্নেহ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি এই সকল লীলা করিতেছেন।

মান অপমান সাংসারিক বিপদ কষ্ট এ সকলকে আর আমরা অপ্রিয় বলিব না, ধিক্কার করিব না, কেন না জননী আমাদিগের প্রাণকে মধুময় করিবার জন্য দুঃখ দিতেছেন। ভাগ্যে দুঃখ হইল বলিয়া কাতর অন্তরে ডাকিলাম, তাই তাঁহার প্রেমমুখ দেখিলাম, রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া দৌড়িলাম, তাই তাঁহার শ্রীপদচ্ছায়া লাভ করিলাম। ভাগ্যে শুষ্ক কণ্ঠ হইল, তাই প্রেম-সাগরের প্রেমামৃত পান করিতে সক্ষম হইলাম। দুঃখ না হইলে পিতার মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারে না। দুঃখ না হইলে কে তেমন করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে পারে? দুই বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহার যে মহিমা বুঝিতে পারা যায় না, দুঃখে পড়িলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে মহিমা বুঝিতে পারা যায়। সংসারের কষ্টের অবস্থার মধ্যে পিতার মুখের ভাব অন্য প্রকার, তিনি হাসিতেছেন। মানুষ আর্ত্তনাদ করে, বলে এত যন্ত্রণা পাইলাম, এত কষ্ট পাইলাম, এত দুঃখ, শরীরে এত রোগ, এত বিপদ। দুঃখ তাহা বুঝিল না, দুঃখ তাহা শুনিল না, দুঃখের চক্ষে এক বিন্দু জল পড়িল না। ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার নিকট বলিতে গেলাম, আমি এত ধর্ম্মসাধন করিলাম, অথচ আমার সমুদয়

টাকা কাড়িয়া লইলে, আমায় ছিন্ন বস্ত্র পরিতে হইল, যাহা কিছু অবশেষে ছিল চোর চুরি করিয়া লইল। সাধক বলিলে কি তোমার এত দুঃখ! কিন্তু যাই ঈশ্বরের নিকট গিয়া এ সকল দুঃখের কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম, স্বর্গ হইতে অমনই এক ইঙ্গিত আসিল যে লজ্জায় অবনত হইতে হইল। আমি তখন বলিলাম ঠিক কথা, এ দুঃখ দুঃখ নয়। সুখ দুঃখের ছদ্মবেশে আসিয়াছে। নিশ্চয় বলিব, আকাশ ফাটাইয়া বলিব, হাসাইবার জন্য নয় সরল ভাবে বলিব, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য নির্ম্মল চরিত্র করিবার জন্য ঈশ্বর এত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। অবিশ্বাসী মন বুঝে না, তাই দুঃখ হইতে নিরাশা আইসে, দুঃখ হইতে গরল উৎপন্ন হয়। দুঃখের স্বর্গীয় সংসারে এমন উপযুক্ত সন্তান আছে কেহ জানে না। হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হওয়া কেবল ভক্তি বৃদ্ধির জন্য। ঈশ্বর বলিলেন "ক্রন্দন করিও না, তোমার সুখের জন্য টাকা কাড়িয়া লইয়াছি, ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়াছি, চোর দ্বারা যাহা কিছু অবশেষে ছিল অপহরণ করিয়াছি। অন্য কোন অভিপ্রায়ে নয়, তোমাকে আমার করিয়া চিরসুখী করিব এইজন্য।" এ সকল ইঙ্গিত বুঝিলাম, জননীর স্নেহধারা বর্ষিত হইল। দুঃখী করিয়া এই করিলেন, তাঁহার এক গুণ স্নেহ দশ গুণ পাইলাম। সুখী হইলে আমি কখনও এত করুণা পাইতাম না। আমি কঠোর রোগে রুগ্ন, ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করিতেছি, অন্ন সংস্থান নাই, ইহাতে তাঁহার ঢের করুণা পাইলাম। বুঝিলাম আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র।

সকল মহাত্মা সাধক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে ঘোর পরীক্ষার আগুনে পড়িয়াছেন। সত্যের সাক্ষী হইবার জন্য যদি

ঈশ্বর আমাদিগকে তেমন পরীক্ষায় ফেলেন, তবে কে তাহা মনোনীত করিবে না? ঈশ্বরের অনেক পুত্র, তন্মধ্যে তিনি পাঁচটী দশটীকে বাছিয়া লন। কেন? দুঃখ দিবেন বলিয়া। আমাদিগকে যদি তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, কণ্টকে বিদ্ধ করেন, টাকাগুলি কাড়িয়া লন, পাঁচ দিন আমাদিগকে ঘোর কষ্ট দেন, তবে তাহা পছন্দ করিব। কেন না তিনি ভালবাসেন বলিয়া এরূপ করিলেন। যত তিনি আমাদিগকে কষ্ট দিবেন, তত বুকে জড়াইয়া ধরিবেন। কত আশার কথা! হৃদয় আর এ ভাব ধরিতে পারে না। তিনি আমায় বুকে জাড়াইয়া ধরিয়া পোষণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া আমায় প্রহার করিলে, আমি হাসিতে হাসিতে তাহা সহ্য করিব। কেন সহ্য করিব? পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য। দুঃখই সুখ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও। ঈশ্বর তোমাদিগকে গোপনে প্রিয় সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তোমাদের ছিন্ন বসন দেখিলে সকলের মন আকৃষ্ট হইবে। তাই বলি তোমার জন্য দুঃখ আমার জন্য দুঃখ হউক। দুঃখের সাজে সজ্জিত হইলে, অত্যাচারে মাথা কাটা গেলে, সেই কাটা মুণ্ড আশ্চর্য্য প্রভাব ধারণ করিবে। এ কি কম শোভা, এ যে বিনয়ের শোভা বৈরাগ্যের শোভা! যিনি দুঃখের সাজে সজ্জিত হইয়াছেন তিনিই ধন্য!

সুখী আর কে, যে দুঃখী সেই সুখী। দুঃখকে নিন্দা কর কেন? দুঃখকে দুঃখ বল কেন? দুঃখ হইলে এত অস্থির হও কেন? নিরাশ হও কেন? আর ভাল হইবে না, আর আমার কিছু হইবে না, এরূপ চিন্তাই বা কেন কর, বিলাপই বা কেন কর? দুঃখকে

দেখিতে ম্লান-বদন ছিন্ন-বসন কিন্তু দুঃখ রাজার সন্তান। দুঃখকে কখনও নিগ্রহ করিও না। যে দিন দুঃখের, সেই দিন সৌভাগ্যের। একটু দুঃখ হইলে সাধকের হৃদয় পবিত্র ভাব ধারণ করে, এবং পরম পিতার মুখের দিকে ঠিক ভাবে তাকাইতে পারে। এত ধর্ম্মভাব সঞ্চয় কোথা হইতে হয়? এক দুঃখ হইতে। সুখ আইসে গ্রহণ কর, কিন্তু দুঃখকে আদরের সহিত আলিঙ্গন কর। আমি অন্ধ সন্তান, এই বলিয়া অন্ধ সন্তানের পিতা মাতার নিকটে বেশী আব্দার চলে। দুঃখী হইলে ঈশ্বরের মুখ দর্শনের জন্য অধিক যাচ্ঞা করিবে। আর কিছু বলিতে চাই না, তোমার মনই বলিয়া দিবে, দুঃখী সন্তানের প্রতি ঈশ্বর কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিকতা।

রবিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০০ শক ; ১৬ই জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যের শরীর রক্ষা যেমন আবশ্যক আধ্যাত্মিক হওয়া তেমনই আবশ্যক। মানুষ এক, কিন্তু তাহার জীবন দ্বিবিধ। এক শারীরিক জীবন, আর এক আধ্যাত্মিক জীবন। এই পৃথিবীর পথে পশুভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হওয়া সেই এক জীবন, আর এক জীবন সমুদয় ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া অতীন্দ্রিয় ব্যাপার দেখা শুনা স্পর্শ করা এবং তাহাতে বাস করা। জন্ম হইতে অভ্যাস বশতঃ ইন্দ্রিয়-প্রধান নীচ পশু-জীবন আমাদিগের শীঘ্র লাভ হয়। পৃথিবীর ভূমিতে আমাদিগের ইহজীবন আরম্ভ হয়, সুতরাং আমাদিগকে এ জীবন প্রথম হইতে বহন না করিলে চলে না। এই জীবনে জীবিত থাকিয়া

ক্রমে বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে আমাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, পরিশেষে আমাদিগের সমুদয় আশা ভরসা পৃথিবীর সঙ্গে বদ্ধ হইয়া পড়ে। এ সকল ছাড়িয়া হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। যদি দুদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করি, তবে পৃথিবীর কল্পনা পার্থিব চিন্তা আসিয়া ব্যতিব্যস্ত করে। যিনি ব্রহ্মের সাধক, ব্রহ্ম তাঁহার অন্ধকার আত্মার ভিতরে একটী রাজ্য নির্ম্মাণ করেন; তিনি সেই ঘোর অন্ধকার হইতে একটী বৃহৎ জগৎ প্রকাশিত করেন। ঈশ্বর ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া সাধককে শিখান প্রকাণ্ড বিশ্ব কিছুই নয়। ঈশ্বর সাধককে বলেন "হে ভক্ত! চক্ষু বন্ধ কর দেখিবে পলকের ভিতরে বিশ্ব নাই। তুমি এই অন্ধকারের ভিতরে পবিত্র ইচ্ছা লইয়া উপবেশন কর, একটী মূর্ত্তিমান নূতন জগৎ দেখিতে পাইবে।" সাধক সেই আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করিলেন। নির্জন কানন, পর্ব্বত, গিরিগহ্বরে এই জগৎ সৃষ্টি সুলভ হয়। যেখানে গোলের সম্ভাবনা সেখানে বিঘ্ন হয়, এজন্য তিনি লোকালয় ছাড়িলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা বা পাঁচ মিনিট স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আর প্রকাণ্ড অন্ধকার সমুদয় বিশ্বকে গ্রাস করিল। সাধক এক অসীম অন্ধকারের মধ্যে ডুবিলেন। সেই সময় হইতে এক নূতন ধর্ম্মজগৎ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। অন্ধকার বস্তু হইয়া যতদূর অন্ধকার ততদূর সত্তায় ঘেরিল। তন্মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের পার্শ্ব হইতে একটী বৃহৎ পরিবার বাহির হইল।

আমরা বারম্বার এই কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সাধন দ্বারা ইহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ কর। নির্জনে অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া এই জগতে বাস করিবার জন্য যত্ন করা সকলেরই নিতান্ত

কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক জগতে সময়ে সময়ে বাস না করিলে কিছুই থাকিবে না। যাহা কিছু ছিল, আছে, থাকিবে, তাহা উহারই মধ্যে। এখন আমরা কোথায় আছি, জানা চাই। বায়ু আকাশ স্বপ্ন অথবা যথার্থ বস্তুর উপরে স্থিতি করিতেছি ইহা, না জানিলে চলে না। আমাদের স্থান আছে, অবলম্বন আছে, স্থির ভূমি আছে। সেই যে স্থান অন্ধকারময় সেখানে আসন গ্রহণ কর, কুটীর নির্ম্মাণ কর, পরিবারবর্গকে, নিরাকার বন্ধুগুলিকে ডাকিয়া লও। আশ্চর্য্য! সর্ষপকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র স্থান, অথচ সমুদয় পৃথিবী, অতি দূরস্থ বন্ধু বান্ধব সেখানে পরিবার বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ব্রহ্মের সিংহাসনের চতুষ্পার্শে সাধকগণ আমোদ করিতেছেন, ভক্তবৃন্দ নৃত্য করিতেছেন। যাহা বলিতেছি কল্পনা নয়। অন্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়-জগতে ইহলোকেই পারলৌকিক মিলন হয়। ব্রাহ্ম আমোদিত হইয়া সেখানে বাগান নির্ম্মাণ করেন। সেই অন্ধকার ভূমি খনন করিয়া বীজ রোপণ করেন। যত্নে সাধন-বারি সিঞ্চন করাতে ফল ফুল বাহির হয়। এ রাজ্যের ফল ফুল নয়, এ সকল ফল ফুল অন্য জাতীয়। পৃথিবীর সামান্য ফুল এখানে নাই। এ সকল ফুলের নাম কি? ইহারা কেমন কোমল সুন্দর! ইহাদের সৌরভই বা কেমন আশ্চর্য্য!

এই ঘোর অন্ধকার মধ্যে পরলোকবাসী মহাত্মাগণকে দর্শন করিতে পার। পুস্তকে তাঁহাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছ, ইতিহাসে তাঁহাদিগের বিষয় অবগত হইয়াছ, সে সকল মৃত। যে সকল মহর্ষির সঙ্গে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরের সহবাসে আলাপ করা যায়, তাঁহারা বিশেষরূপে পরিচিত হন, এবং আলাপ করিয়া শান্তি লাভ

হয়। আঠার শত বর্ষ বা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে এত দূর হইতে কি প্রকারে ডাকিয়া আনিবে? এত দূর যাইতে হইলে যে পথের মধ্যে মরিয়া যাইতে হইবে। ইতিহাস পড়িয়া তাঁহাদিগকে জানিতে হইলে কল্পনায় ভ্রমান্ধ করিবে; কুবুদ্ধি আসিয়া নানাবিধ সংশয় উপস্থিত করিবে। যে নাম ইতিহাসে পাঠ করিতেছি, ইহা যদি যথার্থ না হয়, কোন ধূর্ত্ত যদি প্রবঞ্চনা করিয়া মনুষ্যের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, আর কোথাও যাইব না, এই অন্ধকারের ভিতরে প্রবেশ করি। অমুক নিকটে আইস, তোমার জন্য এই আসন পাতিলাম, গ্রহণ কর। অনুরোধ করিবা মাত্র, আহ্বান করিবা মাত্র, দেশ দেশান্তর হইতে কত যোগী ঋষি, কত বড় বড় দণ্ডী, কেহ পাঁচ শত কেহ পাঁচ সহস্র বৎসর সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, কাহারও মস্তক শুভ্র, দশ সহস্র বৎসর সাধন করিয়া জীবনে ফল লাভ করিয়াছেন—আসিবেন। কেহ জ্ঞান লইয়া কেহ ভক্তি লইয়া, কেহ উৎসাহ লইয়া আসিবেন। কেহ নব-জীবনে যৌবন লাভ করিয়াছেন, কেহ নিতান্ত শিশু হইয়াছেন, কেহ বিদ্বান হইয়া মূর্খ হইয়াছেন, প্রখর-বুদ্ধি হইয়া নির্ব্বোধ হইয়াছেন। এরূপ নানা ভাবের ঋষি আসিবেন। অন্ধকারের মধ্যে এক আশ্চর্য্য জগৎ নির্ম্মাণ হইবে।

অন্তরের মধ্যে একটী জগৎ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রবলতর ইচ্ছা চাই। ব্যাকুল ভাবে ইচ্ছা করিলে ইচ্ছা মাত্র পরলোকবাসী সকলকে ডাকিয়া আনিয়া মনের ভিতরে বক্ষের মধ্যে বসান যায়। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে চিরকালের জন্য হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে পারা যায়। কে কে আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে চিরকালের

জন্য আয়ত্ত করা যায়। এ সকল যদি কল্পনা, তবে অকল্পিত কিছু নাই। এ সকল কল্পনা নহে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়া ভিতরে দুই পাঁচ ঘণ্টা কথা কহিতে না পারিলে সাধনের ফল কি হইল? চক্ষু না খুলিলে যদি টাকা না পাই, ধন না, পাই, শরীর মনকে স্নিগ্ধ করিতে না পারি, সংসারে আসিয়া বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ না করিলে যদি না চলে, তবে কি হইল? হৃদয়ের ভিতরে এত অতুল ঐশ্বর্য্য, আমার কিসের ভাবনা? আমার কেহ নাই, কেন বলিব? যিনি আধ্যাত্মিক জীবন পাইয়াছেন, তিনি আর এ অসার কথা বলিতে চান না। যিনি ধ্যান করিয়া অন্তর্জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ দুর্ব্বলতা হয় না যে, বাহিরের সামগ্রী না হইলে হয় না। ভিতরে এত বন্ধু থাকিতে বাহিরের বন্ধুতে তাঁহার আদর কেন হইবে? বারবার বলিয়াছি, বাহিরের লোকের মুখাপেক্ষা করিও না। যখন তুফান আসিবে, মরিতে হইবে। ভিতরে একজন প্রাচীন বসিয়া আছেন তিনি আস্তে আস্তে অভয় দান করিতেছেন। এই অভয় দানে বিশ্বাসী বাহিরের সমুদয় অগ্রাহ্য করিতেছেন। যিনি প্রাচীনকালের, যিনি বর্ত্তমান কালের, যিনি ভবিষ্যতের—সকল মহাজনকে একত্র কর। সকল ছাড়িয়া আত্মার ভিতরে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর। এক লক্ষ বৎসর ক্রমাগত এরূপ চলিলে কিছুই ফুরাইবে না। ভিতরের জীবন অতি মহৎ ইহাতে অসারতা কিছু নাই। বাহিরে গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া কি করিবে, হৃদয়ের ভিতরে অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর। বাহিরের বন্ধুতা অসার, বাহিরের কথা বাহিরের প্রসঙ্গ করিয়া কি হইবে? অমুক ঋষিকে ডাক, অমুক ঋষিপুত্রকে ডাক, অমুক সাধক তপস্বী যিনি সাধনে তপস্যায়

প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাকে নিকটে বসাও। দেখিবে জীবনের ভাবান্তর হইবে। তাঁহাদের মহাবাক্যে জীবন আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করিবে। যদি ছয় জন ঋষিকেও সেই অন্ধকার গৃহে বসাইতে পার, তাঁহাদের এক একজনের দৃষ্টান্তে পৃথিবী সংশোধিত হইয়া যাইবে। যদি অনায়াসে তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারি, কেন উপেক্ষা করিব? ছয় জনে বসিলে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইবে। দুটী ঋষিকে হৃদয়ে সাজাইলে, তাঁহাদের মহাবাক্যে তাঁহাদের আশ্চর্য্য সাধু দৃষ্টান্তে জীবন গঠন হইবে, হৃদয়কে প্রেমে অভিষিক্ত করিবে। লোকে তোমার বাহিরে পরিবর্ত্তন দেখিবে, কিন্তু কারণ কিছু বুঝিবে না। তোমার ভিতরে ঋষি আছেন, সত্য সত্য সত্য চীৎকার করিয়া বলিব, ইহার বিপরীত কথনও বিশ্বাস করিব না। এই অন্ধকারের ভিতরে ঋষি বাস করিতে পারেন এই সার কথা।

ভক্ত ব্রাহ্ম! তুমি জান, অন্তরে ফুল ফুটিয়াছে। সারবান্ বৃক্ষ জন্মিয়াছে, উহা হইতে প্রচুর ফুল লাভ করিবে। সকলে আমোদিত হও, ফুলের শোভা দেখিয়া কৃতার্থ হও। এক একটী ঋষি এক একটী ভূত নন বা প্রেত নন, সত্য ঋষি, তাঁহারা তোমার রক্তের সঙ্গে অস্থির সঙ্গে জ্ঞানে ভক্তিতে শান্তিতে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর সময়ে সময়ে তোমার এক একটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া আনেন। প্রাচীন ঈশ্বর এক বৎসরের ছোট ছোট শিষ্যগণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, আমোদ করেন, পথ প্রদর্শন করেন, সহায় হন। ঈশ্বর কাছে লইয়া সময়ে সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকেন, তাঁহারা আসিয়া হৃদয়ে সভা করিয়া বসেন। এক একবার সেই সভায় গমন করিও। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া প্রিয় মহাত্মাগণ যাঁহা-

দিগের বিষয়ে পুস্তক পাঠ করিয়াছ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন, ভাল করিয়া সমাদর কর, তাঁহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া শুন। কি কোমল, কি মিষ্ট, কি মধুময় তাঁহাদিগের কথা! তাঁহাদিগের মুখ দেখিলে কথা শুনিলে মন নরম হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, নিরাশ মনে আশা হয়, মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারিত হয়। বাহিরের কিছুর সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না, কিছুর সঙ্গে তুলনা করিও না। সাধন করিবার জন্য আজ এ কথা বলা হইল। উচ্চ বিশ্বাস-পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিয়া মহাজনদিগকে স্মরণ কর। এ দেশ অন্য দেশের প্রাচীন আধুনিক সকলকে একত্র কর। তাঁহারা সকলে সহায়তা করিবেন না কেন? ইহাঁদিগকে হৃদয়ের ভূষণ কর রক্তের রক্ত কর, নিঃশ্বাসের নিঃশ্বাস করিয়া ফেল। ব্রাহ্মগণ! ঋষি মহাত্মাগণকে সমাদর করিয়া হৃদয়ে বসাইলে আমোদ বর্দ্ধিত হইবে, সৎসঙ্গে অমৃত পান করিয়া দিন দিন ধর্ম্মে অগ্রসর হইবে। আমরা সর্ব্বদা সৎসঙ্গের মধ্যে বসিয়া আছি। যদি ঋষিগণকে আসন না দিই, তাঁহাদিগকে অতিথি না করি, তাঁহাদের জ্বলন্ত মহাবাক্য শ্রবণ না করি, তাঁহাদিগের সকলকে যদি বুকের ভিতর না রাখি, তবে আমাদিগের কিছুই হইল না। আইস আমরা সকলে তাঁহাদিগের নিকটে মস্তক অবনত করি, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভক্তিধামের দিকে চলিতে থাকি। আমরা এইরূপে ঋষিবান্ জ্ঞানবান্ ভক্তিবান্ এবং ব্রহ্মবান্ হইয়া দিন দিন অগ্রসর হইব।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। *

ঋষি ও ভক্ত।

বুধবার, ৬ই আষাঢ়, ১৮০০ শক ; ১৯শে জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

এই আর্য্যস্থান পুণ্যস্থান, এই ভারতভূমি পুণ্যভূমি। কেন বলি ? এই ভূমিতে ঋষির জন্ম, ভক্তের জন্ম হইয়াছে। ভারতভূমি কৃতার্থ হইল, কেন না ঋষি ও ভক্ত উহাতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা ঋষি ও ভক্তের জন্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঋষি-জীবন এবং ভক্ত-জীবন ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নহে। এই দুই জীবন ধর্ম্মের দুই শাখা, পুণ্যের দুই ভাব। দুইটী একত্র করিলে সত্য ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? এক দিকে ঋষি এক দিকে ভক্ত, এ দুয়ের মিলন প্রকৃত ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থল। ঈশ্বর ধর্ম্মের দুইটী ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "ঋষি, তুমি ভারতে গমন কর। সংসার দুঃখের স্থান। এখানে ধন মান পরিবার ইন্দ্রিয়-সুখ সকলের মন প্রমুগ্ধ করে, অধর্ম্মের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি গিয়া সমুদয় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীর ভাব ধারণ কর। কি জানি কিছুতে পাছে মুগ্ধ করে এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর। হিমালয়-শিখর, গিরিগহ্বর, গঙ্গা যমুনা শতদ্রু নদী, নিবিড় জঙ্গল, যেখানে লোকালয় নাই, টাকা নাই, সেইখানে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিমীলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন হও। যদি স্ত্রী পুত্রগণকে সঙ্গে লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের

ভিতরে স্থান দাও। তাহাদিগকে ধ্যানের পথে, উচ্চ ধর্ম্মের পথে দৃষ্টান্ত দ্বারা আকর্ষণ কর।” ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতে কত মুনি ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন; নির্জনে ধ্যান ধারণা করিয়া দেশের কত মঙ্গল করিলেন, এবং সাধন ভজন আত্ম-সমর্পণ দ্বারা ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

ঈশ্বর ভক্তকে বলিলেন, “তুমি ভারতভূমিতে যাও। ধর্ম্মের অপরাংশ গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী নিতান্ত শুষ্ক হইয়াছে। কেবল কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের শাস্ত্র পাঠ করিয়া, প্রকৃত কর্ম্ম কি, প্রকৃত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, লোকে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিভক্তি নাই; হরিনামরসামৃতের আস্বাদ কেহ পায় নাই। উহা শুষ্কতা সাংসারিকতা, অধর্ম্ম, কুসংস্কার, ধর্ম্মহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যাও এই সকল দেখিয়া ক্রন্দন কর এবং হরিপদ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্দধারা নিপতিত হউক, গাত্র রোমাঞ্চিত হউক! তুমি ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া কখনও হাসিবে, কখনও কাঁদিবে, কখনও নৃত্য করিবে, কখনও ব্রহ্মামৃত-সাগরে ডুবিবে। তুমি আপনি আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীও আনন্দনীরে মগ্ন হইবে। একটী দুটী করিয়া ক্রমে সমুদয় দেশ সেই মধুময় রসের আস্বাদ জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক্ত! তুমি গিয়া ভারতভূমিতে ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। তোমাকে দেখিয়া তাপিত-হৃদয় সাধকগণের শান্তি হইবে। তুমি আপনি যে নাম করিয়া সুখী হইবে, অপরেও সেই নাম ধরিয়া সুখী হইবে। তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কথা শুনিয়া ভারতের নগরে নগরে ধর্ম্মের জয়ধ্বনি হইবে। মৃদঙ্গ

বাজাইয়া নাম কীর্ত্তন কর, গ্রামে গ্রামে মহারোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেশ ভাসিয়া যাইবে; এক এক করিয়া সহস্র ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে থাক, পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিদূরিত হইবে।”

দুঃখী ভারতের দুঃখ বিমোচন জন্য ঈশ্বর এই দুইটী অঙ্গে ধর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন এবং দুইজনকে দুইটী ভাব প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কালক্রমে এই দুই অঙ্গ মিলিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উদয় হইল। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত ঋষি এবং চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রকৃত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের একজন বেদ একজন শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিলেন। এক দিকে জ্ঞানশাস্ত্র ঋষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশাস্ত্র প্রেমের মত। এক দিকে হিমালয় ঋষিগণের স্থান, আর এক দিকে নবদ্বীপ ভক্তের জন্মভূমি। এক দিকে ধ্যান ধারণার গভীর প্রশান্ত ভাব, আর এক দিকে ভক্তি প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস। এই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হও, দেখিবে আশ্চর্য্য রত্ন লুক্কায়িত আছে। আজও পর্ব্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে এই স্থানে ঋষিগণ বসিয়া সন্ধ্যাকালে করযোড়ে পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীর কূলে যাও দেখিবে অমুক স্রোতস্বতীর কূলে অমুক ঋষির আশ্রম ছিল। সেই সেই স্থানে বসিয়া তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিয়া কত অপূর্ব্ব রসাস্বাদ লাভ করিতেন। সামান্য বৈষ্ণবের গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে প্রভু চৈতন্য কি করিয়াছিলেন। কুসংস্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুষ্ক জ্ঞানে জর্জ্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল হইল কেন, শীতল

হইল কেন? প্রেমের প্রভাবে। তাঁহার নামে সমুদয় দেশ প্রেমজলে প্লাবিত হইয়াছে, আজও প্লাবিত হইতে পারে। এত যে ধনের লালসা এত যে সভ্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত চৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে, মত্ত হইলে সকলই ভুলিয়া যাওয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? এক সূত্রে এই দুইটী ফুলকে একত্র গাঁথা হইয়াছে। ধ্যানফুল ভক্তিফুল বিশ্বাস সূত্রে গাঁথিয়া গলায় পরিব। এই দুই প্রকার ভাব একটী ঘরে রাখা হইয়াছে, যাহার নাম ব্রহ্মমন্দির। আজ যে এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা নূতন নহে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইতেছে, চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভক্তি আসিয়াছিল তাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে। ইহা দেখিয়া কাহার চিত্তে না আহ্লাদ হয়? এ দুই অমূল্য রত্ন থাকিতে কি দুঃখ? হায়! অমন অমূল্য রত্ন নির্ব্বোধ লোকেরা ভুলিয়া গেল। এখন বলে কি না, আমাদের ধর্ম্ম নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রমান্ধ বলিয়া আবার আপনার দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভুল কেন? ভাব দেখি, একজন প্রাচীন ঋষি নদীতটে বসিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদয় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন; নিমীলিত নয়নে হৃদয়াকাশে উঠিয়া ভিতরে ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিতেছেন; ভিতরে ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মাগ্নির মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাঁহার নিকটে তুচ্ছ হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাঁহাকে ভুলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভুলিবেন না। ধর্ম্ম ছাড়া বর্ত্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদয় তাঁহার নিকটে তুচ্ছ। আর কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই ঋষিভাব ধারণ করিব।

ঋষি তুল্য হইয়া মাঠে ছাদে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ স্বরে প্রবাহিত সেখানে, যেখানে পর্ব্বতরাশি চারিদিকে নিজ মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতেছে সেখানে সেই নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, কোন মূর্ত্তি নাই কেবল অনন্ত আকাশ, বলিব, হে অনাদ্যন্ত ভূমা মহান্! আর শরীর মন ব্রহ্মে নিমগ্ন হইবে; "একমেবাদ্বিতীয়মে" নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। এইরূপে দুঃখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকা ব্রাহ্মের চেষ্টা, ব্রাহ্মের প্রাণগত সঙ্কল্প। কিন্তু কেবল ঋষি হইলে সব দুঃখ যায় না। সুখের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন। এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্ন হইয়া থাকিলাম, আর এক দিকে তাঁহাকে স্মরণ মাত্র প্রেমধারা পড়িতে লাগিল; এই পূর্ণাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া পথে পথে হরিনাম কীর্ত্তন, পরিবার মধ্যে প্রেমময়ের নাম উচ্চারণ সকলে মিলিয়া তাঁহার নামামৃতের রসাস্বাদ, ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার অনুরাগে উন্মত্ততা, ইহাতে নূতন কিছু আসিল না। বঙ্গভূমিতে যে অনুরাগ-তরু একদিন ছিল, সেই অনুরাগ-তরু সতেজ হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য দর্শন, কি চমৎকার শোভা। এদেশে কি ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে? আজ কি একটা শুষ্ক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব? শুষ্ক মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ করিব? শুষ্ক অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইব? এরূপ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এদেশে এখনও যে ভক্তি দেখিতেছি। ঋষিগণের সেই নিরাকার ব্রহ্মে এখনও সেই ভক্তি অর্পণ করিতে হইবে। প্রাণেশ্বরকে হৃদয়ে দেখিব, আর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইব। হৃদয়ের ভিতরে ঋষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্তের প্রেমে তিনি হৃদয় বিগলিত

করিবেন মাতাইবেন। আমরা ঋষিভক্ত হইয়া অনন্ত ঈশ্বরকে গলার মালা করিয়া জীবনে ধারণ করিব। আমাদের কি দুইই হইতে পারে? এই কি বিশ্বাস করিব, এই ভারতে আর সেই ঋষি এবং ভক্তের সমাগম হইতে পারে না? না না কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুণ্যভূমি।

ভ্রাতৃগণ! সময়ে সময়ে তোমাদের মনে নিরাশা উপস্থিত হয়। তোমরা মনে কর আমরা বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখানে ভাল বীজ রোপণ করিলে, তাহার স্থলে কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুষ্করিণী খনন করিলে উহা অল্প দিনের মধ্যে শুকাইয়া যায়। এখানে গোলাপের বাগান প্রস্তুত করা আর মরুভূমিতে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না? নর নারী বালক বৃদ্ধ যুবা এদেশে এক সময়ে ভক্তিরসের আস্বাদ পাইয়াছে কি না? যদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও এ ঘরে লোকে প্রচুর পরিমাণে প্রেম ও আনন্দ লাভ করিবে। আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বক্তৃতা হইল, তোমরা ঋষি হইবে ভক্ত হইবে। ঋষি ও ভক্তের ভাবে, "প্রভু কোথায়" বলিয়া আনন্দে তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরিবে। তাঁহার নিরাকার শ্রীচরণ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমাগত আনন্দ বাড়িবে, পুণ্য বাড়িবে এবং সে অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি, এই জাতির ইহা আদি ধর্ম্ম, আজ আমরা যে দেবতার পূজা করিতেছি, প্রাচীনেরা এই দেবতার পূজা করিতেন। আর কেন ভাই নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিতে ক্ষান্ত থাক? দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে

স্বতঃ পরতঃ ঈশ্বর-সাধকের দল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে যে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিমোচন হইবে, আহ্লাদ আনন্দ বাড়িবে। আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি? যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিলাম তিনি ধন্য হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্য নিমন্ত্রণ নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটী সুন্দর সুগঠিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহার কথামৃত পান করিয়া যদি দুইটী তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা শান্ত হয় তবে কত লোক সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য আসিবে; প্রভু দয়াময়ের নামে গ্রামের সমুদয় দুঃখ শোক চলিয়া যাইবে।

আজ আমরা এখান হইতে কি শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? মানিলাম গ্রামে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, জ্বর রোগের অত্যাচার আছে। একবার সকলে মিলিয়া ব্রহ্ম-নামামৃত পান কর দেখি সকল দুঃখ যায় কি না? সকলের মনের সাধ পূর্ণ হয় কি না? আজ দশ পোনের কুড়ি বৎসর হইল আমরা সেই প্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত সুখ শান্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাম, সেই সুখের কথা বলিতে এতদূর আসিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া যোগী হইয়া হরিনামের রসাস্বাদ গ্রহণ কর, তাঁহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে অল্প দিনের মধ্যে কি হয়? এ ধর্ম্ম শুষ্ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা দেখিবে, মহাপ্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে, দেখিবে এখনই আনন্দরস উথলিয়া উঠিবে। সেই আনন্দে সমুদয় সংসার ডুবিবে সমুদয় পৃথিবী

ডুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে যেরূপ মিষ্ট বচন শুনিতে পাইবে এমন আর কোথাও শুন নাই। তিনিই তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া সত্যের পথে লইয়া যাইবেন। যদি পথহারা হও "গুরো! পথহারা হইয়াছি" এই কথা বলিলে তখনই সদ্গুরু ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। সংসার উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া প্রভো! কোথায় রহিলে বলিয়া ডাকিলে অমনই তিনি সমুদয় তাপ নিবারণ করিবেন। দশ জন ভক্তের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চাহিলে প্রভু তাহাই করিয়া দিবেন। শাস্ত্র গুরু সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যাহা কিছুর প্রয়োজন কিছুরই অভাব থাকিবে না। পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না। একাকী ডাকিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোমার সহধর্ম্মিণী হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ হইবে, গৃহের সকলে মিলিয়া প্রভুর নিকটে আসিলে তাঁহার পরম মঙ্গলময় ক্রোড়ে সকলে সুরক্ষিত হইয়া শান্তি পাইবে। সকলের এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। একজন দশ জন ক্রমে শত শত জন এই স্থানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে। এখানে যেমন মন্দির স্থাপিত হইল এইরূপ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। মন্দিরের নিশান আজ সকলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে ডাকিতেছে। সেই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত হইলে ইহলোকে কল্যাণ পরলোকে সদ্গতি হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

স্বর্গীয় অহঙ্কার।

রবিবার, ১০ই আষাঢ়, ১৮০০ শক; ২৩শে জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

দুর্ব্বল কলঙ্কিত বিনয় অপেক্ষা স্বর্গীয় অহঙ্কার ভাল। এই স্বর্গীয় অহঙ্কার ভিন্ন ভাল হইবার উপায়ান্তর নাই। যে অহঙ্কারে মনুষ্য স্বর্গীয় ভাব পায়, ঈশ্বর পায়, স্বর্গের উপযুক্ত হয়, তাহাকে সামান্য বলি কিরূপে? বারবার মানুষ যত বলিবে আমি অতি পাপী, আমি অন্ধ, আমার কিছু হয় নাই, হইল না, হইবে না, সে তত পাপভারে ডুবিবে। পাপীর বিনয়ও পাপ। পাপ মনুষ্যকে এই প্রকারে অধিকার করিয়া বসে এবং বিনয়ের ভিতরে বিষ ছড়াইয়া দেয়। তখন বিনয় সাদা নয় কাল বাহির হইয়া পড়ে। একবার বিনয়কে ভাল করিয়া দেখ দেখি, এ বিনয়—বিনয় কি অবিনয়? এক প্রকারের বিনয় আছে সাদা স্বর্গীয়, আর এক প্রকারের বিনয় আছে নরক সমান কাল। আমরা যথার্থ বিনয় কি জানি না। মাথা হেঁট করিয়া কথা আস্তে আস্তে বলিলে, শরীর ময়লা করিয়া রাখিলে, মলিন বস্ত্র পরিলে, আমি অপদার্থ কিছু নই বলিলে আমরা তাহাকে বিনয়ী মনে করি। কিন্তু অন্তর্যামী পুরুষ জানেন তাহার কিরূপ বিনয়। সে ব্যক্তি বিনয়ের বেশ পরিয়া আপনাকে ডুবাইল, অপরকে বঞ্চনা করিল।

ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা সকলে এ বিনয় স্থান পায় না। তাঁহারা

সকলে অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁহারা যেন দেদীপ্যমান অহঙ্কারের ছবি। তাঁহারা পবিত্র তেজে সমুদয় দগ্ধ করিয়া ফেলেন। অহঙ্কার বলিতেছি কেন? তাঁহারা সর্ব্বদা আত্ম-পরিচয় দিতেন। আমরা স্বর্গীয় তেজে তেজস্বী, আমরা ঈশ্বরের আদেশ জগতের সমক্ষে ধারণ করিব, আমাদিগের ভিতরে আশ্চর্য্য আলোক দেখ, তাঁহারা এই কথা বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। জগতের নিকটে তাঁহারা চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিলেন, দেখ আমাদিগের মধ্য হইতে অপূর্ব্ব আলোক বাহির হইতেছে। সকলে শুনিয়া কাঁপিল, কেহ কিছু বলে এমন স্পর্দ্ধা কাহার? রাজার মুকুট অবনত হইল, সম্রাটের গৌরব সম্রাটের তেজ ম্লান হইল, কিন্তু তাঁহাদিগের তেজ কিছুতেই মলিন হয় না। পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তি সমুদয় ধন দিয়াও কেহ তাঁহাদিগের সে তেজস্বিতা ক্রয় করিয়া লইতে পারে নাই। তাঁহারা ভিক্ষুকের সন্তান, দুঃখের সন্তান, কষ্ট যন্ত্রণার ক্রোড়ে লালিত, কষ্ট যন্ত্রণা তাঁহাদিগের ধাত্রী, শোকভারে অবনত, একটী পয়সার সংস্থান নাই, অথচ এমন ব্যক্তিও চীৎকার করিয়া স্বীয় তেজ প্রকাশ করিলেন, নরপতির বাক্যও গ্রাহ্য করিলেন না। রে সর্পতুল্য দুষ্ট পৃথিবি! একবার এই আলোকের দিকে তাকা দেখি বলিলেন এবং বলিবার জন্যই মরিলেন। তাঁহারা এরূপ বলিলেন কেন? কে জানে ঈশ্বরের লীলা? তাঁহার লীলা কে বুঝিবে? তাঁহারা বলিয়া মরিলেন, পৃথিবীর দুই আনা লোকে তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিল, আর চৌদ্দ আনা লোক অবিশ্বাস করিল। তাহারা তাঁহাদিগকে খড়্গ দ্বারা ছেদন করিল, বিষপান করাইয়া মারিল।

এই যে ইহাঁরা অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন, এ অহঙ্কারের নিকট বিনয় তিলার্দ্ধও নয়। ভাল জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এই অহঙ্কার। বিনয়ের প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু বিনয়ের মূল্য যদি এক পয়সা হয়, তবে অহঙ্কারের মূল্য এক টাকা। বিনয় পৃথিবীর সদ্গুণ, অহঙ্কার স্বর্গের তেজ। বিনয় লোকের ভূষণ, অহঙ্কার ঈশ্বরের বক্ষঃস্থল বিনিঃসৃত পদার্থ। এ স্থলে বিনয় ছোট, অথবা শুদ্ধ বিনয় নয় কিন্তু বিনয়াহঙ্কার স্বর্গীয়। এই অহঙ্কারের নিকট বিনয় কিছুই নয়। আমার ভিতরে এক নবীনতর আলোক দর্শন কর ইহা যিনি বলেন তাঁহাকে অহঙ্কারী বলা অত্যুক্তি হয় না। এই কথাতেই পৃথিবী কাঁপে। যে বলে আমি উপাসনা করি, সাধুতা সঞ্চয় করি, দেশের উপকার করি, কার্য্যালয়ে যাই, তাহার দ্বারা পৃথিবীর কি হইবে? লক্ষ লক্ষ লোক এরূপ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই অচিহ্নিত লোক। ইহারা যত কেন বিনয় প্রকাশ করুক না, ইহারা পৃথিবীর লোক, ইহাদিগের উচ্চ প্রকৃতি নাই, ইহারা চিহ্নিত নহে। বিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহারা এরূপ নহেন। যদিও পাপ আছে, অন্ধকার আছে, তথাপি তাঁহারা জোর করিয়া এমন সকল কথা বলেন, যাহা সাধারণে বলিতে পারে না। তাঁহাদিগের হাত দিয়া অসংখ্য উপকার হয়, তাঁহাদিগের এক এক ফোঁটা রক্ত মহাসাগরের মতন। এমন সকল লোক জোর করিয়া বলিয়া থাকেন, আমরা নিরাকার ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি, তাঁহার নিকটে আছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। এই আমার হাতের ভিতরে নিরাকার ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সর্ব্বাঙ্গে তিনি অবস্থিত আছেন। এই বলিয়া তিনি প্রকাণ্ড আস্ফালন করেন, তেজ প্রকাশ করেন। যিনি বলেন তিনি স্তম্ভিত, যিনি শুনেন

তিনিও স্তম্ভিত। কোটী হস্তী সদৃশ তাঁহার বল, সিংহের ন্যায় তাঁহার তর্জ্জন গর্জ্জন। চৌদ্দ শ ভূমিকম্প, চৌদ্দ শ জল স্ফীত হইয়া তাহার আস্ফালন যদি একত্র করা যায়, তথাপি এক "ঈশ্বর আছেন" তাঁহার মুখে উচ্চারিত এই সত্যের সঙ্গে তাহাদিগের কিছুরই তুলনা হয় না। সত্য মানিব, ঈশ্বর মানিব, কিন্তু তাহা জ্বলন্ত মানুষের মত মানিব। নিস্তেজ ভাবে উপাসনা করিব, ভিতরে ভিতরে আস্তে আস্তে কথা বলিব, এ সকল বিশ্বাসরাজ্যের কথা বলিয়া আমি মানি না। সামান্য মনুষ্য যিনি তিনি পৃথিবী কাঁপাইতে পারিবেন না। আমার বিশ্বাস জ্বলন্ত অগ্নিসম্ভূত হইবে। এক দুই এক শত লোক সেই বিশ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়া কথা বলিবেন, তাঁহাদের চক্ষু হইতে অগ্নি বাহির হইবে। বিশ্বাসের কথা জ্বলন্ত, দুর্ব্বল শক্তিবিহীন নহে।

পরমেশ্বর আমার কাছে আছেন। বলিলাম যাও, গেলেন না। বলিলাম স্থানান্তরিত হও, স্থানান্তরিত হইলেন না। পুনরায় বলিলাম যাও এ ঘরে কেন, অন্য লোকের ঘরে যাও, আমি দ্বার বন্ধ করি। অগ্নির সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম, অবাক পুরুষ নিরুত্তর কথা নাই। এরূপ কাহার ঘরে কি কোন দিন হয় নাই? দুই ঘণ্টা সমক্ষে চৌকীতে বসিয়া আছেন, আলোক নির্ব্বাণ হইল না। এ কি কল্পনা? পরীক্ষা করিয়া দেখ সত্য, বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে শূন্য নহে, ঈশ্বর। এটী দৃঢ় সংস্কার যে ঈশ্বরই বটেন। তুমি বলিলে, হে ঈশ্বর, তুমি অন্ন আনিও না আমি আনিব, তিনি মানিলেন না। দুঃখে কষ্টে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিবে, অতএব ঈশ্বর নিজ হস্তে অন্ন আনিয়া দিলেন। সূর্য্য কখনও অন্ধকার হয় না, অন্ধকার কখনও সূর্য্য

হয় না, তেমনই তোমার ঈশ্বর কখনও ঈশ্বর না হইয়া থাকিতে পারেন না। এ সকলই বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। তিনি প্রতিদিন সংসারে দুটী হাজার তিনটী হাজার কার্য্য করিতেছেন। আমার বাড়ীতে, তোমার বাড়ীতে, বন্ধু বান্ধব স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলের সংসারে, তিনি জীবন্ত জাগ্রতভাবে কার্য্য করিতেছেন। যদি চক্ষু থাকে তবে বিধাতার কার্য্য দেখ, কাণ থাকে ত তাঁহার কথা শুন। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এই কথা বলিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই কথা বলিতেছে। এমন ভাল কথা সকলে সাহস করিয়া বলিবে। কল্পিত বিনয়কে পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দাও। সত্যকে সাক্ষী করিয়া বল, এই আমি বলিতেছি আমার ঈশ্বর জ্বলন্ত আগুনের ন্যায়। তোমরা যদি গলায় ছুরী দাও, শরীর রক্তশূন্য কর, তথাপি এই কথা বলিতে ছাড়িব না, আমার ঈশ্বর জ্বলন্ত আগুনের ন্যায়।

ব্রাহ্ম! অন্ন কে দিল? তোমার বাটীর ব্রাহ্মণ। মিথ্যাবাদী নাস্তিক! ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিলে ভ্রমে অন্ধ হইয়া বলিলে, মানুষ তোমায় অন্ন দিল। পাষণ্ড অবিশ্বাসী নাস্তিক! তোমার চক্ষু কোথায় ছিল? অন্ন প্রস্তুত হইতেছে, যদি তুমি আড়ালে থাকিয়া এক পাশ দিয়া বিশ্বাস-নয়নে দেখিতে পাও স্বর্গের দেবতা ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া নিজ হস্তে অন্ন পাক করিয়াছেন, তবে তুমি ব্রাহ্ম, নতুবা তুমি নাস্তিক অবিশ্বাসী। তুমি কেবল মুখে ঈশ্বর মান, প্রকৃত ভাবে তুমি ঈশ্বর মান না। তুমি বলিলে কি না অন্ন টাকা কাপড় অমুকে আনিয়া দিল? অবিশ্বাসী, আগুনে তোমার জিহ্বা দগ্ধ কর। তুমি সংসারে ঈশ্বরকে দেখিলে না। যদি সাহস করিয়া বলিতে পার স্ত্রীর অঙ্গের অলঙ্কার প্রভু স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, ক্ষুধার সময়ে সন্তানগণকে তিনি

খাওয়াইয়াছেন, রোগের সময়ে তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন, তিনি ঔষধ খাওয়াইয়াছেন, তবে আর কিছুরই অভাব থাকে না। কিন্তু এমন কথা কেহ বলে না। অমুক জ্ঞান দিলেন, অমুক গুরু, অমুক আচার্য্য উপদেশ দিলেন, অমুক দশটা টাকা আনিয়া দিল, অমুক অন্ন বস্ত্র দিয়া সংসার রক্ষা করিল, অমুক অভিভাবক হইয়া পরিবার রক্ষা করিল, এইরূপ অমুক অমুক বলিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা হইয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বনাশ।

কোথায় সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা হইবে, না মনুষ্যের প্রশংসা? দুই ঘণ্টা মন্দিরে বসা কি সুখ্যাতি কিনিবার জন্য? ধিক্, ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধিক্! এতদিন উপাসনা করিয়া কি এই হইল? ঈশ্বর রোজ দুই লক্ষ কাজ করিতেছেন, অথচ তাঁহার নাম নাই। সকলের মস্তকের কেশ পক্ক হইতে চলিল, সকলে বৃদ্ধ হইতে চলিলেন, অথচ এই ভ্রম ঘুচিল না! সংসার কই? টাকা কই? মানুষ কি করে? কাকে প্রশংসা দাও? একজনকেও প্রশংসা করিতে পার এমন বন্ধু নাই। সম্পদ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, সহায় নাই, কেবল ব্রহ্মময় জগৎ। চারিদিকে ঈশ্বর। চারিদিকে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লীলা। ভক্তেরা এই লীলা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় তেজের সহিত ইহা বলিলেন। যাই বলিলেন, অমনই পৃথিবী প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিল, বারম্বার অগ্নিতে ফেলিল, বিষ খাওয়াইয়া প্রাণ বিনাশ করিল। একবার হয় নাই, এইরূপ বারম্বার হইয়াছে। তোমরা ঈশ্বরের লীলার কথা বল, তোমাদিগকে মারিবার জন্য জগৎ আক্রমণ করিবে, বিরোধী দল তোমাদিগকে বিনাশ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবে, কিন্তু নিবৃত্ত হইও না।

নিরাশার কথা অবিশ্বাসের কথা বলিও না। বীরপুরুষের ন্যায় বিশ্বাসের সহিত বলিয়া যাও, "এই আমি, এই আমার ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর আমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন, আমার ঈশ্বর আমার সঙ্গে আগুনের ন্যায় জ্বলিতেছেন।" আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও, ঐ যে আমার সম্মুখে ঈশ্বর।

এই জ্বলন্ত অগ্নির সাক্ষী কে কে আছ এবার বলিতে হইবে। "এই তেজ আমায় ঘেরিয়াছে, আর চলিতে পারি না, আর কথা কহিতে পারি না," সাহস করিয়া বল দেখি। নিন্দিত হইবে হও, সংবাদ পত্রে দোষ ঘোষণা হয় হউক, তোমরা ভয়ে মিথ্যাবাদী থাকিও না। চারিদিক হইতে সকলে নিন্দা করুক, গালি দিক, কাল রাত্রিতে ঈশ্বর তোমায় কেমন করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রমত্ত হইয়া জোরের সহিত বল। যদি প্রাণ দিতে হয় তাহাতে কি? কই তোমার তেমন বুক কই, সাহস কই? একজন লোকও কি এরূপ আসিবে না? যদি একজন আইসে, ক্রমে এই বিশ্বাসের উদ্দীপন হইবে। বল দেখি "দুবেলা একটী লোক আমার ঘরে আসেন। প্রবল গ্রীষ্মের সময় জালা হইতে শীতল জল আনিয়া দেন। এ উত্তাপের সময় কে তুমি জল দিতেছ? যাই বলিলাম, শরীর কম্পিত হইল। তাকাইলাম সুন্দর পুরুষ, হাতে জলের পাত্র, করুণাপূর্ণ নয়ন। কিছু বলিলেন না, একবার করুণাদৃষ্টিতে দেখিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া চরণে পড়িলাম। বলিলাম জীবন সার্থক হইল। আজ আমি তোমায় দেখিলাম, আর জীবনে ভুলিব না।" বেদ পুরাণ তুচ্ছ হইল। ধর্ম্মের সব কথা এই কথার মধ্যে। গ্লাস হাতে ঈশ্বর জাগ্রত পুরুষ, শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করিবার জন্য জল আনিয়া

দিলেন। একবার ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জগতের লোকের নিকট বল "এই হাতে শীতল জল, দেখ কে দাঁড়াইয়া আছেন?" এই ঈশ্বর জীবনপ্রদ, এই ঈশ্বরের কথা সকলকে বল। যদি বল আমরা তাঁহাকে দেখি নাই, আমি বিশ্বাস করিব না। পর্ব্বতে বাগানে নদীর ধারে তোমরা কি তোমাদের ঈশ্বরকে দেখ নাই? ঢাকিতেছ কেন? লোকের নিকট বলিতে কি কষ্ট হইতেছে? না এখনও ততটা বিশ্বাস হয় নাই! আর এ সকল কথা ভাল লাগে না। এখন আর কথা চাপিবার সময় নাই। কাঁদিয়া হয়, আর দুই বাহু তুলিয়া নাচিয়া হয়, সকলে আসল কথা বল। তুমি কি এত বড় একটী কথা চাপিয়া রাখিবে? কাণার যদি চক্ষু হইয়া থাকে, সেই আলোক যদি পাইয়া থাক দেখাও। যাহা দেখিয়াছ বল, বলিয়া মর, তোমার নাম থাকিবে। ব্রহ্ম যাহা তোমাকে দেখাইয়াছেন, প্রকাশ কর। ভিতরের কথা বলিয়া যাও, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিবেন, মনুষ্য সন্তান কৃতার্থ হইবে।

ব্রাহ্মের তীর্থ।

রবিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৮০০ শক; ৩০শে জুন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

যদি কেহ বলে আমরা দিন দিন হিন্দু হইতেছি সে কথা ঠিক, সে কথা যথার্থ কথা, কিন্তু কি ভাবে ইহা সত্য? আমরা আন্তরিক আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতেছি। সে কিরূপ? যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম কি না তীর্থভ্রমণ। আধ্যাত্মিক হিন্দু তীর্থ চান, তিনি তীর্থ-প্রিয়, তীর্থ ভিন্ন তাঁহার গতি নাই, তীর্থ ভিন্ন তাঁহার মুক্তি

নাই। আমরাও তদ্রূপ। তবে এই মাত্র যেমন বলিলাম, সমুদয় অন্তরে। জগন্নাথক্ষেত্র, কাশী, বৃন্দাবন তিনটী তীর্থ। তিনেরই মহিমা আছে, তিনেরই মাহাত্ম্য আছে। ইহার তিনটীর একটী পরিত্যাগ করা অসম্ভব। তীর্থগুণ গান করিতে তিনেরই গুণ গান করিতে হয়। তাহাদের গুণ ব্যাখ্যা করা যাউক। সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ হইতে স্বর্গাভিমুখে যাত্রিগণ যাত্রা করেন। প্রথমে যাত্রিগণ জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন। লোকে বলিয়া থাকে, সমুদ্রতটে জগন্নাথক্ষেত্রের মন্দির, চারিদিক হইতে উহার মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিলে আশ্চর্য্য ফল লাভ করিবে। জগন্নাথক্ষেত্রে যাহার ইচ্ছা হইবে সেই অন্ন দিবে। ইহার অর্থ কি, এখানে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? জগন্নাথ শব্দটী হৃদয়ঙ্গম করিলেই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। যিনি সমস্ত জগতের নাথ তাঁহার ক্ষেত্র। জাতিভেদ তথায় নাই। সকলের পিতা সকলের নাথ জগন্নাথ, তাঁহার নিকটে আবার প্রভেদ কি? এখানে নীচ জাতি উচ্চ জাতির মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে সে তাহা ভোজন করিবে। জাতিভেদ স্বীকার করিয়া সেই অন্নের নিন্দা বা অপমান করিলে, সমস্ত জগতের নাথ যিনি তাঁহার নিন্দা এবং অপমান হইবে। এখানে সকলে এক পরিবারভুক্ত এক ধর্ম্মনিয়মে সকলে শাসিত।

এমন মহৎ স্থান ক্ষুদ্র একটী দেশ মধ্যে রাখা যায় না, সঙ্কীর্ণভাবে দর্শন করা যায় না। এখানকার তীর্থ-প্রিয় ব্যক্তিগণের অভিপ্রায় কি? অন্তরে অন্তরে যে ধর্ম্মরাজ্য তাহাই তীর্থ, সমস্ত জগৎ সেই তীর্থের মন্দির। হৃদয় মধ্যে উচ্চতর জগন্নাথক্ষেত্র অবস্থান করিতেছে। এখানে ধনী দরিদ্র মূর্খ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ

চণ্ডাল এক, সকলে এক জগন্নাথের সন্তান, অন্তরে প্রবেশ করিলে এই প্রথম তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম তীর্থে কাহারও প্রবেশ হইয়াছে কি না তাহার নিদর্শন এই যে, যে ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করিয়াছে উচ্চ নীচ বলিয়া তাহার আর ঘৃণা নাই। যাহার আজও উচ্চ নীচ বলিয়া ঘৃণা আছে, সে জগন্নাথক্ষেত্রে যায় নাই। এই প্রথম তীর্থের ধর্ম্মকে আমরা কিছুতেই অশ্রদ্ধা করিতে পারি না। অতএব হে মন! প্রথম তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ কর, নীচের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ কর, ভ্রাতা বলিয়া সকলকে আলিঙ্গন কর, জগতের নাথ যিনি তাঁহার সন্তান জানিয়া এক পরিবারে আবদ্ধ হও। আর বাহিরের জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার কিছু প্রয়োজন নাই, হৃদয়ের মধ্যে যে জগন্নাথক্ষেত্র আছে, তাহাতে বসিয়া দেখিবে মনুষ্যের প্রভেদ নাই। সেখানে জগতের নাথ হৃদয়নাথকে যত অন্তরের অন্তরে দেখিব ততই দেখিতে পাইব, সকলে এক হইয়া গিয়াছে, কিছুমাত্র ভেদাভেদ নাই।

জগন্নাথক্ষেত্রে যখন দেখিলাম সকলে এক হইল, তখন তথা হইতে কাশীধামে চলিলাম। ক্রমাগত উত্তরের দিকে যাইতে যাইতে কাশীধামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কাশীতে গিয়া দেখি, সেখানে কেবল বেদ আর উপনিষৎ; সেখানে কেবল যোগের কথা, জ্ঞানের কথা, তত্ত্বের কথা, আর কিছুরই আলোচনা নাই; কেবল ঐ সকলের আলোচনা। সেখানে মহেশ্বর যোগেশ্বর শিবের পূজা হইয়া থাকে। সেখানে কেবল যোগ, কেবল কঠোর তপস্যা। যে স্থান পৃথিবীকে উপনিষদের তত্ত্বে পুষ্ট করিয়াছে সেই কাশী। সে রাজ্যে একটু প্রেমরস নাই, ভক্তির নামটীও নাই। তত্ত্বশাস্ত্র পৃথিবীব্যাপী

ঈশ্বরের সত্তা, ভিতরে এক নিরাকার পরমাত্মা, ইহা ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই, আর কোন বিষয়ের বিচার নাই। বিচার করিতে করিতে যাহা কিছু বাহ্যিক সকল চলিয়া যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে কেবল শুষ্ক জ্ঞান, কঠোর তপস্যা, ভিতরে নিরাকার পরব্রহ্ম। যোগতত্ত্ব কাশীধামে। এখানে অতি প্রাচীন মত। চারি সহস্র পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, সেই সকল ব্যাপার ভিন্ন এখানে আর কিছু নাই। প্রাচীন মত, প্রাচীন তত্ত্ব, প্রাচীন বিষয় লইয়া পাণ্ডিত্য, প্রাচীন বিষয় লইয়া বিচার। এখানে অন্য দেবতা নাই, কেবল যোগেশ্বরকে গ্রহণ। যিনি যোগসাধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাকে সমক্ষে রাখিয়া সকলে পূজা উপহার অর্পণ করে।

এই সকল বাহ্যিক ব্যাপার হইতে বিমুখ হইয়া, অন্তরের অন্তরে যে কাশী আছে, তাহাতে প্রবেশ করি। দ্বিতীয় তীর্থ, সাধন আরম্ভ হইল। এখানে যোগ দ্বারা পার্থিব বিষয় সকল ছাড়িতে হইবে। যাহারা কাশীতে বাস করে, তাহারা সংসার ছাড়িয়া শেষ বয়সে কাশীবাসী হন। সংসার-বাসনা না ছাড়িলে কেহ আধ্যাত্মিক কাশীতে প্রবেশ করিতে পায় না। সংসার ছাড়িয়া, আসক্তি ছাড়িয়া স্ত্রী পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়া, শেষ জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করাই কাশী। হৃদয়ের মধ্যে এমন স্থান আছে, যেখানে আসক্তি রহিত হইয়া উপনিষৎ, বেদ, দর্শন, যোগ, সমাধিসাধন ও আলোচনা করা যায়। সেই স্থানে যাইতে হইলে, অনাসক্ত হইতে হয়। এখানে প্রবেশ করিলে আর সংসারের সমুদয় কোলাহল নিবৃত্ত হইল। এখানে চুপ করিয়া বসিয়া প্রাচীন ঋষিগণের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা কর, আধ্যাত্মিক যোগের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর। লোকে

বলিয়া থাকে, মহেশ্বর কাশীতে মৃত ব্যক্তিদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দেন, তাহাতে লোকের শিবত্ব লাভ হয়। এ কথার অতি সুন্দর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। সংসারে যে মৃত ছিল সে এই আন্তরিক কাশীতে প্রবেশ করিয়া পবিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সাংসারিক প্রকৃতি ভুলিয়া যায়, নীচ শারীরিক প্রবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া দিন দিন দেব-প্রকৃতি সঞ্চয় করে।

অধিককাল এ দেশে থাকিয়া যোগ হইল, কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটী তীর্থ আছে। এখানে সমুদয় পাওয়া যায় না। কাশীতে মন স্থির হইল, সংসার ছাড়িয়া মন বলিল, আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না, আরও ভিতরে যাইব, তীর্থ হইতে আরও উচ্চতর তীর্থে যাইব। কাশীতেই কি চিরদিন থাকিব, অন্য তীর্থে যাইব না? আমরা এখান হইতে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত। বৃন্দাবনে কেবলই ভক্তি। অন্য শাস্ত্র এখান হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, আর কোন শাস্ত্র এখানে স্থান পাইল না। এখানে জ্ঞানীর কঠোর তত্ত্বানুসন্ধান বিলুপ্ত হইয়াছে। এখানে নৃত্য কর। ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্ত্তন কর। ভক্তিতে প্লাবিত হও, নামরস পান কর, এই সকল মূল ব্যাপার। এ সকল বোধ হয় যেন প্রাচীন, কিন্তু বাস্তবিক প্রাচীন নয় আধুনিক। আধুনিক হইলে কি হয়, ইহাতে অধিক সুখ দেয়। পরমহংস হইয়া যোগ ধ্যানে নিমগ্ন, কঠোর তপস্যায় অনুরক্ত, এ সকল ভক্তের ভাব নয়; ভক্ত কেবল নৃত্য করেন, হরিগুণ গান করেন, সুখে আনন্দে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেন, তাই ইহার নাম শ্রীবৃন্দাবন হইয়াছে। ফলতঃ ভক্তির শ্রী আছে, লাবণ্য আছে। এখানে আহ্লাদে নিমগ্ন হইয়া

কেবল প্রেমে গড়াগড়ি এবং প্রাণের মুগ্ধ ভাবে এখানে সকলে জ্ঞানশূন্য, রাজপথে ধুলায় অবলুণ্ঠিত, কেবল হরিগুণ গান এবং পরস্পরে ঈশ্বর বিষয়ক আলাপে প্রমত্ত। এখানকার শাস্ত্র হরিনাম, বেদ হরিনাম, পুরাণশাস্ত্র তন্ত্র মন্ত্র সকলই ঐ এক নাম। ভক্তির শাস্ত্রেও সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক হইল, অথচ ভক্তিতে সকলে সুখী হইল। ভক্তিই এখানে বৈকুণ্ঠ, প্রেমানন্দই এখানে স্বর্গ। ইহা ভিন্ন আর কোন স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ নাই। বৃদ্ধেরা বলেন, যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী তাহাদের আবার বৃন্দাবন কই? আমরা বলি আমাদিগের বৃন্দাবন চাই, অন্তরের অন্তরে যে সকল তীর্থ আছে, তাহার সর্ব্বোচ্চ তীর্থ বৃন্দাবন, এবং সমস্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ভক্তিশাস্ত্র। নিরাকার ধ্যান কখনও শুষ্ক নয়, ইহাতে প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, ব্রহ্মের ভিতরে হরির রূপ দেখা যায়। শিবের ভিতরে যেরূপ যোগেশ্বর, তেমনই যোগেশ্বরের ভিতরে হরির মুখ প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি এই আধ্যাত্মিক বৃন্দাবনে মুগ্ধ হইয়াছে, সেই ধর্ম্মের পরমানন্দ লাভ করিয়াছে।

এক ব্যক্তির হৃদয়ে যেমন অগ্রে জগন্নাথক্ষেত্র তার পরে কাশী, তার পরে বৃন্দাবন প্রকাশিত হয়, ব্রাহ্মসমাজেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজও সর্ব্বপ্রথমে জাতিভেদ অস্বীকার করে। আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সৃষ্ট, আমাদিগের আবার জাতিভেদ কি? এই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আরম্ভ হয়। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বপ্রিয়, তাঁহারা প্রথমে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া ক্রমে উপনিষদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং যোগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যোগেশ্বর ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান

করিলেন, সংসার আর তাঁহাদিগের নিকটে ভাল লাগিল না। তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া আর সাকারের পূজা করিলেন না, উপনিষদের দেবতা নিরাকার ব্রহ্মের নিকট আপনাদিগকে চিরদিনের জন্য বিক্রয় করিলেন। এইরূপে পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে করিতে ব্রাহ্মসমাজ এখন তৃতীয় তীর্থ বৃন্দাবনের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এখন এই তিন তীর্থই একত্র অবস্থান করিতেছে। কেন না পরিশেষে যে ভক্তিতীর্থে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ উপস্থিত হইলেন, সেখানে প্রথম তীর্থের ন্যায় জাতিভেদ নাই, মন সেই এক পরব্রহ্মে নিমগ্ন, এবং সেই নিরাকার পরব্রহ্মকেই শ্রীহরি বলিয়া পূজা করিতে সকলে প্রবৃত্ত।

তোমরা সর্ব্বদা এই তিন তীর্থকে এক করিতে যত্ন কর। সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথক্ষেত্র, তার পর কাশী ; এই কাশী এবং জগন্নাথক্ষেত্রকে এক করিয়া পরিশেষে ইহার সঙ্গে বৃন্দাবন যোগ কর। তিন তীর্থের মাহাত্ম্য তোমরা শ্রবণ করিলে, এখন ইহার সাধন করিতে থাক। যদি তোমরা হৃদয়ে এই তিন তীর্থ এক করিতে পার, দেখিবে সকল পৃথিবী এক পরিবার হইয়াছে, নিরাকার পরব্রহ্ম হৃদয় মধ্যে দয়াময় পরম পিতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর তাহার চারিদিকে ভ্রাতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ইহাই প্রেমরাজ্য, এখানে আসিয়াই সকলে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়। তাই বলিতেছি তিনকে একত্র কর, সকলে প্রেমানন্দে মগ্ন হও, জাতিভেদ কিছুমাত্র রাখিও না, কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘৃণা করিও না। সকল মানুষ সেই এক জগন্নাথের সন্তান জানিয়া তাহাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর। নিরাকার ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান কর, পৌত্তলিকগণ যেমন

সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হয়, তেমনই ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসী হও। ব্রহ্মের মধ্যে হরির শ্রীমুখ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে মগ্ন হও। এইরূপে যোগধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইবে, দেখিবে যে সকল মহাপুরুষদিগের বৃত্তান্ত শুনিয়াছ, ক্রমে তাঁহাদিগের সঙ্গে সেই সেই তীর্থে সাক্ষাৎ হইবে। সকলে হরিমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। অন্তরের অন্তরে সেই প্রেমচন্দ্রের দিব্য লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সকল ভাই বন্ধুদিগকে ডাকিয়া লও। এখানে আর কাহার সঙ্গে প্রভেদ নাই। প্রথম দুই তীর্থে ভ্রমণ হইয়াছে। এখন ব্রহ্ম শ্রীহরিরূপে বৃন্দাবনে প্রকাশিত হইয়াছেন, সকলকে সেখানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। তৃতীয় তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে কেবল তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন, নাম শ্রবণ এবং নৃত্য। দয়াময় নাম সাধন করিয়া সকলে মিলিয়া সুখী হও। সেই সময় আসিয়াছে, সেই শুভক্ষণ আসিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া আনন্দিত হও।

মাতৃস্তন। *

রবিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৮০০ শক; ৭ই জুলাই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য কি আছে, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিলাম। বুদ্ধিকে দেশ বিদেশে প্রেরণ করিলাম, কল্পনা শক্তিকে আকাশে উঠাইয়া দিলাম, উহারা সকল স্থান ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য কি দেখিলাম? সাধক, ভক্ত, ঈশ্বরের সন্তান, পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষিগণ, একবার বল দেখি, দেখি সকলের উত্তর এক হয় কি না? পৃথিবীতে এক বস্তু দয়ার নিদর্শন,

পবিত্রতার আধার, ধর্ম্মের উদ্বোধক, সমুদয় মীমাংসার আস্পদ, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কীর্ত্তিস্তম্ভ, বেদ পুরাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। কি এমন সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু সকলে বল দেখি? উহা দেখিবা মাত্র পুণ্য সঞ্চার হয়, ঈশ্বর আছেন এ কথা আর বলিতে হয় না, আস্তিক নাস্তিক ভক্ত সকলে প্রেমে গড়াগাড় দেন, যন্ত্রণা দূর হয়, শোক বিলুপ্ত হয়, সমুদয় সংশয় ধ্বংস হয়। সেই সামগ্রী যতদিন থাকিবে, মানুষ চিরকাল আস্তিক থাকিবে; ধর্ম্মবৃক্ষে চিরদিন ফল ফলিবে। ভক্ত সাধক ইহার নাম বল। সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য কি আছে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া সদুত্তর দাও। যে প্রাণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, যে প্রাণ ধর্ম্মতৃষ্ণায় কাতর, উহা এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে চায়।

এমন উৎকৃষ্ট বস্তু কি আছে আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। আলোচনা করি, সেই বস্তু স্মরণ করি, দেখি আমার হৃদয় সাধু ভক্তদিগের সঙ্গে মিলে কি না? এক বস্তু আছে, সে বস্তু তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি না জানি না, কিন্তু সংসার-পথে একজন উহার পরিচয় পাইয়াছে, বস্তুটী কি সে বলিতে প্রস্তুত আছে। নাস্তিককে আস্তিক করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর এমন কোন বস্তু দেখা যায় না। সে বস্তুটী একটী ফলস্বরূপ। নারীর দেহবৃক্ষে সেই ফল ঝুলিতেছে। বস্তুর নাম জননীর স্তন। যদি কোন বস্তু বিশ্বাস দিতে পারে, তবে সে এই বস্তু। অপর সকল গুরুর নিকট হইতে নিরাশ হইয়া আসিলে স্তনগুরুর নিকট হইতে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে না। স্তনগুরুর সঙ্গে অন্য গুরু পারিবেন না। সব উপদেষ্টা যেখানে নীরব, অথবা যেখানে তাঁহাদের বাক্য

আকাশে বিলীন হইয়া যায়, এই কোমল উপদেষ্টা সেখানে সফলযত্ন হইবেন ইহাতে আর ভুল নাই। ঈশ্বর মাতার স্তন সৃজন করিলেন ভাবিলে চক্ষে জল আইসে। তিনি অনেক বস্তু সৃজন করিয়াছেন। ফল ফুল বৃক্ষৌষধি সকলই তাঁহার দয়ার কীর্ত্তি। অনেক পাষণ্ডও ইহা দেখিয়া শুনিয়া মুক্ত হয়। চারিদিকে নিদর্শন আছে, মনুষ্য দেখিয়া স্মরণ করিয়া দয়াল নাম কীর্ত্তন করুক, তাঁহার মহিমা দর্শন করুক। সকল বস্তুতে তাঁহার দয়া অঙ্কিত আছে বিশ্বাসী হইয়া এ কথা বলিব; কিন্তু সকল বস্তু দেখিলাম এমন মনোহর বস্তু আর দেখিলাম না। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, অত্যন্ত পবিত্র, ঈশ্বরের প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন। ইহাতে যে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহাতে মার মা জগন্মাতাকে সাক্ষাৎ সকলের নিকটে উপস্থিত করে। শিশুর মুখে স্তন পবিত্র সমাচার ঘোষণা করে। মাতা শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দিতেছেন দেখিয়া, জননীর ক্রোড়ে শিশু সন্তানকে দেখিয়া, আশা হইতেছে আমরা পরিত্রাণ পাইব, আমরাও ঈশ্বরের ক্রোড়ে স্থান পাইব।

শরীরের রক্ত স্তনে গিয়া দুগ্ধ হয় কেন? হাতে রক্ত, গায়ে রক্ত, সর্ব্বত্র রক্ত, স্তনে কেন দুগ্ধ? রক্ত ত পান করা যায় না, তাই রক্ত দুগ্ধ হইল। কে দুগ্ধ যথা স্থানে রাখিলেন, কেই বা স্তনের অগ্রভাগে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া উহাকে শিশুর মুখের উপযোগী করিলেন? কেই বা শিশুকে স্তনে মুখ রাখিতে শিখাইলেন? কে ভালবাসিয়া শিশুর কোন অনিষ্ট *না হয় এজন্য* এই বিঘ্নময় সংসারে এমন অমৃতময় ফল সৃজন করিলেন? মা সুখের বৃক্ষ, সেই বৃক্ষে সেই ফল ঝুলিতেছে। জননীর স্নেহে গূঢ় অমৃতধারা বর্ষিত হইতেছে, ভাবিলে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়। জননীকে কে পাঠাইলেন?

এমন ব্যবস্থা কে করিলেন? ইহার নিকটে কোথায় বিজ্ঞান কোথায় পাণ্ডিত্য? শরীরময় রক্ত, ঐটুকু স্থানে যতটুকু চাই ততটুকু অমৃত কেন? শিশুর মুখ ছোট, উদর ছোট, যেটুকু তাহার চাই সেইটুকু দুগ্ধ আছে। শিশু সঙ্কেত বুঝিয়া স্তনে মুখ দিল, মাতা শিশুর মুখে স্তন্য দিয়া জগৎকে সঙ্কেত করিলেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া সঙ্কেত বুঝিলেন, এবং জননীর শিশু সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা বুঝিলেন! কেহ নিরাশ হইও না এই বেদ পাঠ কর। জননীকে ডাক, এবং তিনি যে ক্রন্দন করিবা মাত্র শিশুর কোমল মুখে স্তন্য দান করেন দর্শন কর। হরিনাম লইয়া ক্রন্দন করিতে আমায় কে শিখাইবে? আমার অবিশ্বাস, আমার নাস্তিকতা, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার আচরণ, কে দূর করিবে? আমি যখন অসৎপথে ভ্রমণ করি, তখন কে আমাকে সেই অসৎপথ হইতে ফিরাইবে? মাতার স্তন দূর হইতে দেখিলেই স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে দৃশ্য দেখিলে নিশ্চয় ভক্ত হইবে, ঈশ্বরে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস সিন্ধুপ্রায় হইবে। স্তনের শোভায় মনে পরম মাতার ভাব প্রদীপ্ত হইবে, স্তনের ভিতরে ঈশ্বরের মুখশ্রী জ্যোতি দর্শন করিয়া ভক্তিতে আর্দ্র হইবে।

এমন বস্তু দেখ, যাহাতে স্বর্গের অমৃতধারা পৃথিবীর অমৃতধারার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন বস্তু রচনা করিলেন। যদি তিনি এ বস্তু সৃজন না করিতেন, কে এই ঘোর সংসারে তাঁহার হইয়া সাক্ষ্য দান করিত। সুন্দর সুস্পষ্ট ভাষায় মাতৃস্তন বলিতেছে, অবিশ্বাসী জগৎ বল কোথা হইতে দুগ্ধ আসিল?

ক্ষুধিত শিশুকে কেহ শিখাইল না, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি নাই, অথচ কেমন সহজ ভাবে সে সেই অমৃত পান করিয়া বাঁচিল। অপরের ধন ধান্য আছে, প্রচুর আহার্য্য আছে, শিশুর কিছু নাই। শিশুর সম্বন্ধে দুগ্ধ অমৃত হইয়া প্রাণ বাঁচাইল পুষ্টিসাধন করিল। তাহার অন্য কোন দ্রব্যে উপজীবিকা হইল না। অবিশ্বাসী জগৎ জননীর স্তনের দিকে তাকাইলে হরিনামামৃতের গুণ বুঝিতে পারে। স্তনের দুগ্ধ স্পর্শ করিলে শরীর মন পবিত্র হয়। কোথা হইতে এই অমৃত আসিল? এই অমৃতে শরীর রক্ষা হইল অথচ নির্ব্বোধ মনুষ্য বুঝিল না কে অমৃতের সৃজন করিলেন? একবার দেখিল না কে জননীর স্তনের ভিতরে থাকিয়া দুগ্ধ নির্ম্মাণ করেন? কে সেখানে বসিয়া বলেন, রক্ত, সাবধান এখানে আসিও না। এখানে তোমার নিজ আকার ধরিয়া আসিলে শিশু মরিবে। তুমি দুগ্ধ হও বলিয়া ঈশ্বর স্পর্শ করিলেন আর দুগ্ধ হইল। জগতের জননী রক্তবিন্দুকে সেই পবিত্র স্থানে দুগ্ধে পরিণত করিলেন। যিনি স্তনরূপ ঘরের ভিতরে নির্জনে থাকিয়া রক্তকে দুগ্ধ করিলেন তিনি কি একজন সামান্য? মধ্যে মধ্যে একবার তাঁহার সেই ভাব দেখি। জগজ্জননীর প্রেমের সীমা কোথায়? তিনি কি আশ্চর্য্য কারখানাই করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য ভাবে শিশুকে বাঁচাইতেছেন! মার ভিতরে কি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমই প্রকাশ পাইতেছে!

জননীর স্তনে যে প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিলে, জগজ্জননীতেও ঠিক এই প্রকার। আকাশ তাঁহার প্রকাণ্ড স্তন। অবিশ্বাসীরা উহাকে শূন্য বলে, কিন্তু শুদ্ধ হৃদয় ধার্ম্মিকেরা উহাকে আকাশ জানেন না, বৃহৎ স্তন বলিয়া জানেন। আমরা সকলে অসহায় অন্ধ,

আমাদিগের প্রত্যেকের আত্মার মুখ সেই অনন্ত জগজ্জননীর স্তনের সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে। যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই সেই মাতার স্তন হইতে আমরা দুগ্ধ টানিতেছি। ভক্তিবিন্দু, অমৃতবিন্দু জননীর স্তন হইতে আমাদিগের মুখে পড়িতেছে। আকাশ আকাশ নয়, আমার মুখ তোমাদিগের মুখ ঠিক সেই জগজ্জননীর স্তনে লগ্ন আছে। অবিশ্বাসী নয়ন সেই স্তন দেখিতে পায় না। একবার ভক্তি-চক্ষুতে দেখ, এখনই দেখিতে পাইবে কেমন আমাদিগের পাপমুখ সেই স্তনে সংলগ্ন রহিয়াছে। সুন্দর মাতৃস্তনের সঙ্গে যখন আমাদিগের মুখ লগ্ন রহিয়াছে আর ভয় নাই। যখন গতিনাথের সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ, জগৎ অন্ধকার হইল ক্ষতি কি, সংসার প্রতিকূল হইল ভয় কি, সেই স্তন মুখে ধরিয়াছি ভয় নাই। শিশুকে ভয় দেখাও, সে আর কিছু জানে না, সে মাতৃস্তন আরও জড়াইয়া ধরে। আমরা দুঃখময় সংসারে আছি, আমাদিগের সর্ব্বদা বিপদ। উপরান্ত আবার লোকে তর্ক করিয়া কুযুক্তি দেখাইয়া আমাদিগকে ভয় দেখায়। আর কিছু করিয়া প্রয়োজন নাই, সেই জগজ্জননীর স্তন জড়াইয়া ধরিয়া নির্ভয় হই। বিশ্বাস ভক্তি জননীর স্তন দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলে, কি চমৎকার! আকাশের মধ্যে স্তন, আমাদের মুখে সেই স্তন। এই স্তনে মুখ সংলগ্ন না থাকিলে বিশ্বাস পাই না, ভক্তি পাই না। মার স্তনে মুখ সংলগ্ন রহিয়াছে, যখনই হৃদয় মরুভূমির সমান হয় সেই দুগ্ধ পান করি আর ভয় নাই। মাকে ডাক, তাঁহার স্তন দর্শন কর, অসহায়তা থাকিবে না। আমার মা নাই, আমায় দেখে এমন কেহ নাই, এরূপ ভুল কেন ভাবিতেছ? জগজ্জননীর স্তন দেখ, স্তনের দুগ্ধ দেখ। মুখ শুকাইয়াছে, যাই

অমৃতের জন্য কাঁদিবে, শিশুর তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়াছে বলিয়া মাতা নিজে আসিয়া তোমায় রক্ষা করিবেন, দুগ্ধ পান করাইবেন। তখনই তুমি তাঁহার ক্রোড়ে স্থান পাইবে। স্থান পাইয়া তাঁহার দুগ্ধের আশ্রয়ে চিরদিনের জন্য তোমার তৃষ্ণা শান্ত হইবে।

আমরা এই চাই যে আমরা ব্রহ্মের কোমল প্রেমে বিশ্বাস করিব। আমরা কেবল শুষ্ক পিতা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চাই না। তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিব, মার কোমল ভাব চক্ষের সম্মুখে দেখিব, মা সন্তান বলিয়া আদর করিবেন। সকল ছেলে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে যাইবে, আর তিনি সকলকে আদরে বক্ষে ধারণ করিবেন, অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি মধুর ধর্ম্ম! দিন দিন কত সত্য আবিষ্কার করিতেছে। আমাদিগের ঈশ্বর ফুরান নাই, আমাদিগের ঈশ্বর ফুরাইবার নহেন। আরও তাঁহার সম্বন্ধে কথা বলিবার শুনিবার আছে। অন্তঃকরণ বলিতেছে আগামী শত শত বর্ষেও তাঁহার প্রেমের কথা শেষ হইবে না। আমাদিগের মার এমন অমৃতবর্ষী স্তন দেখিলে! তিনি ক্রমে আমাদিগের আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। আর কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িব, কেমন করিয়া অপ্রেমিক হইয়া থাকিব? ভাই বন্ধুগণ! আর অপ্রেমিক হইও না। হৃদয় শুষ্ক হইলে ঘোর অপরাধ হইবে। আর এখন অপ্রেমিক থাকিতে পার না, আর এখন শুষ্ক ভাবে তাঁহার পূজা করিতে পার না। মা বলিয়া একবার ডাক, শুষ্কতা কঠোরতা চলিয়া যাইবে। সহস্র কাজ থাকিলেও মা বলিয়া ডাকিতে অবহেলা করিও না। মা শব্দ অতি কোমল। পৃথিবীতে যাঁহার মা আছে তিনি ইহা বুঝিতে পারেন, পৃথিবীতে যাঁহার মা নাই, তিনি আরও

দ্বিগুণ বুঝিতে পারেন। বিপদে পড়িলে যখন তাঁহার সেই দুগ্ধপূর্ণ স্তন ধরা যায় কি আহ্লাদ হয়! বুঝি এখন সেই স্তন দর্শন করিবার জন্য, ধারণ করিবার জন্যই চতুর্দ্দিকে এত গণ্ডগোল। আইস সকল ছাড়িয়া মাতার স্তন দর্শন করিয়া যাহাতে ইহলোকে পরলোকে সদ্গতি হয় তাহাই করি।

শ্লোকব্যাখ্যা। *

সোমবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৮০০ শক; ৮ই জুলাই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

"বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥"

১১, ১৪, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্ত যিনি তিনি রোদন, হাস্য, গান এবং নৃত্য এই চারিটী লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পৃথিবীকে পবিত্র করেন। রোদন, হাস্য, গান, নৃত্য এই চারিটী দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হয়। পুণ্যের এমনই ক্ষমতা, ভক্তির এমনই শক্তি যে, যাহার হৃদয়ে এই শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, সে কোন মতে পৃথিবীকে স্পর্শ করিলেই পৃথিবী পবিত্র হয়। জ্ঞান প্রচার দ্বারা লোকের মন শুদ্ধ হয়, দেশ দেশান্তর ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা পৃথিবী উন্নত হয়; কিন্তু সে এক প্রকার প্রচার। ভক্তির প্রভাব সেরূপ নহে। ভক্ত দ্বার বদ্ধ করিয়া যদি কাঁদেন, হাসেন, গান করেন, অথবা নৃত্য করেন, তাহাতেই পৃথিবী শুদ্ধ হয়। নির্জনে বসিয়া যেখানে ভক্ত গান করিলেন, তাঁহার কোমল কণ্ঠনিঃসৃত সুস্বর সেখানকার বায়ুকে শুদ্ধ করিল। গোপনে ভক্ত নৃত্য করিলেন,

তাঁহার পদাঘাতে পৃথিবী পবিত্র হইল। দশ জনের কাছে গিয়া গোল করিলেই যে পৃথিবী শুদ্ধ হয় তাহা নহে। নির্জ্জনে বসিয়া যদি কাঁদা যায়, হাসা যায়, তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে? গান কর, নাচ, রোদন কর, হাস, পৃথিবীকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোকে দেখিতে না পাইল তাহাতে ক্ষতি নাই, যে স্থানে বসিয়া তোমরা ঈশ্বরের নামে উন্মত্ত হইয়া কাঁদিবে, হাসিবে, গান করিবে, অথবা নাচিবে সেই স্থান শুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে। ভক্তির রোদন, ভক্তির হাস্য, ভক্তির গান অথবা ভক্তির নৃত্য, ইহার এক এক বিন্দু লাগিলে পৃথিবী পবিত্র হয়। ইহার এক এক বিন্দু এক এক টুক্‌রো হীরা। যেমন হীরকের সঙ্গে পয়সার তুলনা হয় না, তেমনই এ সকল ভক্তির উচ্চ অঙ্গের সঙ্গে সামান্য ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপমা হইতে পারে না। এক বিন্দু ভক্তির অশ্রুর মূল্য নাই। ভক্তির উন্মত্ততা যাহা পৃথিবীর উপহাসের বিষয়, তাহাই পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে।

শ্লোকব্যাখ্যা। *

মঙ্গলবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৮০০ শক; ৯ই জুলাই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

১১, ২, ৪৩।

"যিনি সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে স্বীয় পরমেশ্বরকে এবং পরমাত্মাতে সমস্ত মনুষ্যকে দর্শন করেন, তিনি ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি সকল মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। সকল মনুষ্য মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা পরিত্রাণের একটী প্রধান উপায়। মনুষ্যকে দেখিলে কত সময় কত প্রকার কুভাবের উদয় হয়। ইহার এক মাত্র ঔষধ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা। শত্রুকে দেখিলে রাগ হয়, কিন্তু সেই শত্রুর ভিতরেও ঈশ্বর আছেন ইহা জানিলে প্রাণ শুদ্ধ হয় এবং কোন প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় না। স্বীয় পরমেশ্বর, অর্থাৎ আমারই ঈশ্বর সেই শত্রুর ভিতরেও খেলা করিতেছেন, ইহা দেখিতে পাইলে আর শত্রুর প্রতি শত্রুভাব থাকে না। আমারই ঈশ্বর সকল নর নারীর মধ্যে রহিয়াছেন এই ভাবটী সর্ব্বদা মনের মধ্যে জাগ্রত থাকিলে কোনও পাপের ভয় থাকে না। অত্যন্ত পতিত ব্যক্তিও ঈশ্বরের আবাসস্থান, অত্যন্ত কলঙ্কিত শরীরও ঈশ্বরের মন্দির, বিশ্বাস-চক্ষে ইহা দেখিলে আর কেহ মনুষ্যের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে না। মহাপাপীর ভিতরেও ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সকল নর নারীর সঙ্গেই ঈশ্বরের নিগূঢ় অখণ্ড প্রাণের যোগ, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তবে অন্য লোকে পাপ করিয়াছে বলিয়া পাপকে ঘৃণা না করিয়া কেন তাহাদিগকে ঘৃণা করিব? তাহাদিগের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলে মনে পবিত্রতার উদয় হইবে। অত্যন্ত অধার্ম্মিকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন, অতএব অধর্ম্ম ও অধার্ম্মিককে স্বতন্ত্র করিয়া অধার্ম্মিকের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া শুদ্ধতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এইরূপে সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলে আমাদের দৃষ্টি পবিত্র হইবে, এবং আমরা ধন্য হইব।

দুর্গতিহারিণী।

রবিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৮০০ শক ; ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

শরৎকালে বঙ্গদেশ দুর্গোৎসবে প্রমত্ত হন। শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত, এই সময়ে হিন্দুগণ দুর্গাপূজা করেন। ব্রাহ্ম নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মহোৎসবই বটে। চারিদিকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, নারী সকলেই উৎসবের মত্ততায় উন্মত্ত। হিন্দুদিগের এই শ্রেষ্ঠতম উৎসব দর্শনে ব্রাহ্মের চিত্ত উত্তেজিত হইল। তিনি এই উৎসবের অসারাংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ করিলেন। তুষ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মের হৃদয় হিন্দু হৃদয়। হিন্দুদিগের উৎসব হইতে তাঁহার হৃদয় ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি তাঁহার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই উৎসবের সময় তুমিও কি হিন্দুদিগের ন্যায় ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে পার?" হৃদয় হইতে তিনি সায় পাইলেন, বিবেকী ধীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎসব অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যথার্থই দুর্গতিহারিণীর পূজা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিলেন যাহার পূজা করিলে সকল দুর্গতি দূর হয়, আমি ব্রাহ্ম আমি কেন তাঁহার পূজা না করিব? ব্রাহ্ম আরও দেখিলেন, দুর্গতিহারিণীর পূজা করিলে যে কেবল দুর্গতি দূর হয় তাহা নহে; কিন্তু যখন ভক্তের হৃদয়ে দুর্গতিহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ, কার্ত্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া আসেন। ব্রহ্ম তাঁহার সমুদয় স্বরূপগুলি লইয়া সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। পাপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ দিতে যিনি আসেন, তিনি সম্পদ বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন।

ঈশ্বর কি শক্তি সম্পদ-বিহীন হইয়া অথবা অজ্ঞান অকল্যাণ লইয়া আসিতে পারেন ?

লক্ষ্মী ঈশ্বরের সম্পদ, যে সম্পদ লাভ করিলে সকল ধনকে তুচ্ছ করা যায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসন্ন হয় অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যথার্থ সন্তোষ, প্রসন্নতা লাভ করা যায়, ঈশ্বর সেই ধন, সেই লক্ষ্মীকে লইয়া ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতপাবন যখন পতিতকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন তাঁহার এক হস্তে ধন এবং অন্য হস্তে বিদ্যা লইয়া উপস্থিত হন। যিনি সকল জ্ঞানের আকর সেই যথার্থ বিদ্যা সত্য সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া, ঈশ্বর জ্ঞানের জ্যোতি বিকাশ করিতে করিতে সাধকের ঘরে আসেন। এইরূপে যখন ব্রহ্ম সাধকের ঘরে সম্পদ এবং বিদ্যা উভয়ই প্রকাশ করেন, তখন তাহার যথার্থ কল্যাণ হইতে লাগিল এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ, কার্ত্তিক, তেমনই নিরাকার দুর্গতিহারিণীর এক দিকে সম্পদ এবং সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে বিদ্যা এবং কল্যাণ। নিরাকার ব্রহ্ম-সহবাসে ভক্ত যে কেবল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং কল্যাণ লাভ করেন তাহা নহে ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় শীঘ্রই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। সেইরূপ দুর্গতিহারিণী হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে যেমন সকল দুঃখ, দুর্গতি এবং অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সুখ শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের সমাগম হয়। কল্যাণদাতা সুন্দর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, সুতরাং ভক্ত যাহা করেন তাহা হইতে কল্যাণ এবং সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়। যিনি যথার্থ সৌন্দর্য্য, যাঁহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তাঁহারই পূজা

করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পূজা করিতে কাহারও রুচি হয় না।

দুর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অসুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন যথার্থ দুর্গতিনাশিনী মনুষ্যের মনে আপনার নবীন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করেন, তখন তাঁহার অতুল প্রভাব এবং অসীম শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আসুরিক ভাব দলন করে। বস্তুতঃ তখনই দুর্গতিহারিণীর প্রকৃত পূজা হয় যখন অসুর বধ হয়। সমস্ত দেশ যে উৎসবে মত্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে অবশ্যই গভীর উৎসব আছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। বাহ্যিক মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবিষ্কার কর। মিথ্যাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হও। অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিন্দুদিগের এই উৎসবে একাধারে পাঁচটী ভাব লাভ করিবে। সম্পদ, বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিত্রাণ। যে পূজাতে কেবল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রেমিক এবং শ্রীসম্পন্ন হইল, তাহা পূর্ণ পূজা নহে। যে পূজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য্য এ সমুদয় লাভ করা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুবাসনা দুর্ম্মতিরূপ অসুর বধ হয়, সেই পূজাই পাপীর প্রার্থনীয়। অতএব ব্রাহ্মগণ, যিনি দুর্ম্মতি দূর করেন, সেই দুর্গতিহারিণীকে এই সময়ে ডাক। দুর্গতিনাশন ঈশ্বরের পূজা কর। হিন্দুদিগের এই সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় নানা প্রকার অসাধু ভাব প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আবার অনেকের মনে সংসার এবং ধর্ম্মসম্পর্কে নানাবিধ সাধু ভাব সকলও সঞ্চারিত হইবে। এস, আমরাও সেই সকল সাধু ভাব লইয়া

সেই দুর্গতিহারিণী জননীর পাদপদ্ম পূজা করি। নিরাকার হৃদয়-সিংহাসনে নিরাকার দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরস্বতীর ভাব, গণেশের ভাব, কার্ত্তিকের ভাব, সকলই গ্রহণ করিব। ভারতবর্ষে অচিরেই সেই শুভদিন আসুক, যখন মূর্ত্তি পূজা চলিয়া গিয়া নিরাকার সুন্দর ব্রহ্মপূজা হইবে। সেই নিরাকার জননীর পূজা করিয়া এস প্রিয় দেশকে পাপ, পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করি। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে অধিকার দিন!

দুর্গতিহারিণীর বিসর্জ্জন নাই। *

রবিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৮০০ শক ; ৬ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

গত কল্য দুর্গা প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল, বঙ্গদেশ আবার যেন ম্লান হইল; কিন্তু দুর্গতিহারিণীর বিসর্জ্জন হয় না, ব্রহ্মদেশও ম্লান হয় না। যদি বহু যত্ন করিয়া মূর্ত্তি গঠন করিলাম, নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য দ্বারা সেই মূর্ত্তিকে বিভূষিত করিলাম, এবং আদর করিয়া সেই মূর্ত্তির পূজা আরম্ভ করিলাম তবে বিসর্জ্জন করিব কেন? যদি লক্ষ্মীকে আনিয়া ঘরে বসাইলাম তবে তাঁহাকে আবার গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব কেন? ভয়ঙ্কর দশমী ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের এই পরম সৌভাগ্য। ব্রাহ্ম হইয়া সপ্তমী, অষ্টমী নবমী পূজা করিব; কিন্তু দশমী পরিত্যাগ করিব। যাহাকে কত ভালবাসিলাম, কত ভক্তি প্রেম উপহার দিলাম, সেই আদরের সুন্দর মূর্ত্তিকে কি জলে ফেলিয়া দিব? জলে বিলীন হইবে সেই সোণার প্রতিমা? সত্যধর্ম্ম, তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে

বাঁচাও। এতদিনের উৎসবের পর আবার যেন দুঃখের জলে ভাসিতে না হয়। যোগ হইল কি বিয়োগের জন্য? এমন প্রেম ভক্তির যোগের পর কি এই বিচ্ছেদ সহ্য হয়? ঈশ্বর কি কেবল তিন দিনের জন্য ভক্তের ঘরে আসিবেন? যদি ব্রহ্ম দয়া করিয়া আমাদিগের দেশে আসিলেন তবে চতুর্থ দিনে যেন তাঁহার পূজা নিঃশেষিত না হয়। যদি পৃথিবীতে চির-নবমী থাকে, তবে আমরা দুর্গতিহারিণীর পূজা করিব। যদি উৎসবের পর আবার শোক আসে, শুভদিনের পর আবার কালরজনী আসে, তবে অল্পক্ষণের জন্য ব্রহ্মপূজা করিয়া কি হইবে? কিন্তু ধন্য দয়াময় যে, তিনি এমন নিয়ম করেন নাই! তাঁহার এই নিয়ম যে, যতই আমরা প্রেম ভক্তি উপহারে তাঁহার পূজা করিব, ততই তিনি আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া চিরকাল আমাদিগের সঙ্গে থাকিবেন।

যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজাতে বিচ্ছেদ, বিসর্জ্জন নাই। যথার্থ দুর্গতিবিনাশন ঈশ্বর, যতদিন ভক্তের দুর্গতি হরণ করিতে না পারেন, ততদিন তাহার সঙ্গে থাকিবেন। তিন দিনের পূজাতে অসুর বধ হয় না। মনুষ্য-হৃদয়ের অসুরকে ঈশ্বরের পরাক্রমরূপ জীবন্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। কবে সেই যথার্থ দুর্গতিহারিণী সিংহবাহিনী হইয়া আমাদিগের ঘরে আসিবেন? কবে জননী পুণ্যের সিংহ, প্রেমের সিংহ লইয়া আসিয়া আমাদিগের মনের অসুর বধ করিবেন? যতদিন না অসুর বধ হয়, ততদিন ত যথার্থ ঈশ্বরের পূজা হইল না। ঈশ্বর যে মনকে অধিকার করিয়াছেন। তাহা বুঝিব কিরূপে? ফল দ্বারা। অসুর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল, তবে ত বুঝিব যে অসুরনাশিনী জননীর পূজা

হইল। মনের সকল দুর্গতি চলিয়া যাইবে, তবে ত জানিব যে যথার্থ দুর্গতিহারিণী অন্তরে আসিয়া বসিয়াছেন। যদি সত্যই যথার্থ দুর্গতিনাশন ঈশ্বর দয়া করিয়া বঙ্গদেশনিবাসীদিগের মনের মধ্যে আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার অব্যর্থ তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকলের দ্বারা আমাদিগের আসুরিক বৃত্তি সকল ছেদন করিবেন। সমুদয় অসুর তিনি বিনাশ করিবেন। যতই তিনি আমাদিগের অন্তরের অসুর সকল নিপাত করিবেন, ততই আমরা "ব্রহ্মের জয়" "ব্রহ্মের জয়" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, তখন কি আমরা দশমীর বিজয়া ভাবিতে পারিব? সে সময় কি আমরা ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতে পারিব? চিরকাল দুর্গতিনাশন ব্রহ্মকে আমরা বক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিব।

তিনি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক, সকলকেই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিব। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সকল সম্পদ লাভ হয়, এবং শুদ্ধ সম্পদ লাভ করা যায় তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য, পুণ্য, তেজ সকলই লাভ হয়। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে, সেই সম্পদ পাওয়া যায় যাহাতে সংসারের সকল সম্পদ তুচ্ছ বোধ হয়, এবং সেই বিদ্যা লাভ হয় যাহা দ্বারা বিনয় বৃদ্ধি হয়। যিনি সমুদয় গুণের আকর ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে নিত্য ধারণ করেন, তিনি বিজয়া স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করেন না। যথার্থ ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর তাঁহার সমুদয় স্বরূপ সকল লইয়া নিয়ত প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয়ে কত প্রেমের তরঙ্গ, কত নূতন নূতন ভাবের প্রসঙ্গ কে তাহা জানিবে? দুর্গতিহারিণীর সাধক

কত সুখে সুখী! যতই সাধক গভীরতর ভক্তির সহিত তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন, এবং তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরেন, ততই আরও তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী, বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য সকলই বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহার আন্তরিক অসুর নষ্ট হয়। বাহ্যিক পূজায় পৌত্তলিকেরা নির্জীব দুর্গার নিকট কয়েকটা পশু বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু অন্তরের অন্তরে যিনি যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজা করেন তাঁহার বলিদান শেষ হয় না। দুর্গতিহারিণী ক্রমাগতই তাঁহার সাধকের সমুদয় শত্রু বিনাশ করিতে থাকেন।

এইরূপে সাধক যতই শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হন ততই তিনি তাঁহার দেবতার প্রেমমুখে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। যদি তাঁহার দেবতা কদাচ মলিন ভাব ধারণ করিতেন, তবে ব্রহ্মসাধক সেই কল্পিত দেবতাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন না, কেন না যতই তিনি ব্রহ্মের মুখের পানে তাকান, ততই তাঁহার মধ্যে তিনি নব নব সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং তাঁহার আনন্দ বাড়িতে থাকে। তিনি দেখিতে পান জীবনের এক এক বৎসর, এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার দেবতার প্রেমমুখ আরও উজ্জ্বলতর এবং সুন্দরতর হইয়া তাঁহার নিকট অধিকতর মনোহর এবং প্রিয়তর হইতেছে। এবং তাঁহার প্রেম ভক্তি, উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতেছে। বঙ্গদেশে দুর্গা পূজা শেষ হইল বলিয়া কি ব্রহ্মদেশের দুর্গতিহারিণীর উৎসব শেষ হইবে? বাহ্যিক অসার ভাব শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভিতরের সার ভাব ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়। ভারতবর্ষে যতদিন পর্য্যন্ত না যথার্থ দুর্গতি-

হারিণীর পূজা প্রচলিত হইবে ততদিন পুরাণ বৃথা। দশভুজার অর্থ কি? অসুর বিনাশ করিয়া ঈশ্বর পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অসীম পরাক্রম অথবা অনন্ত বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন, ইহা দেখাইবার জন্য এই পুরাণের সৃষ্টি।

ব্রাহ্মগণ, এই উৎসব হইতে তোমরা ঈশ্বরের দুর্গতিহারিণী শক্তির পূজা করিতে শিক্ষা কর। যে পূজা দশমীর বিজয়াতে শেষ, তাহা তোমরা পরিত্যাগ কর। তোমরা তিন দিনের জন্য ব্রহ্মকে ঘরে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। নিত্য ব্রহ্মপূজা করিব এই আমাদের আশা। মনুষ্যের হস্তরচিত পুতুল বঙ্গদেশের প্রেম ভক্তি উদ্রিক্ত করিল; কিন্তু তিন দিনের পূজার পর আবার তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল। আর এক দিকে প্রাণের পুতুল, যথার্থ প্রেমের বর্ণে রঞ্জিত, পরম সুন্দর এবং মনোহর, কার সাধ্য তাঁহাকে বিনাশ করে। তাঁহাকে কিরূপে বিদায় দিবে? অনন্তকাল তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ঈশ্বর এই ভারতবর্ষে দিন দিন তাঁহার জীবন্ত পূজা বিস্তার করুন! যেন সকলেই দেখিতে পায় যে, যথার্থ দুর্গতিহারিণী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তিনি অসুর বধ করিয়া সকলকে বিদ্যা, সম্পদ এবং কল্যাণ ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম অন্ধ, এখনও সেই দুর্গতিহারিণীর মূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই। কোথায় সেই মূর্ত্তি? এমন স্থান কি আছে যেখানে দুর্গতিনাশন ঈশ্বর লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গণেশ, কার্ত্তিককে সঙ্গে লইয়া বাস করিতেছেন? আছে, সেই মূর্ত্তিকে কুমারটুলী হইতে কিনিয়া আনিতে হয় না, কিন্তু আমাদিগের ভিতরের স্বভাব হইতে উদ্ভূত হয়। বাহিরে যেমন সকলে সাকার মূর্ত্তির উৎসবে মত্ত হইয়া

রহিয়াছে, ভিতরেও তেমনই জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া ভক্ত যথার্থ উৎসবের আনন্দে প্রমত্ত হন, ভিতরে সেই সুন্দর নিরাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের সমুদয় কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তের চক্ষু বাহিরের অসার পুতুল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের প্রাণের পুতুলকে দর্শন করে। এস অসার বস্তু ছাড়িয়া মনের মধ্যে নিত্য প্রকৃত দুর্গাতিহারিণীর পূজা করি। ব্রহ্মপূজার শেষ নাই। এখানে দশমী নাই। ব্রহ্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না, একবার যিনি আমাদিগের ঘরে আসিয়াছেন, চিরকাল তিনি সেখানে থাকিবেন। যে পূজা ফুরাইল তাহা মূর্ত্তিপূজা; কিন্তু নিরাকার যথার্থ দুর্গাতিহারিণীর পূজার শেষ নাই, সেই পূজা ক্রমাগত অনন্তকাল চলিবে। ঈশ্বরের মনোহর প্রেমমুখের প্রতি প্রকৃত ব্রাহ্মের প্রেম ভক্তি দিন দিন বাড়িবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে নিত্য সেই প্রেমময়ী দুর্গাতিহারিণীর পূজা করেন।

শারদীয় উৎসব।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৮০০ শক;
১১ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

গ্রীষ্মের পর শরৎ, উত্তাপের পর জল বর্ষণ, যন্ত্রণার পর সুখ, পাপ সন্তাপের পর আত্মপ্রসাদ এবং শান্তি। ভয়ানক গ্রীষ্মের উত্তাপ পৃথিবীর ভূমিকে জর্জ্জরিত করিল, নদী, সরোবর, বৃক্ষ, পল্লব প্রভৃতি সকলই শুষ্ক হইল, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবী রসশূন্য হইল। যতই গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই দগ্ধ পৃথিবী

শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আরও জলের জন্য কাতর হইল। দীপ্তশিরার অভিষেকের প্রয়োজন হইল। আকাশের মেঘ যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিল। আকাশে অপর্য্যাপ্ত জল সঞ্চিত ছিল, পৃথিবীর দুঃসময় দেখিয়া আকাশ সহস্রধারে সেই বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। দিবসযামিনী ক্রমাগত জল বর্ষণ হইতে লাগিল, পৃথিবীর আর আনন্দের সীমা নাই। দুঃখের আলয় মরুভূমি সকল উর্ব্বরা হইল। প্রচুর শস্য উৎপাদন করিয়া সে সমস্ত সহাস্য ভাব ধারণ করিল। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কল! এক দিকে যেমন উত্তাপ বৃদ্ধি হইল, অন্য দিকে তেমনই জল বর্ষণ হইতে লাগিল। উত্তাপের পর বারি বর্ষণ, দুঃখের পর সুখের অভ্যুদয়, ভৌতিক জগৎ এবং ধর্ম্মজগতে মঙ্গলময় ঈশ্বরের এই নিয়ম দেখিতেছি। শুষ্ককণ্ঠ না হইলে বারি বর্ষণ হয় না। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল করে, সেইরূপ স্বর্গের সুখ শান্তি, পাপ তাপে দগ্ধ দুঃখীকে সুশীতল করে।

শরৎ কেবল বারি বর্ষণ করে তাহা নহে; কিন্তু ইহা আবার শস্য উৎপাদন করে। পৃথিবী সমস্ত বৎসর শস্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। জল যদি না হয়, ধান্য হয় না। এইজন্য সমস্ত পৃথিবীর লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে. আকাশে একখানি মেঘ দেখা দিল, আর কৃষকসমাজে কত আনন্দ! মেঘের মূল্য লক্ষ টাকা। আসল চাতক—দুঃখী পৃথিবী। উত্তপ্ত পৃথিবী আকাশের জলের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। পুষ্করিণী, সরোবর অথবা নদী দ্বারা পৃথিবীর সেই আশা পূর্ণ হয় না। কেবল আকাশের সুপ্রসন্নতার উপরেই পৃথিবীর নির্ভর। কখন্ বৃষ্টি হইবে, কখন্ বৃষ্টি হইবে, পৃথিবী কেবল ইহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। একবার বৃষ্টি হইল,

আর সকলেই আনন্দের সহিত বলিল, স্বর্গ হইতে লক্ষ টাকা আজ পৃথিবীতে পড়িল। আকাশ হইতে রাশি রাশি টাকা পড়িল, এই বলিয়া বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রচুর ধনে পৃথিবী ধনী হইল। যখন আকাশ একবার উদারতা প্রকাশ করিল, সেই উদারতার শীঘ্র শেষ হইল না। ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে লাগিল। এখন আর পৃথিবীতে জলের অভাব নাই। জল পাইয়া মরুভূমি সকল উর্ব্বরা হইল এবং তাহাতে প্রচুর ধান্য সকল উৎপন্ন হইল। ধান্যের মধ্যে লক্ষ্মীর সমাগম হয়, এইজন্যই এই সময় লক্ষ্মী পূজার নিমিত্ত স্থির হইয়াছে। আকাশ হইতে লক্ষ্মী জল হইয়া নামিলেন, পৃথিবী হইতে আবার তিনি ধান্য, শস্য এবং ফল মূল হইয়া উঠিলেন।

শরৎকালে পৃথিবী যে এমন আশ্চর্য্য শ্রী ধারণ করে, লক্ষ্মীর আবির্ভাবই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই উৎপাদিকা শক্তি কোথা হইতে আসিল? এই যে সকল স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, যেখানে বিষাদের হাহাকার শব্দ উঠিতেছিল, আজ সে সকল কিরূপে শস্যপূর্ণ সুশোভিত ক্ষেত্র হইল? যে মাঠ দেখিলে কিছুকাল পূর্ব্বে বিষাদ হইত, আজ তাহা প্রচুর ধান্য প্রসব করিয়া আপনই হাসিতেছে, গৃহস্থকে হাসাইতেছে এবং দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে। শরৎকালে দেখিতেছি প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্মী পূজার সমারোহ। এই ঋতুতে বিশেষরূপে পৃথিবীতে লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশিত। মাঠ যেমন সম্পদ, ঐশ্বর্য্য শ্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিল, আমাদিগের প্রাণও তেমনই হাসিল। লক্ষ্মীর সমাগমে পৃথিবী হাসিল। কবে জীবনের লক্ষ্মী সুখ, শান্তি এবং সন্তোষকে সঙ্গে লইয়া এই

লক্ষ্মীছাড়া হৃদয়ে আসিবেন? পৃথিবীর ধন, মান, সুখ ও সম্পদে বুঝিলাম এই হৃদয় আর সুখী হইবে না। এখন এই তপ্তহৃদয়ে স্বর্গ হইতে যদি প্রেমবারি বর্ষণ হয় তবেই রক্ষা। চিত্তাকাশে যদি ব্রহ্মকৃপারূপ মেঘের সঞ্চার হয়, তবেই এই অনুতপ্ত হৃদয় বাঁচিবে। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! যিনি উত্তাপ প্রেরণ করেন, তিনিই প্রেমবারি বর্ষণ করেন। ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কঠোর হইয়াছে দেখিয়া করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, তাহাদিগের চিত্তাকাশকে মেঘে আচ্ছন্ন করিলেন, আজ কাল সকল স্থানে জলের বিস্তার হইবে, প্রেমবৃষ্টি হইবে। সেই জলে সকলের দুঃখ মোচন হইবে। কাহারও শুষ্ককণ্ঠ শীতল হইবে, কাহারও শূন্য কলস পূর্ণ হইবে, কাহারও পুষ্করিণী স্ফীত হইবে। জননীর স্নেহ, ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত করুণা, প্রেমময়ের মুক্তিপ্রদ বাৎসল্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইলে আর কি কাহারও দুঃখ থাকে? শুষ্ককণ্ঠ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কাতর প্রাণে ঈশ্বরের কৃপাবারি প্রার্থনা কর, তোমাদিগের উত্তাপ, শুষ্কতা সকলই চলিয়া যাইবে।

যখন পাপী নিরুপায় হইয়া জগজ্জননীকে ডাকে, জননী তাহাকে দেখা না দিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন না। পাপী করযোড়ে বলিল হে জগতের জননী, কৃপা করিয়া জীবনের লক্ষ্মীরূপে এই দুঃখীর ঘরে এস। এই প্রার্থনা করিতে করিতে, তাহার হৃদয়ে স্বর্গ হইতে স্নেহবারি বর্ষিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে প্রেমবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পাপী পাগল-প্রায় হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যে কৃতাঞ্জলিপুটে মার নিকট কাঁদিতেছিল, সে এখন বাহু তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। স্বর্গের স্নেহজলে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। সেই জল ক্রমাগত গড়াইতে লাগিল। এক হৃদয়

হইতে অন্য হৃদয়ে চলিল, এক নগর হইতে অন্য নগরে চলিল, এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিল, এইরূপে সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিতে চলিল। সেই জলে কেবল শুষ্ক-কণ্ঠ জীবদিগের তৃষ্ণা নিবারণ হইল তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের ক্ষুধা শান্তি করিবারও উপায় হইল। স্বর্গের সেই কৃপাবারি তাহাদিগের মরুভূমি তুল্য কঠোর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হৃদয় নিহিত স্বর্গীয় বীজ সকল অঙ্কুরিত করিল। সে সমুদয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিল। হৃদয়ের মধ্যেই একটা মনোহর প্রেমের বাগান হইল, সেখানে নিত্য সুন্দর এবং সুগন্ধ পুষ্প সকল এবং সুমধুর ও পুষ্টিকর ফল সকল জন্মিতে লাগিল। নিত্য প্রেম-ফুল এবং ভক্তি-ফল সকল ভোগ করিয়া তাহাদিগের জীবন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনের ভিতরেই আশ্চয্য শরৎকালের শোভা প্রকাশিত হইল। নব নব ভাবের শোভা, নব নব ফলের আস্বাদন! নিজের চিত্ত মধ্যেই কত শস্য জন্মিল।

ভক্ত বলিল, আমি আর কত খাব? আমি খাব, আমার স্ত্রী পুত্র সকলকে খাওয়াইব, প্রতিবাসীদিগকে খাওয়াইব। এ সকল বলিতে বলিতে তাহার ভক্তি কৃতজ্ঞতা আরও বাড়িতে লাগিল। তখন ভক্ত প্রসন্ন মনে দয়াময়ের গুনকীর্ত্তন করিতে লাগিল। যে দিকে নেত্রপাত করেন, ভক্ত দেখেন চারিদিকে কেবলই লক্ষ্মীশ্রী, কেবলই অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্য। দুঃখের পর সুখ, অনুতাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃষ্টি, শারদীয় উৎসবের এই শাস্ত্র, এই অর্থ। শারদীয় উৎসবের এই শোভা গগন এবং পৃথিবী উভয়কেই মনোহর করে। আহা, ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! কি অসীম

জীববাৎসল্য! তাঁহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্মীপূজা হইতেছে। জীববৎসল ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেঘকে আজ্ঞা দিলেন, মেঘ, তুমি বন্ধু ভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। মেঘ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল সুশীতল করিল তাহা নহে; কিন্তু পৃথিবীর উর্ব্বরতা অথবা উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়া জীবদিগের প্রাণরক্ষার জন্য রাশি রাশি শস্য সমুৎপন্ন করিল। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপে স্বর্গ হইতে বারি বর্ষণ হয়। ভক্তবৎসল পরিত্রাতা, দুর্গতিহারিণী জগন্মাতা যখন দেখিতে পান যে, মনুষ্য সকল পাপ তাপে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার দুঃখী পুত্র এবং দুঃখিনী কন্যাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাঁচিতে পারে না। মনুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মনুষ্যের পরিত্রাণ হয় না। স্বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে স্বর্গ হইতে কৃপাবারি বর্ষিত হইবে? কবে যথার্থ লক্ষ্মীশ্রীর সমাগমে প্রচুর ধন ধান্যে সুশোভিতা শারদীয়া প্রকৃতির ন্যায় ব্রাহ্মসমাজও হাস্য করিবেন? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার পাদপদ্মরূপ অক্ষয়-ধন-রত্ন লাভ করিয়া চিরসুখী হই।

দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথীবক্ষে

পূর্ণিমা, সায়ংকাল, শুক্রবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৮০০ শক ;
১১ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রাতঃকালে শরৎসূর্য্য আমাদিগের শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইয়াছেন, সায়ংকালে শরচ্চন্দ্র আমাদিগের সায়ংকালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী হইতেছেন। প্রাতঃকালে স্থলে উৎসব ভোগ করিয়াছি, সায়ংকালে জলে উৎসব ভোগ করিতেছি। এই ভাগীরথী বহুকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, নানা দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। ইহার মধ্যে কত কোটী কোটী লোক অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন যোগী ঋষিদিগের প্রিয়তম নদী। ইহাঁর উভয় পার্শ্বে তাঁহারা কত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁর তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্তিতে গদগদ হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিয়াছেন! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন! কত সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন! এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে, সহজেই ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপন হয়। ভাগীরথীর দুই দিক আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভৌতিক কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটী প্রধান গৌরব। কত বৎসর যে এরূপ করিয়া ভাগীরথী চারিদিকে ভৌতিক এবং অধ্যাত্মিক শ্রীবর্দ্ধন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন, কেহ বলিতে পারে না। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এই গঙ্গানদী। ইহাঁর

দুই কূল হইতে যে ঈশ্বরের নিকট কত স্তব স্তুতি, কত আরাধনা প্রার্থনা উঠিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিবার জন্য গঙ্গা এখনও আপনার বক্ষ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্রীবৃদ্ধির কারণ এই গঙ্গা।

শরৎকালে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। এ সময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য এমন আর কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গঙ্গা চিরকালই ভারতের কল্যাণদায়িনী; কিন্তু শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতের গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গা হইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, যাহা দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নানা প্রকারে দেশের লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব না? দেখ আজ গঙ্গার কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। একে ত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভাই হইয়াছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সুমন্দ সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য এ সমুদয় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয় মুখকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সুন্দর করিয়াছে! এই কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মী পূজার সময়। এইজন্যই বুঝি শরৎকালে লক্ষ্মী পূজার বিধি হইয়াছে। বঙ্গদেশে কত সহস্র সহস্র লোক আজ হৃদয়ের আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী পূজা করিতেছে। আমরাও আজ আশা করিয়া এই ভাগীরথীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্ষ্মী পূজা

করিতে আসিয়াছি। যে লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগেরই ঈশ্বরের শক্তি। তাঁহারই বাংসলা চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া, শত শত ক্রোশ দূর হইতে কত অসংখ্য নর নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে, কত দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে করিতে, পরিশেষে এই বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদিগকে প্রচুর ধন ধান্য এবং অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য দান করিতেছেন।

হিমালয়ের গঙ্গা আমাদের গঙ্গা হইলেন। পুরাতন যোগী ঋষি এবং ভক্তদিগের গঙ্গা আমাদের গঙ্গা হইলেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভাগীরথীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আর্য্যদিগকে স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটানা বেগবতী ভাগীরথী এবং ঐ সুধাময় শরচ্চন্দ্র উভয়ে একত্র হইয়া ব্রাহ্মদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন ;—"ব্রাহ্মগণ আজ তোমরা আনন্দ মনে আমাদের প্রভুর গুণ গান কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদিগের ইষ্ট দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিতেন।" ঈশ্বরের ঐ চন্দ্র, আমাদিগের জননীর ঐ চন্দ্র, আজ কেমন সুধাময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন, গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। উভয়ে পরস্পরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এস এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নদী এবং ঐ চন্দ্রের স্রষ্টা, এস সকলে স্থির হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করি, তাঁহার পূজা করি।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক! লক্ষ্মী পূজার রাত্রিতে দয়াল চন্দ্র আমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করুন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত এবং আমাদিগের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক! ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের হৃদয়কে গঙ্গার ন্যায় ভক্তিরসে দ্রবময় কর এবং চিত্তকে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রেমোৎফুল্ল কর। আজ কেহই বিষণ্ণ থাকিও না। মধুময় প্রকৃতি ম্লান মুখকে তিরস্কার করিতেছে। বাহিরে গঙ্গা যেমন দ্রুতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমনই তোমাদিগের অন্তরের ভক্তিনদী প্রেমসিন্ধু ঈশ্বরের দিকে বহিয়া যাউক। বাহিরের চন্দ্র যেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রমা হাসিতে হাসিতে স্বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন;—"ভারত, তুমি আর ম্লান মুখে বসিয়া থাকিও না।"

ব্রাহ্মগণ, আর তোমরা হৃদয়কে নির্জ্জীব রাখিও না। তোমাদিগের চিত্তাকাশে প্রেমচন্দ্রকে উদিত হইতে দাও। মনের অন্ধকার চলিয়া যাউক। গঙ্গার জলপ্লাবনে উচ্চ ভূমি সকলও উর্ব্বরা হইয়াছে। তবে আমরা কেন আর মরুভূমি হইয়া থাকি? ভিতরে ক্রমাগত ভক্তিগঙ্গার জলরাশি বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং সেই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিম্বিত হউক। যেন এই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হইয়া যাই। যখন ভিতরে এই সৌন্দর্য্য দেখিব, তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে পারিব না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ, এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হও। পূর্ণিমা-ভক্ত হও, নদী-ভক্ত হও। এই গঙ্গা-নদী হইতে অনেক উচ্চ

ভাব শিখিয়াছি, সেই উৎকট রোগের সময় ইহার শীতল জলে সুস্থ হইলাম। কয়েক দিন ইহার বক্ষে বাস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া একদিন মনে ইচ্ছা হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিব।

মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোমার কাছে আমি ঋণী। মা গঙ্গা, তুমি কথা কও না বটে, কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও। তুমি প্রাচীন কালের যোগী, ঋষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী। তুমি আমাদের দেশের জননী হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হইতে এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তুত করিবার জন্য তুমি চিরকাল প্রবাহিত হইতেছ। হে গঙ্গে, তোমাকে দেখিয়া আর্য্যগণ কত উচ্চ ভাব শিক্ষা করিতেন। আমাদিগের প্রতিও প্রসন্ন হও। তুমি যেমন নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মপদে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের আনন্দে সেই শ্রীপাদপদ্মে প্রেমবারি ঢালিয়া দিই! তোমা হইতে আমরা ভক্তি শিক্ষা করিব, তোমার হিল্লোল দেখিয়া আমাদিগের প্রেমের হিল্লোল উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথায় কানপুর, কোথায় কলিকাতা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছ, দূরত্ব ভাব না, এবং তোমার মান অপমান জ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়া কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, আবার কত লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু তুমি চিরসহিষ্ণু হইয়া তোমার বন্ধু শত্রু সকলেরই কল্যাণ বৰ্দ্ধন করিতেছ।

আকাশের চন্দ্র, ভারতের চন্দ্র, তুমি বঙ্গদেশের চন্দ্র, তুমিও আমাদিগের সহায় হও। তোমার মুখের শোভা আমাদিগের রাজার

মুখ প্রতিবিম্বিত। আমাদিগের পিতা যিনি পরব্রহ্ম, তিনি তোমার মধ্য দিয়া আমাদিগের পানে চাহিয়া হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোৎস্না ঢালিতেছ। তোমার নিকট বৈরাগ্য শিখিব, কারণ তুমি কিছুই চাহ না, অথচ ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ। চন্দ্র, অবশ্যই তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ। এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার ন্যায় চিরপ্রফুল্ল রাখিতে চাই। এই শারদীয় উৎসব আমাদিগকে স্বর্গের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে শিক্ষা দিক।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বরের মন্ত্র।

রবিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৮০০ শক; ১৩ই অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রহ্মসাধক, তুমি মোক্ষধামের বিষয় কি জান যে নিজ চেষ্টায় সেই স্থান অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে মনে করিতেছ? তুমি বলিতেছ যে "আমি নিজ চেষ্টায় সচ্চরিত্র হইব, নিজে জপ, তপ এবং যোগ, ধ্যান করিয়া তপস্বী হইব, নির্জনে একাকী সাধন ভজন করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব।" হে ভ্রমান্ধ ব্রাহ্ম, ইহা কি হইতে পারে না যে, তুমি যাহাকে স্বর্গধাম বলিয়া কল্পনা করিতেছ, তুমি যাহাকে মোক্ষধামের পথ মনে করিতেছ, তাহা যথার্থ স্বর্গধাম এবং যথার্থ মোক্ষপথ না হইতে পারে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহাই

করিতেছ, যেগুলি তোমার ভাল লাগে তাহাই তুমি ধর্ম্ম বল, দশ জনের সঙ্গে একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য তুমি সকলকেই ছাড়িয়া একাকী আপনি ধার্ম্মিক হইতে চাও; কিন্তু এই পথ মোক্ষধামের পথ নহে। নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করা যথার্থ ধর্ম্ম নহে। যিনি সমস্ত বিশ্বের কর্ত্তা তাঁহার ইচ্ছানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতে পারিলেই যথার্থ ধর্ম্মসাধন হয়। তিনিই যথার্থ ধর্ম্মের সাধক যিনি ঈশ্বরের অধীন। নিজের স্বতন্ত্রতা থাকিবে না, যিনি সমস্ত বিশ্বযন্ত্র চালাইতেছেন সেই ঈশ্বরের হস্তের বীণা হইব, তাঁহার বীণা তিনি বাজাইবেন। নিজে কিছুই করিব না, তাঁহার বীণা হইব, যাহা কিছু করিতে হয়, সেই মহাপ্রভু ঈশ্বর করিবেন। ইহাই মুক্তি, ইহাই স্বর্গ। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ঈশ্বরের হস্তের একটী যন্ত্র। নক্ষত্র, সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ সকল ইহার মধ্যে আপন আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহাদিগের একটীও যদি স্থানভ্রষ্ট হয়, সমুদয় বিশ্বযন্ত্র চূর্ণ হইয়া যায়। সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে আমাদিগেরও আপন আপন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা সকলে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য, সুনিয়ম সকলই লক্ষিত হয়। সকলের ঐকতান বিশিষ্ট একটী সুমধুর সঙ্গীত উত্থিত হয়। প্রতিজনেই সেই যন্ত্রের এক একটী ক্ষুদ্র অংশ। তুমি তোমার স্থান ছাড়, সেই কল চলিবে না, সেই বীণা বাজিবে না, সুস্বর উঠিবে না, ভয়ানক কর্কশ ধ্বনি উঠিবে। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া যদি নিজের ইচ্ছামত কেহ খুব ভক্তির উন্মত্ততা প্রকাশ করে, অথবা অনেক ধ্যান করে, তাহাকে ধার্ম্মিক বলিব না; কিন্তু যে কেবল যথা স্থানে বসিল, আর তাহার হৃদয়-বীণা

বাজিল, তাহাকেই যথার্থ ধার্ম্মিক বলিব। যন্ত্রীর হস্তে থাকাই সত্য ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে কত ধর্ম্ম আসিল, আর চলিয়া গেল; কিন্তু এখনও একটী সুন্দর পরিবার হইল না। স্বর্গরাজ্য এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। তুমি কেবল যন্ত্র হইয়া থাক, যন্ত্রীর ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়, তুমি কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে তোমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া যন্ত্রটী বিকল কর। যন্ত্রটী যাহাতে চলে তজ্জন্য প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে। স্বেচ্ছাচারী হইয়া যে ধর্ম্মসাধন করে, সে কদাপি মোক্ষধামে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই গর্ব্বিত ধার্ম্মিক সেখানে গিয়া মস্তক খুঁড়িল; কিন্তু দ্বার খুলিল না। কারণ সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া পৃথিবীতে আপনার মতানুসারে কল্পিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছে। এই ভবে আসিয়া মনুষ্যের কি করা কর্ত্তব্য? ঈশ্বর মনুষ্যের জন্য পৃথিবীতে কি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা নরলোকে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হউক, তিনি নরকের মধ্যে স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি চান পৃথিবীর দুঃখী পাপী নর নারী সকলেই স্বর্গের প্রফুল্লতা প্রকাশ করুক। নরাধম মনুষ্য, তুমি কে যে পাপী দুঃখী সকলকে দূর করিয়া দিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ এবং একাকী স্বর্গে যাইবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার সমস্ত সন্তানদিগকে পৃথিবীতে লইয়া আসিয়াছেন, প্রতিজনের হস্তেই তিনি এক একটী কার্য্যভার দিয়াছেন। কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি একজনকে বলিয়াছেন, তুমি মৃদঙ্গ হও, আর একজনকে বলিয়াছেন তুমি করতাল হও, এইরূপে

তিনি প্রতিজনকেই প্রকাণ্ড ঐকতান বাদ্যের এক একটী অঙ্গ হইতে অনুমতি করিয়াছেন। যখন এই সমুদয় অঙ্গ একত্র হইয়া আপন আপন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, তখন ঈশ্বর একবার তন্মধ্যে আপনার শক্তি সঞ্চার করিলেন। তখন সমুদয় যন্ত্রগুলি এমনই আশ্চর্য্যরূপে বাজিয়া উঠিল যে সহজে বুঝিতে পারা গেল, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইতেছে। সমুদয়গুলি যেন একখানি যন্ত্র হইল। প্রতিজনে আপন আপন স্বতন্ত্রতা বিস্মৃত হইয়া গেল। সকলের সম্মিলিত প্রাণ হইতে একটী মধুর সঙ্গীত উত্থিত হইল। এই মিলনের নাম মোক্ষধাম। সমুদয় যন্ত্রগুলি কেবল নিজ নিজ স্থানে বসিলেই স্বর্গধাম হয়।

এই যে মন্দিরের বৃহৎ অর্গান যন্ত্র যাহা হইতে মধুর সঙ্গীত হয়, ইহার অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অঙ্গ সকল আছে। ইহার কোন স্থানে ক্ষুদ্র তার, কোথাও বৃহৎ তার, কোন স্থানে ছোট বাঁশী, কোথাও বড় বাঁশী আছে; কিন্তু এ সমুদয় এমনই সুনিয়মে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, এই বাদ্যযন্ত্র যখন বাজিয়া উঠে, তখন একটী মধুর স্বর উত্থিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের আর স্বতন্ত্রতা থাকে না। সেইরূপ যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সাধক সকল এক পরিবারভুক্ত হইয়া এক প্রাণ হইবেন, তখন আর কাহারও কণ্ঠে কর্কশ ধ্বনি শুনা যাইবে না। তখন ঈশ্বর নিজে সেই যন্ত্র বাজাইবেন। অতএব কেহই যেন আমি একাকী মুক্তিধামে যাইব, এইরূপ মনে করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করে। একাকী শান্তিধামে যাইবার উপায় নাই। যদি যথার্থ শান্তিধামে যাইতে অভিলাষ করি, তবে সকলের সঙ্গে যাইতে হইবে। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি

কিছুই করিতে পারি না। আমি নির্জনে যে পুস্তক অধ্যয়ন করি, তাহাও সমাজের পুস্তক এবং সেই অধ্যয়নও সমাজের কল্যাণের জন্য। আমি যদি গোপনে একটা দরিদ্রকে কিছু অর্থ দান করি, তাহাতেও সমাজের মঙ্গল। আমি একাকী উপাসনা করিয়া যে ফল লাভ করি, তাহাও সমাজের প্রাপ্য। আবার যদি পাপ করি, তদ্দ্বারা সমাজ কলঙ্কিত হইবে। ঈশ্বর সামাজিক প্রকৃতি দিয়া আমাকে গঠন করিয়াছেন, আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারি না। যখন এই প্রকৃতি বুঝিয়া কার্য্য করিব, তখন আমরা সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া প্রকৃতিস্থ হইব। তখন মনে হইবে, সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার লোক। তখন আর কেহই পর থাকিবে না। তখন প্রকৃতিও আপনার হইয়া যাইবে। আকাশের চন্দ্রকে দেখিয়া তখন মন হাসিবে। বাগানের ফুল সকল আমাদিগের হৃদয়ের প্রেমফুলের সঙ্গে আলাপ করিবে। বাহিরে নদী আমাদিগের ভক্তি-নদীকে উচ্ছ্বসিত করিবে। সমস্ত জগতের সঙ্গে তখন আমাদিগের মিল হইবে।

মন আপনি বুঝিতে পারে, কখন যন্ত্র শিথিল অথবা বিকল হয়, এবং কখন ইহার মিল হয়। চোদ্দখানি যন্ত্র চলিতেছে, তন্মধ্যে আমরাও একখানি যন্ত্র। সমুদয়ের সঙ্গে আমাদিগের যোগ হইয়াছে কি না আমাদিগের নিজের বিবেকই তাহা বলিয়া দেয়। সুস্বর হইতেছে, না অমিল হইতেছে, বিবেক-কর্ণ তাহা বুঝিতে পারে। যাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-যন্ত্র ঘুরিতেছে, আমরাও তাঁহারই হস্তের যন্ত্র! সমুদয় যন্ত্রগুলিকে একত্র করিয়া তিনি একখানি প্রকাণ্ড যন্ত্র

বাজাইতেছেন। কোথায় কত শতাব্দী পূর্ব্বে রোমরাজ্যে একটী তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, কোথায় ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় কি সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সমুদয় আমাদিগের সম্পত্তি। অমুক পর, অমুক আত্মীয়, ঈশ্বরের হস্তস্থ যন্ত্রের এই জ্ঞান নাই। ঈশ্বরের হস্তে দুইটী যন্ত্রকে একত্র রাখিলে, একখানি সুর হয়। তোমার এক কার্য্য, আমার এক কার্য্য। তুমি লিখিয়া জগতের সেবা করিতেছ, আমি অনুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছি; কিন্তু দুইজনেই যদি ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র হইয়া কার্য্য করি, দুইজনেরই মধ্যে একখানি ভাব থাকিবে। ঈশ্বর বলেন আমি উভয়কে বাজাইলাম, উভয়ে এক সুর বলে, উভয়েই আমার অনুগত। দুইজন মানুষ গান করিতে গেলে স্বতন্ত্র স্বর হয়; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোটী ভক্ত একত্রে গান করিলেও একটী স্বর হয়। যদি বল অমুক বিদেশী ঋষির সঙ্গে কিরূপে আমার মিল হইবে, কারণ তিনি ম্লেচ্ছ, তাহা হইলে তোমার নিজের বিবেক-কর্ণই বলিয়া দিবে, বিশ্বযন্ত্রের সঙ্গে যখন তুমি সুর মিলাইয়া লইতে পার নাই, তখন তোমার কিছুই হয় নাই; তুমি শান্তিধামে যাইবার উপযুক্ত নও। যতদিন পৃথিবীর একটী লোকের সঙ্গেও তোমার অমিল থাকিবে, ততদিন সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। অতএব কাহারও সঙ্গে বিরোধ রাখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মসাধন অথবা ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন, তাঁহারা যে পৃথিবীতে কীর্ত্তি এবং স্বর্গে মোক্ষ লাভ করিবেন মনে করেন, তাঁহাদিগের এই দুইয়ের কোন আশাই পূর্ণ হইবে না। তাঁহারা একটু স্থির চিত্ত হইলে তাঁহাদিগের নিজের বিবেক-কর্ণই বলিয়া দিবে, যেন তাঁহাদিগের ভিতরের একটী তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

যেন বিশ্বাস তত প্রবল নহে, উৎসাহ তত জ্বলন্ত নহে, প্রেম তত সরস নহে।

বিশ্বযন্ত্র এক দিকে, আমি আর এক দিকে। সংসারের সঙ্গেও মিল হইল না, ধর্ম্মরাজ্যের সঙ্গেও মিল হইল না। আজ স্বর্গের দেবতারা এক সুরে গান করিলেন, আমার কিছুতেই উহাঁদিগের সঙ্গে মিল হইল না। আর একদিন হয় ত এমনই মিল হইল যে বোধ হইল যেন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে, একজন ঋষি স্তব করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ঠিক আমার স্তব মিলিয়া গেল এবং মনে হইল যেন আমিই তিনি, অথবা একদিন এমনই এক প্রার্থনা করিলাম যে, আমেরিকার একজনের প্রার্থনার সঙ্গে তাহা মিলিয়া গেল, মনে হইল তাঁহাতে আর আমাতে কোন প্রভেদ নাই, উভয়েই এক। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে গূঢ়ভাবে এই ঐক্য, অভিন্নতা, সুশৃঙ্খলা, মাধুর্য্য রহিয়াছে. তাঁহার নিকটে আমরা সকলেই একখানি যন্ত্র। অতএব প্রত্যেক ব্রহ্মসাধককে দেখিতে হইবে, পৃথিবীতে কতদূর সেই প্রেম-পরিবার হইল। ফাঁকি দিয়া একাকী মোক্ষধামে যাইবে, কেহই ভ্রমেও এরূপ মনে করিও না। পৃথিবীতে কিসে এই স্বর্গধাম আসে, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। বিবেক-কর্ণে শুন, বিশ্বযন্ত্রের সঙ্গে তোমাদিগের মিলন হইয়াছে কি না। কোথায় কবে চৈতন্য কি বলিয়া গিয়াছেন, কোথায় কখন ঈশা কি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমুদয়ের সঙ্গে তোমাদের মিল রহিয়াছে, তোমরা স্বতন্ত্র নহ, তোমরা প্রকাণ্ড ধর্ম্মরাজ্যের একটী অঙ্গ। বাহিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও তোমরা এক। ব্রহ্মের বড় সাধ সকলকে একত্র করিয়া তিনি বাজান। ঈশ্বর যদি বীণা

বাজাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অবাধে তাঁহাকে বাজাইতে দাও। ইহাতে তোমাদিগেরও মোক্ষধাম লাভ হইবে, এবং ব্রহ্মাও তাঁহার বীণা যন্ত্র হইতে আশ্চর্য্য সুমধুর স্বর বাহির করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিবেন।

ভাই ভগ্নী।

রবিবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৮০০ শক; ২৭শে অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মের অভিধান কেবল দুইটী শব্দ লইয়া। সেই দুইটী শব্দ উচ্চারণ করিলে ধর্ম্মের সমস্ত অভিধান নিঃশেষ হইল। এই দুইটী শব্দ কি? একটী কথা পিতা, অন্য কথা ভ্রাতা। অৰ্দ্ধেক ধর্ম্ম পিতা শব্দের মধ্যে, অপর অৰ্দ্ধেক ধর্ম্ম ভ্রাতা শব্দের মধ্যে। পিতা এবং ভ্রাতা বলিয়াছ তবে তুমি স্বর্গে চলিয়া গেলে। যদি পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পার এবং ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে পার, তবে মুক্তিধাম তোমার নিকটবর্ত্তী এবং মোক্ষধাম তোমার করতলন্যস্ত হইল। কিন্তু এমন মানুষ নাই, যাহার জড়-জিহ্বা এই দুটী শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। পিতা, ভ্রাতা বলিতে পারি না। এই দুইটী শব্দ অত্যন্ত সহজ; কিন্তু বাহ্যিক ভৌতিক উচ্চারণ সম্বন্ধে যেমন সহজ, তেমনই আন্তরিক ভাবসম্পর্কে অত্যন্ত শক্ত। ধন্য তিনি, যিনি ঈশ্বরকে পিতা এবং মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে পারেন! সমস্ত আত্মার সহিত ঈশ্বরকে পিতা বল এবং সমস্ত হৃদয় মনের সহিত মনুষ্যকে ভ্রাতা বল, চারি বেদ এবং সমুদয় শাস্ত্র একত্র হইল। পিতা বলিয়া নৃত্য কর, ভ্রাতা বলিয়া নৃত্য কর। সকলই

চলিয়া যাইবে, থাকিবে কেবল দুইটী কথা। চিরকাল মনুষ্যের প্রাণ সম্ভোগ করিবে এই দুইটী বিষয়। পিতা ভ্রাতা বলিবে যে দিন, সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আজ যে বীজমন্ত্র ভারতবর্ষে সাধিত হইতেছে, আজ যে ভ্রাতৃ-উৎসব হিন্দুদিগের প্রাণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে, এই উৎসব বিশুদ্ধ এবং বিস্তৃত হইয়া একদিন পৃথিবীস্থ সমস্ত নর নারীকে স্বর্গীয় আনন্দ দান করিবে। অদ্যকার উৎসব অতি সামান্য ভাবে একটী ক্ষুদ্র স্থানে বদ্ধ, কবে ইহার পূর্ণাবস্থা দেখা যাইবে? যদি মনুষ্যের হৃদয় ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকিতে পারে, ভাইকে স্নেহের বস্ত্র দান করিতে পারে, তবে আর তাহার অবশিষ্ট কি রহিল?

ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, ইহা আর কিছুই নহে, সমস্ত পৃথিবীর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আসিতেছে। যদি ভাই ভগ্নীকে, ভগ্নী ভাইকে ভালবাসিয়া সেবা করিতে পারেন তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য আসিবে। মনে কর সমস্ত মনুষ্য জাতির মধ্যে একটি ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপস্থিত। অদ্য যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এই উৎসব হইতেছে, এইরূপ ইহা যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, তবে ভাইকে মনুষ্য চিনিল। ভাইকে চিনিলে সকল পাপ চলিয়া যাইবে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার চলিয়া গেল। সুমিষ্ট ভ্রাতৃভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন শান্তিরাজ্য আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। যিনি একটী ভাইকেও ভাই বলিয়া আদর করিতে পারেন, তিনি স্বর্গের উপযুক্ত হইলেন। সহোদরকে যেমন ভাই বলি, ধর্ম্মের ভাইকেও তেমনই ভাই বলা যায়। যখন পৃথিবীর সকল স্থানে ভ্রাতৃ প্রণয়ের স্রোত প্রবাহিত হইবে, তখন পৃথিবী স্বর্গ হইবে। আজ

কেবল দেখিতেছি একটী ছোট জাতির মধ্যে ভ্রাতৃপ্রণয়ের ফুল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ইহা দেখিয়া মনে হইতেছে, পৃথিবীতে এমন ফুল ফুটিবে যাহার সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য সমস্ত পৃথিবীকে মোহিত এবং আমোদিত করিবে। অদ্যকার উৎসব আমার চক্ষে সামান্য নহে, তোমার চক্ষেও ইহা সামান্য নহে, কেন না আমরা ব্রাহ্ম। ভগিনী তাঁহার ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকিলেন, ভাই তাঁহার ভগিনীকে ভগিনী বলিয়া ডাকিলেন, পরিত্রাণের অভ্যুদয় হইল। যে ব্যক্তি ভাই ভগিনীর সেবক হইল, সে আপনার সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করিল।

মানিলাম তোমরা মৃদঙ্গ লইয়া পিতা পিতা বলিয়া সুখী হইয়াছ; কিন্তু ভাইয়ের নাম লইয়া কেহই আজ পর্য্যন্ত সুখী হইলে না। ভাই কথা নিরর্থক মুখে লইও না। যেমন ঈশ্বরের নাম নিরর্থক লইবে না, সেইরূপ ভায়ের নামকেও সম্ভ্রম করিবে। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্বর্গীয়। সহসা ভাই বলিয়া ফেলিও না। ভাই কাহাকে বলিবে? যাহার প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, যাহার দুঃখে তোমার দুঃখ হয়, যাহার সুখ দেখিলে তোমার সুখ হয়। তিনি যদি শত্রু হন তথাপি তিনি তোমার ভাই। ভাই কি? পুতুল। ভাই কি? সুধা। সেই সুধা পান করিতে প্রাণ ব্যাকুল। সেই অমৃত ভাই, সেই অমৃত মাখা ভাই কোথা ছিল, কে আনিল, কেহ জানে না। আমার একটী ভাই হইল, আনন্দ। দুইটী ভাই হইল, আরও আনন্দ। পাঁচটী ভাই হইল, প্রচুর আনন্দ। যখন দেখিলাম সমস্ত জগৎ সংসার আমার ভাই, আর আমার আনন্দের সীমা রহিল না। সকলেই আমার ভাই, সকলেই আমার

আপনার লোক। যেখানে যাই সেখানেই আমার ভাই। আমার এতগুলি ভাই। আমার লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটী কোটী টাকা জগতে ছড়ান রহিয়াছে। একটী একটী ভাইয়ের প্রাণের মধ্যে আমার জন্য কত অমৃত সঞ্চিত রহিয়াছে। যেন আকাশ হইতে ভাই বর্ষণ হইতেছে, যেন স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ হইতেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্যানে বেড়াইতেছি। এমন ভাই কয়জন লোক এই পৃথিবীতে পাইয়াছেন ? ব্রাহ্মগণ, ভাই অন্বেষণ কর। কাহার কাছে কি পাইবে এ সকল বিষয় কিছুই ভাবিও না, কিছুই প্রত্যাশা করিও না ; কিন্তু সকলকেই তুমি ভাই বল, দেখিবে মোক্ষধাম তোমার নিকটবর্ত্তী হয় কি না ? কেবল রসনাকে বল, ঊর্দ্ধে তাকাইয়া সে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকে, আর চারি দিকের মনুষ্যকে ভাই বলে। প্রাণের ভিতরে জগদ্বাসী আদর্শ ভাইকে ভাই বলিলে না, আদর্শ ভগিনীকে ভগিনী বলিলে না, স্বর্গ দেখিবে কিরূপে ? একবার ডাকিলে হইল না, আবার ডাক "ভাই", হইল না, আবার ডাক "ভাই"। এইরূপে ভাইকে ভাই বলিয়া ডাক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তোমার চক্ষে ভ্রাতৃ-অনুরাগের জল পড়িবে। যখন নর নারী পরস্পরকে অনুরাগ-নয়নে দেখিবেন, সেই সময় এখনও অনেক দূরে। ভাই লইবেন ভগ্নীর নিকটে ভক্তির উপহার, ভগ্নী লইবেন ভাইয়ের নিকটে স্নেহের উপহার। সেই সময় আসিতেছে যখন বলিব আজ সকল লোককে সহোদর সহোদরা জ্ঞান হইতেছে কেন ? আজ কেন সকলকে দেখিবা মাত্র ভাই ভগিনী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। আজ বুঝি এই দেশের বিকৃত ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া সংশোধিত হইয়া স্বর্গীয় ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উদয় হইল। স্বর্গরাজ্যের শুভ-ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া আসিতেছে

ভাই ভগিনী সকলে অনুরাগের বিনিময় করুন। একবার প্রাণের সহিত ভাই বল দেখি, কেমন মোক্ষধাম না আসে? পরীক্ষা করিয়া দেখ, ভাবের ভাবুক হইয়া দেখ। এই দেখ একটা বিস্তীর্ণ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই স্বর্গের ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া সাধন করিয়া তোমরা এই দুঃখময় পৃথিবীকে সুখময় কর।

ঈশ্বর আদরের সামগ্রী।

রবিবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮০০ শক; ৩রা নবেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দুস্থানকে আমার ভালবাসিবার আর একটী হেতু আছে। সেইটী এই;—হিন্দুস্থান গোপাল পূজার স্থান। এই পূজার মহিমা অন্যত্র নাই। গোপাল পূজা কি? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি? হিন্দুদিগের প্রাচীন উপনিষদ শাস্ত্রে আছে;—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" "সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।" সকল দেশের লোকেরাই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া পূজা করে; কিন্তু ঈশ্বরকে পুত্র বলিয়া বাৎসল্যভাবে তাঁহার পূজা করা কেবল হিন্দুস্থানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণ লোকের নিকট ইহা রুচিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত এবং ভয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর চিরকাল পিতার সিংহাসনে বসিয়া আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিম্নে বসিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। যেমন জল স্বভাবতঃ নীচের

দিকে যায়. স্নেহও সেইরূপ নিম্নগামী। স্নেহ কিরূপে উপরে উঠিবে? স্নেহ, বাৎসল্যভাব কেবল সন্তান প্রভৃতির সম্পর্কেই সঙ্গত, গুরুজন সম্পর্কে কি সে সকল ভাব সম্ভব? ঈশ্বর ভক্তবৎসল, তিনি ভক্তকে স্নেহ করেন, ভক্ত কিরূপে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে দেখিবে?৷ কিন্তু ভক্তের জীবনে এমন অবস্থা আছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি ঈশ্বরকে একটী ছেলের মত করিয়া, প্রাণের পুতুল করিয়া বক্ষে রাখিতে পারেন, তৎক্ষণ কিছুতেই তাঁহার প্রাণ শীতল হয় না।

ঈশ্বর আদরের সামগ্রী, ভক্তির আস্পদ, শ্রদ্ধার বস্তু, আদরের জিনিস। যেমন কোমল শিশু আদরের বস্তু, সেইরূপ সুকোমল ঈশ্বর ভক্তের আদরের ধন। দুইটা হাতে তুলিয়া লইয়া বারম্বার শিশুর মুখ চুম্বন করিলে কি সুখ হয়, এবং সেই শিশুর কোমল মুখ দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে বাৎসল্যের অশ্রু পড়ে, তখন কি শোভা হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। ছেলের প্রতি আদরের কথা কি শুন নাই? পিতা মাতা যাহা ইচ্ছা তাহা করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাগলের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহা স্বর্গের সৌন্দর্য্য, কেন না সেই ব্যবহারে আত্মবিস্মৃত হওয়া যায়। সেই বাৎসল্যে আর বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। সেই ছেলেটীকে কখনও বুকে, কখনও কাঁধে, কখনও মাথায় করিয়া, মা বাপ কেবলই বাৎসল্য রসে ডুবেন। ছেলে সম্পর্কের ভিতরে যত আধ্যাত্মিক লাবণ্য আছে, সেই সমুদয় পিতা মাতা পান করেন। ইহা যদিও লৌকিক, তথাপি আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল

হয়, নির্গুণ হয়, তথাপি সে সন্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতা মাতা বৎস, খোকা, বাবা, যাদু, বাছা ইত্যাদি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাঁহাদের চক্ষে স্নেহের জল পড়ে। এই ভাবের নাম বাৎসল্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত অনুরোধ, ব্রহ্মভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করেন। যে ভাবে পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয় না সেইরূপ বাৎসল্যভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি, প্রাণের মধ্যে রাখি; ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে?

গোপাল আসেন পৃথিবীতে খেলা করিতে। আমাদিগের ঈশ্বর খেলা করিতে ভালবাসেন। ব্রাহ্মসমাজের গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্ত্তা গম্ভীরপ্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া গম্ভীর ভাবে পূজা করিব; কিন্তু যখন সেই অতি পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর, দুই পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় হইয়া আসিবেন, তখন কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষদ পাঠ অথবা স্তব স্তুতি করি, তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, "ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট ঐ সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে খেলা করিতে আসিয়াছি।" বাল্যভাবে ঈশ্বর কবে আসিবেন আমরা জানি না, তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে দেখা দিয়া তাহার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন কে জানে? সেই বালক যাঁহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আসিবেন—অনন্ত গম্ভীর গুরুবেশ ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার ধারণ করিয়া নয়, কিন্তু বালকের আকার ধারণ করিয়া আসিবেন। সেই রূপ দেখিয়া হৃদয় মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে। ভক্ত দেখিবেন স্বর্গের বালক সমাগত দ্বারে।

ভক্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্তব স্তুতি আরম্ভ করিবেন; কিন্তু ঈশ্বর বলিবেন, না ঐ নৈবেদ্য আমি গ্রহণ করিব না, আমার ভাব আজ স্বতন্ত্র, আমি চাই অন্য কিছু। ভক্ত হাত যোড় করিয়া বলিবেন, ঠাকুর, দয়া করিয়া বল কি চাও আমার কাছে? বল হে ঈশ্বর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও? হরি বলিবেন;—প্রাণের ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর, আজ চল সাধন-কাননে যাই, সেখানে দুইজনে মিলিয়া ধূলা লইয়া খেলা করিব, ফুল লইয়া খেলা করিব, দৌড়াদৌড়ি করিব। যাহারা কেবল জ্ঞানী, ভাবুক নহেন তাঁহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্তু ভক্ত যিনি, শ্রীগোপালের উপাসক যিনি, তিনি এ সকল সঙ্কেত বুঝিবেন। ভক্তের নিকট হরির সাধন ভজন সমুদয় কেবল ক্রীড়া।

ওহে ব্রাহ্ম, এ সকল কথা শুনিয়া হাসিও না। এ সকল পরিহাসের বিষয় নহে; কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কথা। সেই বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতির অতীত ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসেন ইহা অভ্রান্ত সত্য কথা। পরম ভক্তের স্কন্ধে ব্রহ্ম শিশুর ন্যায় বসিয়া আছেন, ইহা যদি না মান তবে ঈশ্বরকে চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেই ত হয়। ঐ যে ভক্তেরা স্কন্ধে লইয়া নাচাইতেছেন তিনি কে? ব্রহ্মশিশু। বৃদ্ধ ব্রহ্মপূজা করিয়াছি। এখন আমি শিশু ব্রহ্মের পূজা করিব। আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিবেন। এত বড় যিনি তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা করিতে আসিয়াছেন। এমন সুমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়া করিব?

ছাদের উপরে গিয়া ছোট গাড়ীর মধ্যে সেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গাড়ী টানিব। ব্রাহ্মগণ, লোকভয়ে ভীত হও কেন? এক কর্ম্ম কর, খুব গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মকে লইয়া এরূপ ক্রীড়া কর, অভক্ত মনুষ্যেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যভাবে ব্রহ্মপূজা করা গুরু কথা, আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পূজা করা পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুভাব দেখিয়া ভুলিয়া গেলাম। হরির মুখ দেখিয়া, হরিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া গেলাম, আর উঠিতে পারিলাম না। দয়াময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রিয় হইল। হরিকে কোথায় রাখিব জানি না। সুকোমল ব্রহ্মকে প্রাণের ভিতরে রাখি, বুকের মধ্যে রাখি, মস্তকের উপরে রাখি, স্কন্ধে রাখি। জগৎ, তুমি আমাকে গোপনে এই কাজ করিতে দাও।

ঈশ্বর পিতা, রাজা, গুরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি আকার ধরিয়া আমার ঘরে অনেকবার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়া আসিয়াছেন; এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাঁহাকে এরূপ পরিতুষ্ট করিব যে বারবার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভালবাসিবেন। তিনি বলিবেন যে, সে বড় ছেলেমানুষ, আমার সঙ্গে খেলা করিতে ভালবাসে। সে বুড়র মত বই পড়িতে ভালবাসে না। ছোট ছোট ঘর বাঁধে, ছোট ছোট বাগান করে, ছোট ছোট হাঁড়ীতে রাঁধে, আমি তার বাড়ীতে যাব। ঈশ্বর যদি আমার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, আমি কত সুখী হব। বার্দ্ধক্যের পর শিশু। এবার শিশু হই। চুল পাকিল। মরিব? না, অন্যায় কথা। বার্দ্ধক্যের পর দ্বিতীয় শিশুর অবস্থা, বৃহৎ ব্রহ্মকে শিশুর

ন্যায় দেখিব। তবে তিনি আসিবেন, খেলার ঘর বাঁধি; দশ জন বিদ্রূপ করিবে। কি করি, পাঁচ দিন উপহাস করিবে; কিন্তু আমি যে অনন্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেলা ছোট ছোট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেলা করিতাম, এখন আবার ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হাঁড়ীতে রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব, ছোট দুধের বাটীতে তাঁহাকে দুধ দিব। পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল ভক্তির নিগূঢ় কথা বলিতে ভয় হয়, তুমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে! আদরের ঈশ্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগদ্বাসী সকলের এই আনন্দ হউক! দয়াময় এই ভাবে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

ধার্ম্মিক সংসারী।

রবিবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৮০০ শক; ৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

এক দিকে ধর্ম্ম, অপর দিকে সংসার, এই দুইয়ের মধ্যে একটী পথ রহিয়াছে। অনেকগুলি লোক সংসারের ভিতর দিয়া ধর্ম্মে যাইতেছে, কতকগুলি লোক ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সংসারে আসিতেছে। যাহারা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সংসারে আসিতেছে, তাহাদিগের অবস্থা নূতন প্রকার। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের দিকে চলিয়া যান, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অবস্থা তাঁহাদিগের যাঁহারা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া সংসারে চলিয়া আসেন। সংসারী ধার্ম্মিক এক শ্রেণীর লোক, ধার্ম্মিক সংসারী আর এক শ্রেণীর লোক। এখন জিজ্ঞাস্য এই সংসারী ধার্ম্মিক ভাল, না ধার্ম্মিক সংসারী ভাল?

কোনটী বিশেষণ হইলে ভাল হয়; সংসারী না ধার্ম্মিক? সংসারী ধার্ম্মিকের অনেক বিড়ম্বনা এবং অনেক প্রকার জ্বালা, সংসারী ধার্ম্মিক সংসারের কোলাহল হইতে অবসর লইয়া কিছুকাল ধ্যান করিতে বসেন, কিন্তু তখনও সংসার-চিন্তা আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করে। বাহিরে যাহাতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এজন্য তিনি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার মন নানা প্রকার সাংসারিক চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়। সংসারী ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার জন্য কত চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের মন হইতে সংসারের দুর্গন্ধ ধৌত হয় না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের ভিতর দিয়া ধৌত হইয়া সংসারী হন! তাঁহারা সংসারে আসিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ্যের ভিতর দিয়া আসেন।

আর এক শ্রেণীর লোকেরা সংসারকে সামান্য জানিয়া সংসার করিতে যায়। তাহারা ধর্ম্ম হইতে সংসারকে ছোট মনে করে, এইজন্য তাহারা সংসারে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রথমেই ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করেন, তাঁহারা সংসারে আসিবার আগে বনে গমন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সিদ্ধ হন। আগে ধর্ম্মের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, পরে স্ত্রীকে বিবাহ করেন। আগে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হন, পরে পৃথিবীর জমিদারী ক্রয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের ধর্ম্মনিয়ম পালন করেন। প্রথমতঃ স্বর্গরাজ্য তার পর সংসার, আগে ঈশ্বর তার পর পরিবার। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্য হইতে সংসারে আসিতেছেন, তাঁহাদিগের কপাল কেমন উজ্জ্বল, তাঁহারা কেমন তেজস্বী! আমরা মনে করি এই সংসার ছোট, উহাঁরা মনে করেন

এই সংসার বড়। তাঁহারা পরম ধন লইয়া এখানে আসেন। স্বর্গের রাশি রাশি ধন লইয়া যাঁহারা এই দিকে আসিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে পৃথিবীর সামান্য সিকি দেখিয়া ভুলিয়া যাইবেন? ঈশ্বর তাঁহার সাধককে সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী দান করেন, পরে দুই কাঠা জমি দেন। কারণ ঈশ্বর জানেন তাঁহার সন্তানের আগে ছোট স্থানের উপর মায়া হইলে, আগে নিজের স্ত্রী পুত্রাদিকে লইয়া মত্ত হইলে, তাহার অনেক দুর্গতি এবং দুঃখ হইবে, এইজন্য তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সমস্ত পৃথিবীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের সাধক নিজে দীন হইয়াও সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী। কেন না তিনি মনে করেন, আমি ঈশ্বরের এই সমুদয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী, কারণ আমি ঈশ্বরের সন্তান। যিনি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী, পৃথিবীর ঘোর দুঃখ বিপদের মধ্যেও তাঁহার মুখ কেমন প্রফুল্ল। আর যাহারা সংসারের ক্ষুদ্র ধনের উপরে নির্ভর করে, তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই ভয়ে দুঃখে ব্যতিব্যস্ত।

স্বর্গরাজ্যের সন্ন্যাসী সামান্য বিষয়সুখে মুগ্ধ হইতে পারেন না। ক্ষুদ্র গৃহ এবং ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁহার মন বদ্ধ থাকিতে পারে না। স্বর্গরাজ্যের সন্ন্যাসীর ঘর কোথায়? সমস্ত পৃথিবী তাঁহার ঘর। দুই কাঠা ভূমিকে তাঁহার ঘর বলিতে তাঁহার ঘৃণা হয়। সংসারী ধার্ম্মিক বলে, এই ভূমিটুকু আমার, স্বর্গরাজ্যের লোক বলেন, পিতার সমুদয় সম্পত্তি আমার সম্পত্তি, সুতরাং পৃথিবীর সকলের সম্পত্তি আমার সম্পত্তি। সকলে সুখী হইতেছে, আমার সুখ বৃদ্ধি হইতেছে। পৃথিবীর জ্ঞান ধন বৃদ্ধি হইতেছে, আমার জ্ঞান ধন বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপে স্বর্গরাজ্যের উদার সন্ন্যাসী

সর্ব্বাধিকারী হইয়া সদানন্দ। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সংসারে আসিলে এই প্রকার মনে হয়। যিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া স্বর্গরাজ্য হইতে সংসারে আসেন, তিনি বলেন এই সমুদয় পৃথিবীর উপরে আমার অধিকার, এই সমুদয় দেশগুলি আমার হইবে। সমুদয় জঙ্গল আবাদ করিয়া লইব। যত স্থান অপরিষ্কার আছে, সমুদয় পরিষ্কার করিয়া লইব। যত বিজাতীয় এবং বিধর্ম্মী আছে, সকলকে আমার করিয়া লইব। যে সকল দেশে অন্ধকার আছে, সে সকল দেশে আমার পিতার ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করিব। যে সকল স্থানে অত্যাচার অনিয়ম হইতেছে, সে সমুদয় স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিব। তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সকলেই তাঁহার রাজার অনুশাসিত প্রজা হইয়া, সুখে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবে। ধন্য ধার্ম্মিক সংসারিগণ, কেন না তাঁহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী!

স্বর্গরাজ্যের সন্ন্যাসীদিগের এই দেশে আসিবার তাৎপর্য্য কি? পুণ্যস্থান স্বর্গরাজ্য হইতে তাঁহারা এই পাপময় বিকৃত দেশে আসিবেন কেন? তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশ পাইয়া, তাঁহার অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য এই সংসারে আসেন। ঈশ্বর বলেন, "তোমরা পৃথিবীতে গিয়া আমার রাজ্য স্থাপন কর।" ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিয়া যাঁহারা সংসারী হইলেন, তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। আর যে সকল সংসারী আপনার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা নীচ শ্রেণীর লোক। যাহাতে সংসারের মধ্যে সত্য প্রচার এবং সত্য প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জন্য স্বর্গের সন্ন্যাসীরা পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। ব্রাহ্মগণ, তোমরা উপাসনা শিখিলে, তোমরা

আপনারা প্রাণ ভরিয়া স্বর্গের সুধা পান করিতে শিখিয়াছ, এখন আর তোমাদের স্বার্থপর হইয়া থাকিবার সময় নহে। ঈশ্বরের আজ্ঞা, তোমরা পৃথিবীতে যাও, পৃথিবীর নর নারীদিগের নিকট এখন সেই অমৃত পরিবেশন কর। সাবধান, সংসারী হইবার জন্য সংসারে থাকিও না; শুদ্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য সংসারে যাইবে। পুরাতন কালের লোকেরা ধর্ম্মসাধনের জন্য সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতেন, এখন তাহার বৈপরীত্যে, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য সংসারে যাইবে। পূর্ব্বকালে আগে সংসার করিয়া পরে বনে যাইত, এখনকার এই উপদেশ, আগে বনে ধর্ম্মসাধন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইবে, পরে সংসারী হইবে। আগে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবে, পরে সেই স্বর্গরাজ্য দ্বারা পৃথিবীকেও শুদ্ধ করিয়া লইবে।

স্বর্গরাজ্যের যাত্রিগণ, তোমাদের বাক্সে রাশি রাশি স্বর্গের ধন। তোমাদিগকে যদি লোকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের সম্পত্তি কি? তোমরা বলিবে সমস্ত পৃথিবীই আমাদের। পিতার রাজ্যের উপর আর কাহারও অধিকার নাই। ব্রহ্মসন্তান, সমস্ত পৃথিবীতে যত টাকা কড়ি দেখিতেছ, ঈশ্বরের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য এই সমস্ত ব্রহ্মসাধকের হস্তে আসিবে। এখন দেখিতেছ ইনি অধিকারী, উনি অধিকারী, এরা সব ছায়ার মানুষ। স্বর্গরাজ্যের অধিকারিগণ, এ সমস্ত তোমাদেরই, তোমাদেরই টাকা, তোমাদেরই ভূমি। এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকল দেশ তোমাদেরই, তোমরাই ভূম্যধিকারী। ঈশ্বর বলিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবী তোমাদেরই। অতএব যাও, যাহাতে প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক নর নারীর মনে,

ধর্ম্মবৃক্ষ সতেজ হইয়া উঠে, তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন কর। সমুদয় নর নারী তোমাদেরই প্রাণের ধন। লোকে বলে তোমরা দীন দরিদ্র, কিন্তু সত্য, ঠিক ইহার বিপরীত। তোমরাই ধনী, আর ধনীরাই দুঃখী। কারণ পরমধনকে যে পায়, সমস্ত ধন সে পায়। সমস্ত বড় রাজ্য পাইলেন যিনি, ছোট রাজ্য তিনিই পাইলেন। যে দিন ব্রহ্মাণ্ডপতি বাড়ীতে আসেন, সে দিন অন্নপূর্ণার আগমন হয়। ঈশ্বর তাঁহার লক্ষ্মীমূর্ত্তি ছাড়িয়া ভক্তের ঘরে আসিতে পারেন না। আমরা উপাসনা করিয়া পরম ধনী, পরম ধন ঈশ্বরকে লাভ করি, সুতরাং আমাদিগের আর ক্ষুদ্র ধনের ভাবনা থাকে না। অতএব সকলে প্রকৃত উপাসনা দ্বারা পরম ধনকে উপার্জ্জন কর, আর অন্য ধনের অভাব থাকিবে না।

প্রত্যাদিষ্ট।

রবিবার, ১লা পৌষ, ১৮০০ শক ; ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

যে সকল বস্তু এই পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বস্তুর সংসারে ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, এ সকলের মধ্যেও স্বর্গের কিছু কিছু দ্রব্য আছে। এই সংসারে স্বর্গীয় এবং পার্থিব বস্তু সকল মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা এই দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন, কোন্‌টী স্বর্গীয় এবং কোন্‌টী পৃথিবীর। লক্ষণ দেখিয়া চেনা যায় কোন্‌টী স্বর্গীয় এবং কোন্‌টী পার্থিব। পৃথিবীর বস্তু ত মলিন আছেই, কিন্তু আপাততঃ অনেক মলিন বস্তুর মধ্যেও স্বর্গীয় পদার্থ লুক্কায়িত থাকে। অনেক মানুষ

আছে যাহারা মানুষ, আবার অনেক মানুষ আছেন যাঁহাদের ভিতরের প্রকৃতি দেবতার প্রকৃতি। পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধিমান্ আছে, যাহাদের বুদ্ধি, পৃথিবীর বুদ্ধি। আবার এখানে এমন লোকও আছেন, যাঁহাদিগের চক্ষু কর্ণ স্বর্গে উৎপন্ন, স্বর্গে গঠিত। চক্ষু কাহার না আছে? কিন্তু কে স্বর্গের শোভা দেখিতে পায়? কাণ কাহার না আছে, কিন্তু কয় জন লোকের কর্ণ স্বর্গের শব্দ শুনিতে পায়?

এই পৃথিবীতে স্বর্গের পুস্তক এবং মনুষ্য-রচিত পুস্তকও রাশি রাশি আছে। আমাদের সমক্ষে স্বর্গীয় পার্থিব দুইই রহিয়াছে; কিন্তু এমন বিচক্ষণ চক্ষু কাহার, যে দুগ্ধ এবং জল পৃথক করিতে পারে? অথচ পার্থিব হইতে স্বর্গীয় বস্তু বাছিয়া লইতেই হইবে। পার্থিব পুস্তকের মধ্যে অনেক ভাল ভাল পুস্তক আছে বলিয়া সমুদয়কে মনুষ্যের রচিত মনে করা উচিত নহে। কোন্ পুস্তকে কাহার নাম অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিতে হইবে। ধন রত্ন, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদয়ই পৃথিবীতে মিশ্রিত ভাবে স্থিত, কিন্তু তাহার মধ্যেও পার্থিব ও স্বর্গীয় বিভাগ আছে। মনুষ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। ধার্ম্মিক সংসারী স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ঈশ্বরের ক্ষমা, ঈশ্বরের উৎসাহ, মনুষ্যের আকার ধরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়; নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীরা এ সকল দেখিয়া আমোদ করেন। এই সমক্ষে দেখ, টাকা কড়ি ধন রত্ন মনুষ্য কত কি আছে। যাঁহারা বিচক্ষণ ভক্ত তাঁহারা বলিলেন, এই ধন রত্ন ঈশ্বরের, ঐ সম্পদ ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর; এই পাঁচটী লোক স্বর্গের চিহ্নিত লোক, ঐ পাঁচ লক্ষ লোক পৃথিবীর লোক। অনেক জিনিস আছে যাহা পৃথিবীতে উপার্জ্জন করা যায়

যেমন টাকা, বিদ্যা ; কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, যাহা কেবল ঈশ্বরেরই নিকট পাওয়া যায় ; যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। ইহা পৃথিবীর কোন স্থানে কিম্বা কোন মনুষ্যের নিকট পাওয়া যায় না।

মানুষ জন্মে কোথায় ? মাতৃগর্ভে। কিন্তু যখনই স্বর্গীয় পুরুষের জন্ম হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহার রক্তের মধ্যে স্বর্গের ভাব দিয়া তাঁহাকে গঠন করেন। দশটী স্বর্গের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাকে দেখিয়া জননী কৃতার্থ হন এবং পৃথিবী ধন্য হয়। তিনি জন্মসন্ন্যাসী, প্রেরিত ঋষি, তিনি জগতের আদরের গোপাল, তিনি প্রেরিত শিশু, তাঁহাকে দেখিয়া পৃথিবী বলিল, আমাদের গুরু আসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহার গুরুত্ব বুঝিল। তাঁহার জিহ্বাই বেদ, তাঁহার জীবনই শাস্ত্র, তিনি জন্মসাধক, তিনি জন্মযোগী। তাঁহার এক একটী কথা শুনিয়া লোকে বলিবে, ইহাঁর এক একটী কথা স্বর্গের অভ্রান্ত দেববাণী। এই এক শ্রেণীর লোকের কথা। ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনই সত্যপূর্ণ। পৃথিবীতে ইহাঁদিগের সংখ্যা অতি অল্প।

ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া পরে এমন এক শ্রেণীতে আসিলাম, যাঁহাদিগের জীবনে দুই আনা সত্য লাভ করা যায়। জন্মসাধুর জীবনে যোল আনা পূর্ণ সত্য লাভ করা যায়, এই শ্রেণীর লোকের নিকট দুই আনা প্রত্যাদেশ লাভ করা যায়। ব্রাহ্ম স্বর্গের কোন পদার্থ অবহেলা করিতে পারেন না। অতএব যাঁহাদিগের জীবনে কেবল দুই আনা সত্য, আমরা তাঁহাদিগের জীবন হইতেও স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া লইব। ব্রাহ্ম বাগানের মালী হইয়া জন্মিয়াছেন। তিনি কেবল নানা স্থান হইতে স্বর্গের ফুলগুলি তুলিয়া মালা গাথিবেন। কোন

কোন বৃক্ষে দুই একটী ফুল ফুটিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মমালী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। বিচার করিবার তাঁহার অধিকার নাই। অল্প হউক অধিক হউক, সকল বৃক্ষ হইতেই তাঁহাকে স্বর্গের ফুল তুলিয়া লইতে হইবে। অতি সামান্য লোকের জীবনেও যদি একটী স্বর্গের ফুল ফুটিয়া থাকে, আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটী লোকের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের একটী অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। ব্রাহ্ম সেই তেজের নিকট আপনার মস্তক নত করিলেন।

একটী লোক তাহার সমস্ত জীবনে একটী স্বর্গের কথা বলিল, তাহাতেই সে ধন্য হইল। একটী সামান্য লোক ঈশ্বরপ্রেরিত একজন সাধুকে বলিল,—"তুমি ঈশ্বরের পুত্র, তোমাকে দেখিয়া আমার পরিত্রাণ এবং স্বর্গরাজ্যের আশা হইল।" এই কথা স্বর্গের কথা। মনে কর, সেই ব্যক্তি তাহার সমস্ত জীবনের মধ্যে আর একটীও স্বর্গের কথা বলে নাই; কিন্তু তথাপি তাহার এই একটী কথাকেই স্বর্গের অমূল্য রত্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর একজন লোক দৈবাৎ তাহার শত্রুর প্রতি মধুর ব্যবহার করিল, হয় ত সে নিজেই বুঝিতে পারিল না কেন সে এরূপ অনুষ্ঠান করিল। সে বুঝিতে পারুক আর না পারুক, শত্রুর প্রতি তাহার এই প্রেম ব্যবহার স্বর্গের ব্যাপার। চারিদিকে পার্থিব ব্যাপার; কিন্তু এই দুইটী জিনিস স্বর্গের।

ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইতে যাঁহারা নিয়োগপত্র লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর রাশি রাশি বস্তুর মধ্য হইতে স্বর্গের বস্তু বাছিয়া লইতে পারেন। তাঁহারা লক্ষণ

দেখিয়া স্বর্গীয় পদার্থ চিনিতে পারেন। যাহারা প্রত্যাদেশ পায় না, তাহারা ঈশ্বর এবং মূল সত্যের গৌরব বুঝিতে পারে না। তাহারা অনেক সময় সত্যকে মিথ্যা মনে করে এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে। পৃথিবীতে যে শ্রেণীর লোক যিনি, তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যাদেশের পরিমাণ অনুসারে মনুষ্যমণ্ডলীকে শ্রেণীবদ্ধ করা কল্পনার কার্য্য নহে, ইহাতে বিজ্ঞান আছে। যেমন ঈশ্বর আছেন সত্য, তেমনই ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, সত্য, উৎসাহ ইত্যাদি মনুষ্যের আত্মা এবং বাহু মধ্যে আসে ইহাও সত্য। আমরা অনেক বৎসর হইতে ইহার প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ইহার সাক্ষ্য দান করিব, এবং আমরা যতই বৃদ্ধ হইতে থাকিব, ততই আমাদের এই বিশ্বাস ঘনতর হইতে থাকিবে।

আমাদের মধ্যে এমন সকল লোক আছেন, যাঁহাদিগের হৃদয়, মনের মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ণ; যাঁহাদিগের চরিত্র মধ্যে আমরা ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারি। এই কথা দ্বারা কেহ এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বর কেবল আমাদের কয়েকজনের মধ্যেই অবতীর্ণ, আর সাধারণ লোকেরা ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নরকে বাস করিতেছে; তাহারা আর ঈশ্বরের কোন সত্য কিম্বা ভাব লাভ করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা, ইহা ঘৃণিত অনৃত বাক্য। যাঁহার ভিতরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-বায়ু ঘুরিতেছে, তিনি যে সকল বিষয়েই প্রত্যাদিষ্ট হন, ইহা মিথ্যা কথা। যিনি এক মাসে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন, তিনি যে সকল মাসেই প্রত্যাদেশ পাইবেন, ইহা সত্য কথা নহে। অথবা যিনি এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি যে

সকল বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভ করেন, ইহা মিথ্যা। যিনি ক্ষমা বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান, তিনি হয় ত অন্য বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না। সরল সাধকেরা কখনও মিথ্যা বলেন না। তাঁহারা কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান এবং কখন কি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পান না, সকলই অকপট ভাবে স্বীকার করেন, আপনারাই বলেন।

যাঁহারা প্রত্যাদিষ্ট, লক্ষণ দেখিলেই তাঁহাদিগকে চেনা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের নিয়োগপত্র পাইয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের কপালে ধক্ ধক্ করিয়া স্বর্গের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। তাঁহারা আপনারাই বলেন, এই এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। আদেশ পাইলেই কার্য্যভার লইতে হয়। তুমি মুখে বলিতেছ, প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, অথচ তুমি যদি সেই আদিষ্ট কার্য্য না কর, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি স্বীকার করিতেছ, মনুষ্য-চরিত্র গঠন করিতে তুমি এই সংসারে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শ মাত্র কঠোর মন বিগলিত হয়, পাপাসক্ত চিত্ত ঈশ্বরের দিকে পরিবর্ত্তিত হয় এবং অতি সহজে চরিত্র গঠিত হয়, যদি এইরূপ না হয়, তুমি প্রবঞ্চক। ঈশ্বর এক একজনকে এক একটী বিশেষ কার্য্যভার দিয়া এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। প্রত্যেকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেই তাহার নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হয়।

তুমি ক্ষমা দ্বারা তোমার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে আসিয়াছ, আর কিছু করিতে পার আর না পার, তুমি জগতে কেবল ক্ষমার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইহাতেই জগৎ উদ্ধার হইবে। তুমি জন্ম-উদাসীন, ফকীর হইয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছ, ঈশ্বর হইতে ফকিরী ভাব পাইয়াছ, তুমি জগৎকে কেবল সেই লক্ষণ দেখাইয়া যাও,

তাহাতেই জগতের পরিত্রাণ হইবে, তোমার অন্য লক্ষণ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। অতএব কার্য্যের জন্য অহঙ্কার এবং ঈর্ষা পোষণ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না। তোমার পাঁচখানি কার্য্য আছে, আমার না হয় দুইখানি কাজ আছে, তাহাতে আমার দুঃখের বিষয় কি? এবং তোমারই বা গৌরবের বিষয় কি? ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। ঈশ্বরের আদেশে যিনি গান বাঁধিতে আসিয়াছেন, তাঁহার বাদ্যে হস্ত দিবার প্রয়োজন কি? যিনি ক্ষমাচন্দ্র প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন, তিনি যেন বিনয় অথবা সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা না করেন। যিনি বিনয়ী হইতে আসিয়াছেন, তিনি যেন স্বর্গের আর কোন লক্ষণ দেখাইতে অহঙ্কার না করেন। অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপন আপন নিয়োগপত্র দেখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও। কেহই অনধিকার চেষ্টা করিও না। যিনি যে কার্য্যের জন্য প্রেরিত, তিনি যেন কেবল সেই কার্য্যই করেন, সেই কার্য্যসম্পর্কে তাঁহার যতদূর আবশ্যক তিনি প্রত্যাদেশ অথবা ঈশ্বর-নিঃশ্বাস পাইবেন, এবং পৃথিবীও সেই বিষয়ে তাঁহার অনুকূল হইয়া প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্য আনিয়া দিবে। অতএব কেহই আপনার অধিকার ছাড়িয়া অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিও না। ঈশ্বর যাঁহাকে যে স্থানে রাখিয়াছেন, তিনি যেন সেই স্থানেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকলের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

যিনি স্বর্গের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল লিখিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে থাকুন; যিনি সঙ্গীত করিতে জন্মিয়াছেন, তিনি ক্রমাগত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে থাকুন, তাঁহারা প্রতিজনেই আপন আপন

কার্য্যে স্বর্গ হইতে সাহায্য লাভ করিবেন এবং পৃথিবীও তাঁহাদিগকে সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দিবে। যাঁহারা শিশু, যুবা অথবা নারী-চরিত্র গঠন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন বিষয়ে স্বর্গ হইতে নূতন নূতন প্রত্যাদেশ লাভ করিবেন। যাঁহারা পাপী জগতের মধ্যে পুণ্য বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে স্বর্গ হইতে রন্ধন করা পুণ্যের অন্ন সকল আসিবে। অতএব আচার্য্যগণ, প্রচারকগণ, তোমরা ঈশ্বর প্রদত্ত আপন আপন হৃদয় এবং জীবনের উপযুক্ততা অনুসারে প্রতিজন কেবল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর, তাহা হইলে চারিদিকে কল্যাণের উৎস সকল উৎসারিত হইবে।

বিশেষ বিধান।

রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৮০০ শক ; ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

নিষ্ক্রিয় দেবতা মনুষ্যের কল্পনা মাত্র। ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় মনে করিবে না। ঈশ্বর জগতের প্রতি উদাসীন নহেন। প্রকৃত ঈশ্বর জগতের মধ্যে থাকিয়া মনুষ্যের নিকট আপনার অলৌকিক ক্রিয়া এবং লীলা সকল প্রকাশ করেন ; কিন্তু ঈশ্বর সাধারণ প্রণালীতে যে লোকদিগকে প্রতিপালন করেন তাহাতে জগতের সকল অভাব মোচন হয় না। সাধারণ প্রণালী অনুসারে প্রতিদিন সূর্য্য উঠিতেছে, প্রতিদিন দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস হইতেছে, দুই একদিন সূর্য্য অথবা চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডল দেখিলে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া মনুষ্যের মনে বিস্ময় হইতে পারে ; কিন্তু বারম্বার দেখিতে

দেখিতে আর এ সকল তত আশ্চর্য্য মনে হয় না। যদিও ঈশ্বরের শক্তিতে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, কিন্তু সাধারণ নিয়মপ্রণালী দেখিতে দেখিতে জগতের লোক ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়। পুরাতন নিয়মপ্রণালী সর্ব্বদা হৃদয়ের ভাব উদ্দীপন করিতে পারে না; এক প্রণালী বারম্বার দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি আর উত্তেজিত হয় না। যদিও ঈশ্বর কদাচ নিষ্ক্রিয় নহেন, যদিও তিনি সাধারণ প্রণালীর মধ্যেও নিয়ত কার্য্য করিতেছেন, যদিও জগতের বিধাতা প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে কার্য্য করিতেছেন, যদিও ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন কোন গোলাপ ফুল ফুটে না এবং একটী ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডও মৃত্তিকায় পড়ে না; কিন্তু ক্ষীণবিশ্বাসী মনুষ্য এ সকল সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে সেই সাধারণ কর্ত্তাকে দেখিতে পায় না।

সাধারণ লোকদিগের মন নিদ্রিত; এইজন্য সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে তাহারা ঈশ্বরকেও নিদ্রিত মনে করে। তাহারা মনে করে সংসার পালনের ভার কতকগুলি সাধারণ নিয়মের হস্তে রাখিয়া ঈশ্বর এখন নিশ্চিন্ত উদাসীন হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পৃথিবীর অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর ধর্ম্ম এখন এইরূপ মৃতভাব ধারণ করিতেছে। ঈশ্বরের সাধারণ প্রণালী দৃঢ় নিয়মবদ্ধ, স্থির, অটল এবং প্রশান্ত। ঐ দেখ প্রকাণ্ড সমুদ্র, কূল দেখা যায় না, স্থির, প্রশান্ত, কখনও যে এই প্রশান্ত সাগর চঞ্চল হইবে, মনে হয় না। কোথাও একটী হিল্লোল নাই, প্রশান্ত এবং স্বচ্ছ কাচের ন্যায় নির্ম্মল। ক্রমাগত দশ ক্রোশ চলিয়া যাও, এক প্রকার ভাব। কিন্তু আর এক সময় সমুদ্রের আর এক অংশে এইরূপ শান্তভাব দেখিতে পাইবে না। সেখানে সমুদ্র

ভয়ানক চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে, সেখানে এমনই জলের টান হইয়াছে, সেখানে জল ক্রমাগত এমনই ভয়ানক প্রবল বেগে ঘুরিতেছে যে, একবার আকৃষ্ট হইলে প্রকাণ্ড জাহাজও সেইখান হইতে আর উঠিতে পারে না। সেখানে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। সেখানে জল একটী ভয়ানক গর্ত্তের মত হইয়াছে। সেখানে একটী ভয়ানক ঘূর্ণ-জল হইয়াছে। সাধারণ নিয়মপ্রণালী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়; বিশেষ বিধান ভয়ানক ঘূর্ণ-জলের ন্যায়। সাধারণ কর্ত্তা যখন বিশেষ বিধানের কর্ত্তা হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সকল দেখিয়া জগৎ আশ্চর্য্য হয়। বিশেষ বিধানে এক হস্ত ঈশ্বর দশ হস্ত হন, অনন্ত শক্তির অসংখ্য হস্ত আছে, প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিশেষ বিধানের সময়, তাঁহার অসীম বাহুবল প্রকাশিত হয়। সাধারণ লোক মনে করে, যেন নিদ্রিত ঈশ্বর জাগ্রত হইলেন।

বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বিধি প্রকাশিত হয়। যখন সেই বিশেষ বিধানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়, পৃথিবী আবার প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। কিছুকাল পরে আবশ্যকানুসারে বিশেষ জাতির মধ্যে, বিশেষ যুগে আবার বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য বিশেষ বিধান প্রেরিত হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে, যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে, তাহারা নরকে যাইবে; তাহারা মনে করে কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুণ্ঠে যাইবে, এবং পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বঞ্চিত। ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিয়া কেবল অল্প লোককে চিহ্নিত করিয়া আপনার ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান

পাইতে পারে না। ইহা মিথ্যা কথা যে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত নহে, তাহারা স্বর্গ পাইবে না। সত্য এই যে, কয়েকটী মুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর একটী যন্ত্র লইয়া কার্য্য করেন; সেই যন্ত্রের নাম বিধান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সকল সাধিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই যন্ত্র চলিতে থাকে। বিধানভুক্ত কয়জনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সকল সুসম্পন্ন হইবে। ইহাতে পরিত্রাণের কথা নাই। পরিত্রাণ কোথায়? বিধান কোথায়? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে। সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিধানের আবশ্যক হয়। সকলেই পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু সকলেই বিধানভুক্ত নহে। যাহারা বিধানভুক্ত তাহারা ভয়ানক ঘূর্ণ-জলের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। তাহাদিগকে সাধারণের পক্ষে অসাধ্য অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে হয়। যেমন ঘূর্ণ-জলের মধ্যে ভয়ানক আন্দোলন, তেমনই বিধানভুক্ত কয়জন লোক ভয়ানক বেগের সহিত ঘুরিতে থাকে। তাহারা আপনারাই বুঝিতে পারে না যে, সর্ব্বশক্তিমান্ সক্রিয় ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেছেন।

যেখানে ভয়ানক ঘূর্ণ-জল সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে কত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয়। প্রবল বেগের সহিত সমস্ত জল একবার উপরে উঠিতেছে, আবার ভয়ানক গভীর গর্ত্তের মত হইয়া সমস্ত জল নীচে পড়িতেছে। কখনও জলস্তম্ভের ন্যায় সমস্ত জল নীচে পড়িতেছে। কখনও জলস্তম্ভের ন্যায় সমস্ত আকাশের দিকে উঠিতেছে, কখনও ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া সমস্ত জল নীচে পড়িয়া যাইতেছে। কখনও পৃথিবী আকাশের দিকে উঠিতেছে,

কখনও চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকল সঙ্গে লইয়া আকাশ জলের ভিতরে ডুবিতেছে। কখনও ঈশ্বরের দয়া দ্রুতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী হইতে মনুষ্যের মন স্বর্গের দিকে উঠিতেছে। যেখানে ঘূর্ণ জল সেখানে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। যে দেশে বিশেষ বিধান আসিল সেই দেশে ভয়ানক দাবানল প্রজ্জলিত হইল। সেই বিধানের কয়জন লোকেব নিকট পৃথিবীর আর সমস্ত বল পরাস্ত হইল। তাহাদিগের বাহুবলের নিকট পৃথিবীর রাজারা তিষ্ঠিতে পারিল না। পাঁচ জনের বাহুবলের নিকট পাঁচ হাজার লোক পরাস্ত হইল। এই অৰ্দ্ধ শতাব্দীর ব্রাহ্মসমাজের ঘটনাবলী এই প্রকাণ্ড ঘূর্ণ-জলের ব্যাপার। একটী প্রকাণ্ড বিধান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ। যখন সেই চিরস্মরণীয় মহাত্মা এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর, সত্য ধর্ম্মের আন্দোলনে এই দেশ টলমল্ করিতেছে। সকল নগর, সকল গ্রাম, সকল দেশ, চারিদিক আন্দোলিত। ব্রাহ্মসমাজে এই পঞ্চাশ বৎসর যে সকল কার্য্য হইয়াছে, সাধারণ প্রণালী দ্বারা দুই শত বৎসরেও এ সকল হইতে পারিত না। ক্রমাগত এই বিধি চলিতেছে। যাঁহারা এই বিধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের সহকারী কর্ম্মচারী। তাঁহারা একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিহ্নিত। এজন্য তাঁহারা বিশেষরূপে মনোনীত। তাঁহারা আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও মুক্তি পাইবেন, কিন্তু এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানে অন্তর্ভূত না হইলে পৃথিবীর পরিত্রাণপথ পরিষ্কার হইবে না। যাঁহারা এই বিধানভুক্ত

হইবেন, তাঁহারা যে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং হতভাগা ; কিন্তু এই বিধানসম্পর্কে তাঁহাদিগের যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সেই বিষয়ে তাঁহারা মহাবীর। বিধান-সম্পর্কে একটু সামান্য কার্য্য করিলেও পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে ভয় করিবে। এখানে তাঁহারা রাজা হইতেও বড়, অন্য স্থানে গেলে তাঁহারা জল ছাড়া মৎস্যের ন্যায় নিস্তেজ। বিধানভুক্ত থাকিয়া যখন তাঁহারা বিধানের কথা বলিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের মুখ হইতে স্বর্গের অগ্নি এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে। এখানে থাকিলে তাঁহাদিগের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্যক সমস্ত তাঁহারা লাভ করেন। অন্যত্র গেলে তাঁহাদিগের আর সে তেজ থাকে না। এখনই পরীক্ষা কর। যতক্ষণ বিধানের সংযুক্ত ততক্ষণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, সেই জীবন শীতল হইয়া যাইবে। যতক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, ততক্ষণ জাগ্রত ভাব, ততক্ষণ জাগ্রত ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন। যাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, তাহারা অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুল বীর্য্যধারী।

যেখানে পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিতে হইবে, সেখানে অসাধারণ বলের প্রয়োজন। সাধারণ প্রণালীতে যে কার্য্য এক গুণ বলে হইবে, তাহাতে দশ গুণ বলের আবশ্যক। যেখানে অনেক বৎসরের কুসংস্কার এবং উপধর্ম্ম বিনাশ করিতে হইবে, সেখানে অলৌকিক বলের প্রয়োজন। দেশকে উর্ব্বরা করা অথবা প্রজা-দিগকে সামান্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া এ সকল কার্য্য সাধারণ

নিয়মানুসারে আস্তে আস্তে সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু যেখানে ভয়ানক ধর্ম্মসংগ্রাম করিতে হইবে, সেখানে পঞ্চাশ জনের দ্বারা পাঁচ হাজার লোকের কার্য্য করিয়া লইতে হইবে। অতএব যাঁহারা এই বিধানভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির সাহায্যে কার্য্য করিতে হইবে। যতক্ষণ এই বিধানের বহির্ভাগে ছিল, ততক্ষণ ঐ বঙ্গবাসী নিতান্ত নির্জীব এবং নিস্তেজ ছিল, আর যখন সে এখানে আসিল তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইল। তখনই তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া দাও, আর তাহার সে তেজ নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়, সেখানে সে আছে কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে তাহার মৃত প্রাণে নূতন উদ্যম এবং নবজীবনের সঞ্চার হইবে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক নগর আর এক নগরকে ধাক্কা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে; এক এসিয়া সমস্ত ইউরোপ এবং পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশকে আন্দোলিত করিতেছে। এখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতেছেন, ওখানেও ঈশ্বর কার্য্য করিতে-ছেন; কিন্তু সাধারণ কার্য্যপ্রণালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আছে। প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, এই বঙ্গদেশে একটী নূতন বিধানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন নহে। ভয়ানক ঘূর্ণ-জলের ন্যায় ইহা ঘুরিতেছে। কত প্রকার পৌত্তলিকতা,

অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে যে তাহা ফুরাইতেছে না। এ সকল অসাধ্যসাধন করিতে যে কত বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, তাহা সহজে মনে ধারণ করা যায় না। এইজন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ বিধানভুক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। বিধান এই প্রকার হইবে ইহা অনিবার্য্য! দুর্জ্জয় বেগে বিধানের স্রোত চলিয়া যাইবে, তুমি আমি সেই স্বর্গের স্রোতকে বাধা দিতে পারি না। এই যে ভয়ঙ্কর বেগে বিধানের জল ঘুরিতেছে, ইহাতে বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে। সকল বাধা বিপত্তি ঈশ্বর চূর্ণ করিবেন। অতএব ঈশ্বর যখন আসিয়াছেন বঙ্গদেশে একটী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, তাঁহাকে আর কেহই বাধা দিও না। কেহই পরস্পরের কার্য্যে বাধা দিও না। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য কার্য্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। দুই শত ব্রাহ্ম দাঁড়াও প্রতিজনের নিয়োগ পত্র দেখিয়া আপন আপন কার্য্য কর, আর আনন্দ মনে বল, “আমরা ধন্য, আমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বর আমাদিগকে লইয়া তাঁহার বিধান পূর্ণ করিবেন।”

সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব

তপস্যার রহস্য। *

মঙ্গলবার, ১০ই পৌষ, ১৮০০ শক ; ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥"

নারদপঞ্চরাত্র ১।২॥

"যদি হরি আরাধিত হন তবে তপস্যার ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যার ফল কি? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যার কি ফল? আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল?"

নারদপঞ্চরাত্রের এই উক্তি ভক্তদিগের পক্ষে অমূল্য রত্ন। ভাবটী সহজ অথচ অতি নিগূঢ়, সরল অথচ গভীর। ইহাতে বালকের কথা অথচ মহা জ্ঞানীর কথা মিলিত হইয়াছে; সাধনের এবং ভক্তির সামঞ্জস্য হইয়াছে। আপাততঃ শুনিলে মনে হয় এই কথাতে যেন কিছু অসঙ্গত আছে। এই কথা শুনিয়া বোধ হয়, বুঝি তপস্যার কোন ফল নাই। "যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যার ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন, তবে তপস্যার ফল কি?" যদি ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা দেখিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে

শিখিয়া থাক, তবে আর তপস্যার প্রয়োজন কি? আবার যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না কর এবং তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসিতে না পার, তাহা হইলেই বা তপস্যার ফল কি? বাস্তবিক তপস্যার কোন ফল আছে কি না? যাহাতে হরির আরাধনা হয় না অথবা হরির প্রতি প্রেমোদয় হয় না, সেই তপস্যায় কোন ফল নাই; আবার যদি হরির প্রতি প্রেম হইয়া থাকে তবে তপস্যার প্রয়োজন নাই। অতএব ঈশ্বরারাধনা করিলেও তপস্যার ফল নাই; এবং ঈশ্বরারাধনা না করিলেও তপস্যার ফল নাই। হরিভক্তি মনুষ্য জীবনের একমাত্র ভূষণ। যিনি হরিকে ভক্তি করেন, হরি-প্রেমে গলিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি হরিকে ভক্তি-রজ্জুতে বাঁধিয়াছেন তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? হরিকে আয়ত্ত করিবার জন্য তপস্যা। যিনি হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি হরির আরাধনা করিতে না চাও, তাহা হইলেও তপস্যার প্রয়োজন নাই। তপস্যার আগুনে দগ্ধ হওয়া কি জন্য? হরির প্রতি প্রেমের জন্য। যদি হরিপ্রেম হইল তবে তপস্যার ফল কি? আবার মনে কর হরিপ্রেমে মন মাতিল না, তবে তপস্যার ফল কি? যে ব্যক্তি প্রাণের ভিতরে হরিকে প্রেম-ফুল দিয়া পূজা করিতে পারে না, কঠোর তপস্যা করিলেও তাহার কিছুই হইবে না। যদি হরিপ্রেম বুঝিতে না পার, যদি হরিনামের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিতে না পার, তবে তপস্যায় কি হইবে?

হে মানব, তুমি সমস্ত ধন, সম্পদ ছাড়, তুমি সমস্ত দিবস মনকে নিগ্রহ কর, কঠোর তপস্যা কর, নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার কর,

কিন্তু এ সকল দ্বারা তোমার কিছুই হইবে না যদি হরির আরাধনা না কর। হৃদয়ে যদি হরিভক্তি না থাকে বাহ্যিক তপস্যায় কি হইবে? হরিপ্রেম ভিন্ন তপস্যার কোন প্রয়োজন নাই। হরির আরাধনাই সর্ব্বস্ব। হরির নাম শুনিয়া যাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হয়, তিনি কি জন্য কঠোর তপস্যা করিবেন? নিমেষের মধ্যে হরিপ্রেমে যাঁহার মন মত্ত হয় তিনি কেন তপস্যা করিবেন? যাঁহার অন্তরে হরিভক্তি জন্মিয়াছে তিনি সুখে হরিনাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর তপস্যা করিতে হয় না। যিনি ঘরের ভিতরে রাশি রাশি ধন পাইয়াছেন, তাঁহাকে কি বলিব তুমি জাহাজে যাও, তুমি বাণিজ্য কর, তুমি ধনবান্‌দিগের সেবা করিয়া ধন অর্জ্জন কর? যাহার ঘরে টাকা নাই সেই ব্যক্তি কঠোর তপস্যা করিয়া, ধন অর্জ্জন করুক; কিন্তু যাহার হস্তে রাশি রাশি টাকা সে কি জন্য কঠোর তপস্যা করিবে? তপস্যা তাহাদিগের জন্য যাহারা বহু কষ্টে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে চায়। প্রেমের পথ কষ্টের পথ নহে। অতএব যদি তোমরা প্রেমের সহিত ঈশ্বর-আরাধনা করিতে শিখিয়া থাক তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি ভক্তির সহিত ঈশ্বর-আরাধনা না কর তবে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও কিছু হইবে না। বৃক্ষ যদি মরিয়া শুকাইয়া যায়, তাহাকে হাজার যত্ন কর সে আর ফলবান্ হইবে না। আবার বৃক্ষ যদি ফল ফুলে পরিশোভিত হইয়া মনুষ্যের কাছে আপনার উদ্দেশ্য সফল করিতে থাকে, তাহার প্রতি আর বৃথা যত্ন কেন? অতএব প্রেমিক হও, তপস্যার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ হরিকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রেম-নয়নে দর্শন করিতে

শিক্ষা কর। যেমন চক্ষু খুলিব অমনই চারিদিকে হরিকে দেখিব, যেমন চক্ষু বন্ধ করিব অমনই ভিতরে হরিকে দেখিব। যাঁহাদিগের অন্তরে হরির প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে তাঁহারা যেখানে বসেন সেইখানেই হরিকে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। তাঁহারা আর কেন কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তীর্থযাত্রা করিবেন? তাঁহারা আর বৃথা তপস্যা করিয়া জীবনের শক্তি সকল ক্ষয় করিবেন কেন? যাহাদিগের অন্তরে বাহিরে হরি-দর্শন হয় নাই তাহারাই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া হরিদ্বার, বৃন্দাবন, প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করে। কিন্তু শাস্ত্রেতেই লেখা আছে "যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন, তবে তপস্যার কি ফল? আর যদি হরি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল?" যিনি অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিতে পান, তাঁহার হরিদ্বার বৃন্দাবন তাঁহার অন্তরে। তুমি ঘরে বসিয়া, হে ভক্ত, হরি সম্ভোগ কর, তোমার শ্রীক্ষেত্র কাশী বৃন্দাবন তোমার ঘরের ভিতরে। তোমার তীর্থযাত্রায় প্রয়োজন নাই, তোমার তপস্যায় প্রয়োজন নাই। যদি হরিকে লাভ করিয়া থাক তবে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক হইবে কেন? যদি হরিকে পাইয়া সুখী হইয়া থাক, তবে গ্রীষ্মকালে চারিদিকে ভয়ঙ্কর অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উত্তপ্ত, এবং শীতকালে জলের ভিতরে মগ্ন থাকিয়া শীত ভোগ করিবে কেন? যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণসখাকে পাইয়া থাক, তবে আর কার জন্য তপস্যা করিবে? আর যদি অন্তরে বাহিরে হরিকে না দেখিতে পাও, যদি হরিবিচ্ছেদে তোমার মন জর্জ্জরিত হয়, এবং সেই অবস্থায় কোথায় শ্রীহরি, কোথায় শ্রীহরি বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাক, এবং তোমার সেই ক্রন্দন আকাশ

গ্রাস করিতে থাকে—না আপনার গৃহে, না প্রতিবাসীর গৃহে, না ফলে, না ফুলে, না পর্ব্বত-শিখরে, না সাগর-বক্ষে কোথাও হরিকে দেখিতে না পাও, সেই অবস্থায়ও তপস্যা বৃথা। কারণ যে হরিকে বিশ্বাস করে না, তাহার যে হরি-অদর্শনের যন্ত্রণা, তাহা যে এক প্রকার নাস্তিকের ক্রন্দন হইল। তপস্যা অথবা কষ্টকর কার্য্য করিলেই যে হরিকে লাভ করা যায় তাহা মিথ্যা। তোমরা দেখিতেছ কত সন্ন্যাসী কত প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি হরিকে দেখিতে পাইয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা হরিকে দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইব বলিয়া এত কষ্ট করিতেছি। ক্ষুধার সময় খাই না, শরীরকে শুষ্ক করিতেছি, কঠোর তপস্যা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই সুখ পাই না।

এইজন্য কথিত আছে "নান্তর্বাহি যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।" আর যাঁহারা অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিতে পান তাঁহাদিগের এ সকল তপস্যার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শাস্ত্রকে হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা কেন বর্ণমালা পড়িবেন? যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়াছেন তাঁহারা কেন কষ্টপথে ভ্রমণ করিবেন? প্রেমিক লোকের পক্ষে ঈশ্বর-দর্শনই যথেষ্ট। প্রেমিক লোক আপনার হৃদয়ের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়সখা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বর তপস্যা অগ্রাহ্য করেন। প্রেমিক বলেন, আমার হরিকে আমার নিকট আনিয়া দাও, আমি তপস্যা করিয়া কি করিব? শুষ্ক কঠোর তপস্যাতে প্রেম হয় না। হে মনুষ্য, তুমি উত্তরে যাইবে মনে করিয়াছ, দক্ষিণে যাইও না। তুমি

ভক্তবৎসলের কাছে যাইবে মনে করিয়াছ, শুষ্ক পথে যাইও না। ভক্তিরাজ্যে জলের ব্যাপার। হরিভক্তি প্রচারের পূর্ব্বে এই কথা ছিল যে, বহু কষ্ট করিয়া যাগ যজ্ঞ, যোগ ধ্যান না করিলে, বেদ বেদান্ত না পড়িলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, হরিকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন ভক্তির পথ প্রচার হইল সেই কঠোর জ্ঞানের পথ বন্ধ হইল। ভক্তির ধর্ম্মে শরীর শুষ্ক করিতে হইল না; কিন্তু শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইল। হরিভক্তেরা দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা করিলেন;—"ভাই, কেন আর তপস্যা কর? যদি হরি আরাধনা কর তবে তপস্যা কেন? আর যদি হরি অরোধনা না কর তাহা হইলেও তপস্যার ফল কি?" সেই সময় হইতে প্রেমশূন্য কঠোর জ্ঞান এবং কর্ম্মকাণ্ডের পথ বন্ধ হইল। এখনকার কথা কি? ব্রহ্ম সুলভ, সুন্দর হরি হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া ভক্তকে দেখা দেন, এবং ভক্তের সঙ্গে কথা কহেন। অতএব সকলে ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া কেবল দেখ আর শুন। আপনার স্থান হইতে দুই হস্ত দূরে যাইতে হয় না। ভিতরে মনকে বিনীত কর, মনের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন;—"তোমার প্রাণের ধন, হে ভক্ত, আমি তোমার নিকটেই রহিয়াছি।"

দশ বৎসরে যাহা না হয় ভক্তি দ্বারা দুই মিনিটে তাহা হয়। বঙ্গদেশ বলিতেছেন, আমি আগে কত তপস্যা পরিশ্রম করিয়াও দেবের দুর্ল্লভ হরিকে পাইতাম না, এখন আমার কত সৌভাগ্য এখন আমি যেখানে বসি, সেখানেই হরিকে দেখিতে পাই। আগে বেদ বেদান্তের ঈশ্বর, হিমালয়ের ঈশ্বর গুপ্ত থাকিতেন

এখন অপ্রকাশ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এমন পন্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কষ্ট দূর হইল। শাস্ত্রেতেই এই উক্তি পাইলাম। বল আমার ঈশ্বর এই স্থানে, এই ডান দিকে, এখনই বল পলকের মধ্যে দেখিবে ঘর পবিত্র হইল, পাড়া পবিত্র হইল, দেশ পবিত্র হইল! একবার বিশ্বাসের সহিত বলিলে ঈশ্বর এখানে আছেন, আর ভক্তির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইল। একবার হরি-দর্শনের জন্য ভক্তের প্রাণ আকুল হইল আর তিনি ভিতরে বাহিরে চারিদিকে হরিকে দেখিতে পাইলেন। ভক্তবৎসল নিজে ভক্তের চক্ষুর অঞ্জন হইয়া ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। ভক্ত রাত্রে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেই চন্দ্রের সহাস্য জ্যোৎস্নার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের প্রসন্ন বদন দেখিতে পান, ভক্ত সংসারের দিকে তাকান, সেখানেও তিনি তাঁহার প্রাণের হরিকে দেখিতে পান। ভক্ত সংসারে স্বর্গের শোভা দেখিতে পান। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বলেন যে, আমরা সন্তান পালন করি, বাট্‌না বাটি, কুটনা কুটি, রন্ধন করি, সংসারের অত্যন্ত নীচ কার্য্য সকল করি, আমরা কিরূপে ঈশ্বরকে পাইব? আমরা সংসার লইয়াই ব্যাপৃত, আমরা অত্যন্ত দুঃখিনী আমাদিগকে কি হরি দেখা দিবেন? আমাদিগের কি গতি হইবে? আমাদিগের প্রতি কি হরির এত দয়া হইবে? আমাদের ভগিনীরা দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছেন;—"সকলের গতি হইবে; কিন্তু দুঃখিনী বঙ্গবাসিনীদিগের আর গতি হইবে না, আমরা ঘরের ভিতরে পড়িয়া আছি, এতগুলি ছেলে মেয়ে লইয়া থাকিতে হয়, সন্তানসেবা, পতিসেবা পিতা মাতা সেবা ইত্যাদিতেই সমস্ত দিন কাটিয়া যায়, আমরা আর সাধন ভজন করিব কখন? আমাদিগের ভবে আসা বৃথা হইল।

এই ভবে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া আমাদিগকে পরলোকে চলিয়া যাইতে হইবে।” এই নারদপঞ্চরাত্রের কথা, হে দুঃখিনী বঙ্গবাসিনিগণ, তোমাদের নিরাশ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া তোমাদিগকে আশ্বাস দান করিতেছে, তোমরা আর নিরাশার কথা বলিও না। এক দিকে তোমাদিগের স্বামী আর এক দিকে তোমাদিগের সন্তানগণ মধ্যে প্রাণের দেবতা হরি। তাঁহাদের মধ্যে হরিকে দেখিতে পাইবে।

মুদিয়ালি ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব।

মনুষ্যজাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। *

বুধবার, ১১ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

তোমার আমার গুণে মনুষ্য-কুল উজ্জ্বল হয় না, হইতে পারে না। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, গৌরব আছে, মনুষ্য-জীবনে সুখ আছে, স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য মনুষ্যের উচ্চ অধিকার আছে; কিন্তু তোমার আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এ সকল কথা বলিতে পারা যায় না। আমরা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হই যে, মনুষ্য কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্মিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়া সে অল্প পরিমাণে পুণ্য সম্বল করিয়া পরলোকে যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জীবন সুখে দুঃখে মিশ্রিত। বাস্তবিক তোমার আমার গুণে মনুষ্য-কুল উজ্জ্বল হয় না, আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আছেন বলিয়াই মনুষ্যের মুখ এত উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং

মনুষ্যের যে এত উচ্চ অধিকার আছে আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহারা যদি আমাদিগের মধ্য হইতে চলিয়া যান এখনই হাট ভাঙ্গিবে, এখনই এই উৎসাহের সংসার একেবারে নিবিয়া যাইবে, মনুষ্য নামের আর কোন গৌরব থাকিবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিদাও দাও, আর নীচ পশুজাতির মধ্যে প্রবেশ কর। আমরা যে মনুষ্য হইয়া আছি কেন? আমরা যে ভবিষ্যতের প্রতি এত আশা-নয়নে দেখি কেন? ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আছেন বলিয়া। চারিদিকে শৃগাল ব্যাঘ্র, কীট পতঙ্গ আছে, তাহারা কিছুকাল সংসারে আহার বিহার করিয়া মরিয়া যায়। তাহাদিগের জীবনে অন্ততর কোন শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য নাই। যখন ভ্রমর উড়িতে থাকে তখন সে কি স্বর্গের দিকে যায়? ব্যাঘ্র আজ মানুষ মারে, কালও মারে, পরদিনেও মারিবে, চিরকাল বংশ পরম্পরায় ব্যাঘ্র মানুষ মারিবে। হিংসা করা তাহার জীবন। তাহার ভূতকাল যেমন অন্ধকার, তাহার ভাবী জীবনও সেইরূপ অন্ধকার। কেবল মানুষ বলে আমি নীচ আছি; কিন্তু উচ্চ হইব, এবং ঋষির মুকুট আমার মাথায় দিব। যে মহত্ত্বের মুকুট কোন দিন মস্তকে রাখিতে না পারে, তাহাকে কি মনুষ্য বলিতে পারি? কুঁড়ে ঘরে সামান্য মনুষ্য-সন্তানের জন্ম। কিন্তু একদিন সে রাজসিংহাসনে বসিবে, রাজদণ্ড ধরিবে। মনুষ্য এত বড় হইল কেন? তাহার এত উচ্চ আশা কিসের জন্য হইল? তাহার বড় ভাই আছেন বলিয়া। আমরা ত নীচ, নীচ সংসারের দিকেই ত আমাদিগের গতি এবং আসক্তি, কেবল বড় ভাইয়েরাই আমাদিগকে উচ্চ দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে সংসারের উজন দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

আমরা বলি আমরা অমুক অমুক লোককে ভালবাসিব, সকলকে আমরা ভালবাসিতে পারি না, তাঁহাদিগের উদার প্রেম আমাদের কথার প্রতিবাদ করে। তাঁহাদিগের উদার প্রেম সাধু অসাধু, শত্রু মিত্র সকলকেই আলিঙ্গন করে। আমরা যতই নিরাশ হইয়া বলি আমাদিগের জীবনে আর কিছুই হইবে না তাঁহারা ততই উৎসাহের সহিত আমাদিগের কথার প্রতিবাদ করেন। আমাদিগের পশুপ্রকৃতি প্রবল, শীঘ্রই আমাদিগের সাধন ভজন ফুরাইয়া যায়, টানাটানির ধর্ম্ম অধিক দিন থাকে না; যৌবনের উৎসাহের সঙ্গে কিছুদিন ধর্ম্মের প্রতি নবানুরাগ থাকে; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নব ভাব এবং নব উদ্যম চলিয়া যায়, শেষ জীবনে আবার মন সংসারী হয়। কিছু দিন নূতন নূতন লোকের নূতন নূতন ভাব এবং নূতন নূতন সঙ্গীত মন মাতাইল, তার পর যাহা আমি তাহাই আমি। আমার ভাই ব্যাঘ্র, আমার ভাই শৃগাল, আমার হৃদয়-অরণ্যের মধ্যে কাম ক্রোধ প্রভৃতি বাস করিতেছে, আমাকে তুমি জোর করিয়া দুই দিন, কি দুই বৎসর ব্রাহ্মসমাজে ধরিয়া রাখিলে কি হইবে? ধরিয়া আনিয়াছ আসিয়াছি, আবার যখন ধর্ম্ম আমার ভাল লাগিবে না, তখনই শৃগাল ব্যাঘ্র যাহারা আমার সখা তাহাদের মধ্যে চলিয়া যাইব। ভিতরে মন ভাল না হইলে বাহিরের ধর্ম্ম কত দিন থাকিবে? এই যে সভ্যতাতে মনুষ্যসমাজ উন্নত হইতেছে এই সভ্যতা এই উচ্চতা মিথ্যা। যাই বাহিরের উৎসাহ শেষ হইবে সমস্ত মনুষ্যজাতি নীচে নামিয়া যাইবে। বাহিরের বাষ্প কত দিন বদ্ধ করিয়া রাখিবে? যুবা ব্রাহ্ম, তুমি বৃদ্ধ হইয়া আবার সংসারী হইবে সেই দিন প্রতীক্ষা কর। পাঁচ বৎসরের ব্রাহ্ম, দশ বৎসরের

ব্রাহ্ম. তোমরা কিছুকাল এখন ব্রাহ্মসমাজে খেলা কর; কিন্তু ইহা জানিয়া রাখ যখন তোমরা বৃদ্ধ হইবে তখন আর ব্রাহ্ম থাকিতে পারিবে না।

নীচ জাতির লোক নীচ থাকিবে। ভিতরে নীচতা লেখা আছে পাঁচ দিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসিলে কি হইবে? এক দিকে তোমার আমার পশু প্রকৃতি এবং নীচতা দেখিলে এ সকল নিরাশার কথা মনে হয়; কিন্তু ঐ দিকে দেখি পৃথিবীর মধ্যে এমন দশ বার জন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন যাঁহারা আমাদিগের উপরে বসিয়া আমাদিগের এ সকল কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। আমাদিগের এ সকল নিরাশার কথা শুনিয়া তাঁহারা একবার হাস্য করিলেন, তাহাতেই আমাদিগের সকল কথার প্রতিবাদ হইয়া গেল। আমরা নরক দেখিতেছি, তাঁহারা বলিবেন নরক কোথায়? আমরা যে দেখিতেছি এই পৃথিবীই স্বর্গ হইবে। আমাদের দিক হইতে কেবলই নিরাশার কথা উঠিল, তাঁহারা সকলই আশার কথা বলিলেন। আমরা দেখাইলাম পাঁচ লক্ষ কাঁটা, তাঁহারা দেখাইলেন সেই কাঁটার উপরে গোলাপ ফুল। আমরা বলিলাম চারিদিকেই ঘোরান্ধকার, তাঁহারা দিবসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন রাত্রিতেও পূর্ণিমা আছে। এই অল্প কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এত ক্ষমতা! আজ পৃথিবী একজনের জন্মোৎসব ভোগ করিতেছে। স্থিরচিত্ত ব্রাহ্ম, তুমি যে উচ্চ প্রকৃতির লোক তাহা কি আজ বুঝিতে পারিতেছ? তোমার সমক্ষে কি একটী উচ্চ লক্ষ্য দেখিতেছ? তুমি যে উচ্চ পরিবারের সন্তান, তুমি যে বাড়ীর লোক সে বাড়ীতে পশু প্রবেশ নিষেধ। তুমিও সেই বাড়ীতে যাইবে ইহা কি তোমার বিশ্বাস

হইতেছে? তোমার জীবন কি সেখানে বাস করিবার উপযুক্ত? সেখানে কেহ নিরাশ অথবা নিস্তেজ হয় না। সেখানে চির-যৌবন এবং চির-বসন্তের প্রাদুর্ভাব।

যদি পৃথিবী নানা প্রকার ভয়ানক কষ্ট দেয়, সেই বাড়ীতে গিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করিবে। যদি পৃথিবী তোমার মস্তকে কণ্টকের মুকুট দেয়, সেখানে গিয়া তুমি স্বর্গের মুকুট পুণ্যের মুকুট পরিধান করিবে। যদি এখানে পৃথিবীর অত্যাচারে তোমার কপাল হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়ে, সেখানে তোমার মস্তকে প্রেমের বৃষ্টি হইবে। সেখানে সোণার সিংহাসন তাঁহাদিগের জন্য স্থাপিত রহিয়াছে, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, এই পৃথিবীতে উৎপীড়িত হন। যাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের প্রকৃতি দেবভাব রহিয়াছে মনুষ্য তাঁহাদিগের মস্তকে কণ্টকের মুকুট দিলেও, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে স্বর্গের উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দেন। তাঁহাদিগের মস্তকে কাঁটা চিরদিন থাকিতে পারে না। এ সকল বড় ভাইদিগকে দেখিয়া মনে হয় আমরা মানুষ নই, আমাদিগের অন্তরেও দেবপ্রকৃতি আছে। ঐ জ্যেষ্ঠ ভাইদের প্রতি তাকাইলে মনুষ্যের দেবপ্রকৃতি দেখিতে পাই। চৈতন্য আমার ভাই, মহৎ ঈশা আমার ভাই, এ সকল কথা বলিতে কণ্ঠরোধ হয়, রসনা অবশ হয়, মন অগ্রসর হয় না; কিন্তু আমাদিগের প্রেমসিন্ধু পিতা স্বর্গের ঈশ্বর এ সকল বড় লোকদিগকে বড় ভাই বলিয়া ডাকিতে অনুরোধ করিতেছেন। এ সকল প্রেরিত সাধু সজ্জনেরা অত্যন্ত বড় লোক, আমরা ইহাঁদিগের নিকটে দাঁড়াইবার উপযুক্ত নহি। কিন্তু ইহাঁরা আমাদিগের কাছে আছেন, ইহাঁদিগকে দেখিলে আমরা আমাদিগের

মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব বুঝিতে পারি, আমরাও যে একদিন উচ্চ হইতে পারি ইহা মনে করিতে পারি। সাহস করিয়া যদি শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ইহাঁদিগকে বড় ভাই বলিয়া ডাকিতে পারি আমরাও বাঁচিয়া যাইব। আমাদিগের ভাই বড়, বড় ঘরে আমরা জন্মিয়াছি ইহা'ত সাব্যস্ত হইল। বড় ঘরে আমরা জন্মিয়াছি ইহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নিজ দোষে জুয়া খেলিয়া তাস পাশা খেলিয়া নীচ হইয়াছি, তথাপি আশা হইতেছে যে আমরা একদিন ভাল হইব। বড় ভাই এই কয়জনকে দেখিয়া মনটা কত প্রশস্ত হইল। আমাদের দাদা যাঁহারা তাঁহারা এমন লোক ইহা মনে করিলে নীচ মন উচ্চ হয়, ক্ষুদ্র মন মহৎ হয়। তাঁহারা কত বড় ছিলেন, ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলির পরিত্রাণের জন্য তাঁহারা অনায়াসে তাঁহাদিগের প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অকুণ্ঠিত ভাবে, কিছুমাত্র কাতর না হইয়া যেমন লোকে চাদর ফেলিয়া দেয়, তেমনই জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদিগের ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (আজ সমস্ত পৃথিবী যাঁহার জন্মোৎসব ভোগ করিতেছে) তাঁহার প্রাণটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস! কি আশ্চর্য্য ভক্তি! কেমন অগাধ প্রেম! কি অলৌকিক ক্ষমা! কেমন জ্বলন্ত বিশ্বাস! কখনও বলিলেন না যে "আমার বোধ হয়" আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন ঐ দেখ স্বর্গ। জগতের লোকদিগকে বলিলেন ঐ স্থলপদ্মগুলি দেখ, বৈরাগ্য দেখিতে পাইবে, আকাশের পাখীগুলি দেখ, আত্ম-বিসর্জ্জন দেখিতে পাইবে। আমরা থাকি গোলাপ ফুলের উপরে, তাঁহারা থাকিতেন গোলাপ ফুলের ভিতরে। তাঁহারা ঐ ফুলগুলিকে বন্ধু বলিয়া গুরু বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিতেন।

যদি মনুষ্যজাতির এই দাদা কয়জন না থাকিতেন আমরা ক্রমে ক্রমে নীচ এবং হীন হইয়া মরিয়া যাইতাম। তোমরা যখন নিরাশ হও, কে তোমাদিগকে আশার কথা বলেন? যখন শোক-দুঃখ-ভারে মন অবসন্ন হয় তখন প্রতীক্ষা করি কখন দাদার কথা শুনিব। দাদার মুখে একটী আশার কথা, একটী তেজের কথা শুনিলাম, আর মনের আনন্দে দশ পনর বৎসর কাটাইলাম। ধন্য সেই ভাইগুলি যাঁহাদিগের জন্য পৃথিবী বাঁচিয়া আছে! তোমরা বল টাকাতে বড় মানুষ হওয়া যায়, ইহা মিথ্যা কথা। যদি যথার্থ বড় মানুষ হইতে চাও, কেবল এই সাধুদিগকে গণনা কর। ইহাঁরাই মনুষ্যজাতির রত্ন, অমূল্য নিধি। ইহাঁরাই যথার্থ মণি মাণিক্য। পৃথিবীতে আসিয়া এই ধন ভিন্ন আর কোন সার ধন পাই নাই। ইহাঁরা ব্রাহ্মের আদরের ধন, এইজন্য ব্রাহ্মের বাড়ীতেই টাঁকশাল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ফাঁকি দিলাম। কারণ প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিরোমণি আমাদিগের বাড়ীতে। ব্রাহ্মেরা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক। আমরা অবতার মানি না, মধ্যবর্ত্তী মানি না; আমরা বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, আমাদিগের ঈশাও নাই, চৈতন্যও নাই; কিন্তু আমরা বাড়ীতে লুকাইয়া সমস্ত দাদাগুলির পা ধুইয়া দিই। দাদাদিগকে শ্রদ্ধা না করিলে আমরা বাঁচিতে পারি না, আমরা পিতার পরিবারে বাস করিতে উপযুক্ত হইতে পারি না। এক একজন বড় ভাই এই পৃথিবীর ঘোর অন্ধকার রাত্রে এক একটী লণ্ঠন ধরিয়া আমাদিগকে আলোক দেখাইতেছেন। তাঁহারা এই আলোক না দেখাইলে আমরা স্বর্গের অট্টালিকা দেখিতে পাইতাম না। এক ভাই স্বর্গের লণ্ঠন হাতে

লইয়া আমাদিগকে স্বর্গরাজ্যের শোভা দেখাইতেছেন, আর এক ভাই হরিনাম করিতে করিতে প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া আমাদিগকে ভক্তির সরস পথ দেখাইতেছেন। অতএব ইহাঁরা আমাদিগের জীবনের রত্ন স্বরূপ। ইহাঁদিগকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না।

পৃথিবীর নীচ ধার্ম্মিকেরা বলে, এ সকল মহাত্মারা কথনও পৃথিবীতে ছিলেন; কিন্তু অভ্রান্ত সত্য এই ইহাঁরা এখনও আমাদিগের বুকের ভিতরে আছেন। সমুদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগুলি আমাদিগকে আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছেন। ঈশ্বর কি ইহাঁদিগকে মিথ্যা সৃজন করিয়াছেন? ইহাঁদিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই? ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে এ সকল টাকা, এ সকল অমূল্য রত্ন যে এখানে প্রেরণ করিতেছেন তাহা কি এইজন্য যে আমরা এ সকল তুচ্ছ করিব? যে ঈশ্বর আমাদিগকে ধান্য দেন, বস্ত্র দেন, তিনিই আমাদিগকে ঈশাকে দেন, চৈতন্যকে দেন। বড় দাদাদিগের নাম করিব ইহাতে লজ্জা কি? গোপন কি? আমরা লজ্জা ছাড়িয়া কি ইহাঁদিগকে গ্রহণ করিতে পারিব না? যাঁহাদিগকে দেখিলে আমাদিগের স্বর্গের কথা মনে পড়ে, এবং আমাদের আপনাদিগের দেবপ্রকৃতি বুঝিতে পারি, তাঁহাদিগকে কোন লজ্জায় গোর দিয়া, চাপা দিয়া আসিব? ঈশ্বর সোণার অলঙ্কার দিলেন কি এইজন্য যে স্ত্রীলোকেরা তাহার আদর না করিয়া ফেলিয়া দিবে? নর নারীর ভূষণ জ্যেষ্ঠ ভাই। যদি বল ইহাঁরা প্রেরিত মহাজন ছিলেন তাহা ইতিহাসের কথা হইল; যদি বল, যদিও আমরা ইহাঁদিগের শরীর দেখিতে পাই না তথাপি ইহাঁরা মরেন নাই, কারণ ইহাঁরা অমরাত্মা, তাহা মনোবিজ্ঞানের কথা হইল। যদি বল তাঁহারা ছিলেন অতএব তাঁহারা

আছেন, তাহাও ন্যায়শাস্ত্রের কথা হইল। আমি বলি ইহাঁরা আমাদের ঘরের বড় দাদা। ইহাঁদিগকে ছাড়িয়া আমরা কিছুই করিতে পারি না, আমরা যখন পৃথিবী হইতে স্বর্গে বেড়াইতে যাই, ইহাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন। ইহাঁদিগকে দর্শন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের একটী মত যে প্রেরিত সাধুদিগকে মানিতে হইবে; কিন্তু কেবল মানিলে হইবে না ইহাঁদিগকে সমক্ষে আদর্শ রাখিয়া জীবনকে উন্নত করিতে হইবে। ইহাঁদিগের গৌরব আমাদিগের গৌরব, ইহাঁদিগের মহত্ত্বে আমাদিগের মহত্ত্ব। অতএব ইহাঁরা সকলেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর কাছে থাকুন। যত সাধু সাধ্বী আছেন সকলেই আমাদের প্রত্যেকের আদরের ধন হউন। টাকা কড়ি ছাড়িয়া দিই, এই সাধু টাকা ধন রত্ন গ্রহণ করি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেমন ভাই সুখী ত? তাহাকে বলিব খুব সুখী, আমার বাড়ীতে পাঁচটী জ্যেষ্ঠ ভাই আসিয়াছেন, পাঁচটী রত্ন পাইয়াছি। আগে একা ছিলাম, এখন তাঁহাদিগকে পাইয়া আর কোন দুঃখ দারিদ্র্য নাই। ইহাঁরা বড় ঘরে চাকরী করেন, এত টাকা আনিয়া আমার হাতে দেন যে, আমি আর গণনা করিয়া উঠিতে পারি না। আগে আমার পাঁচ টাকা বেতন ছিল, কোন মতে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিতাম; কিন্তু এই পাঁচ জন বড় দাদা—যাঁহাদিগকে আমি হারাইয়াছিলাম—আমার ঘরে আসিয়াছেন অবধি, আমি নিজে কত সুখে খাইতেছি, স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে খাওয়াইতেছি, বন্ধু বান্ধব এবং পাড়ার লোককে ডাকিয়া খাওয়াই-তেছি, তথাপি এত ধন অবশিষ্ট থাকে যে, কিছুতেই তাহা ফুরায় না, এবং পুত্র পৌত্রাদিও পাঁচ হাজার বৎসর খাইলেও তাহা ফুরাইতে

পারিবে না। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, এত সুখ তোমাদের হবে এত ধন তোমরা পাবে যদি বড় দাদাদিগকে তোমরা গৃহে স্থান দাও। যাহাদিগের সংসারে এতগুলি জ্যেষ্ঠ ভাই তাহাদিগের ভয় কি? কনিষ্ঠের আবার অধিকার কি? বড় দাদাদিগের সঙ্গে থাক সকল দুঃখ দূর হইবে। প্রচুর ধন অশেষ খ্যাতি সেই পরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে যেখানে বড় দাদারা যথা স্থানে উপবিষ্ট।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সৃষ্টিবীজ। *

রবিবার, ১৫ই পৌষ, ১৮০০ শক; ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

সৃষ্টি অতি চমৎকার এবং নিগূঢ় ব্যাপার। আমরা সামান্য বুদ্ধিতে যাহা সৃষ্টি বলি তাহা সৃষ্টি নহে। ভক্তিবিহীন লোকেরা যাহাকে সৃজন বলে তাহা সৃজন নহে। অনন্ত আকাশে অসীম অন্ধকার ব্যাপ্ত ছিল, ঈশ্বর মালী হইয়া সেই অন্ধকারের ভিতরে একটা বীজ রোপণ করিলেন, তার পর যে কি হইল, তোমাদিগের বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর। সচ্চিদানন্দ পুরুষ, আমাদিগের বুদ্ধির অতীত এক বীজ রোপণ করিলেন, সেই বীজের ভিতর হইতে নরলোক, দেব-লোক, ভূলোক, দ্যুলোক বাহির হইল। সেই বীজ হইতে ক্রমাগত নানা প্রকার বিচিত্র পদার্থ বাহির হইতে লাগিল, এখনও হইতেছে! একদিন সৃষ্টি হয় নাই, নিত্য সৃষ্টি হইতেছে, যাহারা বলে স্রষ্টা

একদিন এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারা প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব জানে না। সৃষ্টিবীজের কার্য্য ক্রমাগত চলিতেছে; লক্ষ যুগে সৃষ্টি ফুরাইবে না। আর একটী নূতন কথা এই যে, সৃষ্টিবীজের মধ্যে ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ একত্র নিহিত রহিয়াছে। ভূতের ভিতরে ভবিষ্যৎ রহিয়াছে; যাহা লক্ষ বৎসর পরে হইবে তাহা ভূত কালে ছিল। এখন যাহা দেখিতেছি, এখন যাহা হইতেছে তাহা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বীজের মধ্যে ছিল। যাহা হইবে তাহা হইয়াছিল। অতএব এক সৃষ্টিবীজের মধ্যে ত্রিকাল এক কালে ঘনীভূত। প্রকাণ্ড বৃক্ষ এক বীজের মধ্যে ছিল, সুতরাং বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ফল ফুলও ছিল। যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, যাহা হইবে সমুদয় বীজের ভিতর ছিল। কারণে সমুদয় কার্য্য ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপতির রোপিত বীজের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত ছিল। ইতিহাস ত ছিলই, আর এখন হইতে লক্ষ বৎসর পরে যাহা হইবে তাহাও ছিল।

সৃষ্টিতত্ত্ব ভাবিলে মনের মধ্যে আনন্দ হয়, মন মহৎ হয়। ইতিহাস পড়িলে অনুরাগ বিস্তৃত হয়। এদেশে কতক ওদেশে কতক সত্য, এই শতাব্দীতে কতক সত্য, ঐ শতাব্দীতে কতক সত্য, ইতিহাসের এই সমুদয় সত্য কুড়াইয়া লইলে যে সমুদয় সত্যের একটী ঘনীভূত আধার হয় তাহাই সৃষ্টিবীজ। অনেক প্রকার বিচিত্র ঘটনা; কিন্তু এ সমুদয় লইয়া বীজটী নামিল। বীজের মধ্যে অগণ্য সূর্য্যমণ্ডল, কত দেশ, কত নগর, কত গ্রাম, কত জাতীয় নর নারী, কত মন্দির, কত উপাসনাপ্রণালী, কত ভক্ত ছিল। এ সমুদয় বক্ষের ভিতর লইয়া ঈশ্বরের বীজ অন্ধকারের ভিতর পড়িল। চন্দ্র এখানে, সূর্য্য ওখানে, যোগী এখানে,

ভক্ত ওখানে, এখানে ধর্ম্মালয়, ওখানে বিদ্যালয়, এখানে সাধকদিগের স্থান, ওখানে তপস্বীদিগের স্থান, সমুদয় ঐ বীজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে সমুদয় ঐ বীজের মধ্যে ছিল। এই সৃষ্টিবীজ দেখিয়া তত্ত্বদর্শীর মন বিস্মিত হইল তাঁহার চক্ষু হইতে ভক্তির অশ্রু পড়িল। তিনি চমৎকৃত হইয়া বলিলেন মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি!

ধর্ম্মপ্রচারকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি আজ যাহা হইল এবং ভবিষ্যতে যাহা হইবে সমুদয় ঐ বীজের মধ্যে ছিল, তবে ত আমরা যে সকল পাপ করিতেছি এ সমুদয় ঈশ্বর জানিতেন, তবে ত আমাদের স্বাধীনতা রহিল না, তবে ত আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারিত ছিল, তবে ত ইহার অন্যথা হয় না। না, তোমার আমার স্বাধীনতা নষ্ট হইল না। রাজবিচারে সকলকেই আসিতে হইবে। দায়িত্ব ঘুচিল না, অথচ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞ চক্ষু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভাবী ঘটনাবলী বর্ত্তমানের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখিতেছে। যেমন বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষ অপ্রকাশিত ভাবে থাকে, সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঐ সৃষ্টিবীজের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। যেমন ভৌতিক নিয়ম তেমনই ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম। এইরূপ হইবে, কেন না ঈশ্বর বলিয়াছেন। যে বীজে যে প্রকার বৃক্ষ নিহিত আছে যদি সেই বীজ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইতে সেই বৃক্ষ প্রকাশিত হইবেই হইবে। যদি ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, অমুক দেশে অমুক শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ হইবে, কে বাধা দিবে? ঈশ্বর বলিয়াছেন এইজন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ। ঈশ্বরের সেই কথারূপ বীজ হইতে এই ব্রাহ্মসমাজরূপ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনও এই বৃক্ষের পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই, ক্রমাগত পাঁচ সহস্র বৎসর

চলিয়া যাইবে, তখনও ইহার উন্নতি হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, যে সকল ঘটিতেছে এবং যে সকল ঘটিবে, এ সমুদয় ঐ বীজের মধ্যে ছিল। কোথাকার জল আসিয়া কোথায় বহিতেছে, কোথাকার অগ্নি আসিয়া কোন্ দেশ প্রজ্বলিত করিতেছে, তুমি আমি এ সকল জানিতাম না, কিন্তু ঈশ্বর এ সমুদয় জানিতেন।

এই যে ব্রাহ্মসমাজ হইল ইহা বিধির বিধানে। যে বিধানে চন্দ্র সূর্য্য হইল ঠিক সেই বিধানে। যে বীজের ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য বাহির হইল, সেই বীজের ভিতর হইতেই ধর্ম্মবিধান সকল বাহির হইতেছে। বীজের মধ্যে না থাকিলে এ সকল বাহির হইতে পারিত না। তোমরা অগ্নিবাজী দেখিয়াছ। যখন বেগের সহিত অগ্নিবাজী আকাশে ছুটিল, তৎক্ষণাৎ তাহাতে লাল নীল, সাদা এবং নানা বর্ণের গোলাকার অগ্নিপুঞ্জ সকল বাহির হইল। এ সকল বিচিত্র বর্ণের আলোক দেখা যাইত না যদি বাজী-নির্ম্মাতা সেই বাজীর মধ্যে ঐ সকল আলোকের কারণ না রাখিত। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি এই বিচিত্র প্রকারের জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ উপগ্রহ সকল দেখিতে পাইতাম না, যদি স্রষ্টা তাঁহার সৃষ্টিবীজের মধ্যে এ সকল নিহিত না রাখিতেন। বীজ না ফাটিলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। বীজ ফাটিল, তাহার মধ্য হইতে চারিদিকে বিচিত্র পদার্থ সকল বাহির হইল। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মবিধান হইয়াছে এবং হইবে, এ সমুদয় সৃষ্টিবীজের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। মঙ্গলময় ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বর লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে কি দুর্ঘটনা সকল হইবে তাহা পূর্ব্বেই জানিয়া তৎপ্রতিবিধানের উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন। যিনি শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার জননীর

স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া রাখেন, সেই বিধাতা সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ অথবা ভয়ানক পাপ এবং নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইবে, ইহা জানিয়া পূর্ব্বেই এ সকলের প্রতিবিধান করিয়া, রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অলৌকিক এবং অসীম শক্তি যে তিনি মনুষ্যের পাপ হইতে পুণ্য এবং দুঃখ হইতে সুখের উৎপত্তি করেন। তাঁহার নিগূঢ় কৌশলে মনুষ্যের পাপ আপনি আপনার মৃত্যুকে বক্ষে ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি ক্ষয় করিবে।

আত্মহত্যা করা পাপের স্বভাব। পাপ কখনই পরিণামে জয়লাভ করিতে পারে না। পাপের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি সংহার করে। সৃষ্টির অর্থই পুণ্যের প্রকাশ। যখন সৃষ্টিবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তখন পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য দুর্জ্জয় প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর পাপ এবং মৃত্যুর হস্তে তাঁহার সংসারকে ভাসাইয়া দেন নাই। যাহারা অল্পবিশ্বাসী অথবা উপধর্ম্ম-বিশ্বাসী তাহারাই বলে ঈশ্বর পৃথিবীকে পাপভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ণ বিশ্বাসী তাঁহারা বলেন সৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্ব সৃজন করিয়া ইহা ছাড়িয়া দেন নাই; কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অপার ধর্ম্মলীলা, জ্ঞানলীলা এবং প্রেমেরলীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির কোন ঘটনা ঘটে না। সৃষ্টির অত্যন্ত সামান্য ব্যাপারও তিনি সম্পন্ন করেন। মনুষ্য যে অত্যন্ত কদর্য্য পাপাচরণ করে তাহাও ঈশ্বরের শক্তির অপব্যবহার। আশ্চর্য্য এই মনুষ্য ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ভিন্ন একটী দুষ্কর্ম্মও করিতে পারে না অথচ ইহার মধ্যেও তাহার

স্বাধীনতা থাকে। ঈশ্বর বঙ্গদেশের কল্যাণের জন্য, পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান করিলেন, এই অপূর্ব্ব বীজ তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। এই বিধানের ভিতরেই তুমি অধর্ম্ম করিতে পার, যাহাতে একদিন সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে সেই বিধানভুক্ত লোক হইয়াও তুমি পাপাচরণ করিতে পার, ইহাতে ঈশ্বরের হস্ত বাধা দিবে না। তিনি কাহারও স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি বলিয়াছেন নর নারী স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবে। জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর বাহির করিতেছেন যোগ, আমি স্বাধীন ভাবে বলিতে পারি আমি যোগী হইব না, পৃথিবীর সমুদয় পাপীদিগকে ছায়া দান করিবার জন্য ঈশ্বর বাহির করিতেছেন ভক্তির শাখা, আমি পাষণ্ড হইয়া স্বাধীন ভাবে সেই শাখা কাটিয়া ফেলিতে পারি। জগৎকে সুখী করিবার জন্য ঈশ্বর প্রকাশ করেন পুণ্যের জ্যোতি, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ অন্ধকার দ্বারা সেই জ্যোতিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারি। ঈশ্বর বলপূর্ব্বক কাহারও স্বাধীনতা হরণ করেন না। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি আমার সন্তানকে স্বাধীনতা দিয়াছি, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে, আমি তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কখনও আঘাত করিব না, সে পাপ করিতে চায় করুক, আমি তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিব না; কিন্তু তাহার স্বেচ্ছাচার এবং পাপ সত্ত্বেও আমি তাহাকে পরিত্রাণ করিব। কারণ আমার সৃষ্টির অর্থই পরিত্রাণ। আমি আমার কোন সন্তানকেই পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত হইতে দিব না। প্রতিজনকেই আমি অনন্ত ধর্ম্মবলে বলী, এবং অনন্ত সুখে সুখী করিব। আমার সৃষ্টির অন্য উদ্দেশ্য নাই।

বস্তুতঃ সৃষ্টির অর্থই কল্যাণ বিস্তার, আনন্দ বিস্তার। ঈশ্বর অকল্যাণ সৃষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বর বলিতেছেন আমি আমার সন্তানদিগের অধর্ম্ম সত্ত্বেও তাহাদিগের মধ্যে আমার পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত করিব। মনুষ্য চিরকাল ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিধানকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যের সহস্র প্রকার পাপ, জঘন্যতা এবং বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আপনার গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সকল সিদ্ধ করিয়াছেন। বীজের ভিতরে ঈশ্বরের সমস্ত জ্ঞান কৌশল স্থির রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইতে পারে না, তিনি প্রতিজনকে মুক্তি দিবেনই দিবেন; অথচ তিনি আশ্চর্য্য কৌশলে মনুষ্যের স্বাধীনতা নির্লিপ্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিবীজের মধ্যে এমনই একটা শক্তি আছে যে, যখনই সেই শক্তি মনুষ্যের হৃদয় স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ পাপের ভিতর হইতেও পুণ্য প্রকাশিত হয়। জল আসে কোথা হইতে? কঠোর প্রস্তরময় শক্ত পর্ব্বত হইতে। তেমনই মনুষ্যের কঠোর নীরস প্রাণ হইতে প্রেম ভক্তির নদী প্রবাহিত হয়। তোমরা কি শুন নাই যে ঈশ্বরের মহিমাতে কত পাষণ্ড পুণ্যাত্মা হইয়াছে এবং কত অভক্ত ভক্ত হইয়াছে? যুগে যুগে ভক্তেরা আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভয়ানক পাপের মধ্যে পুণ্য অথবা নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখাইয়াছেন। পৃথিবীর পাপাত্মারা যতই তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিল ততই তাঁহাদিগের পুণ্য উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, তোমাদিগের পাপ অবিশ্বাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। এই আমরা কয়জন কি এতদিনের ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনায়াসে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি?

আমাদিগের জন্মদিবসে বিধাতা আমাদের কপালে এই লিখিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগের পরিত্রাণ হইবে।" তোমার আমার কপালে, তোমার আমার হাতে বিধাতা এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টির দিন স্বয়ং ব্রহ্ম যাহা লিখিয়াছেন কে তাহা খণ্ডন করিবে? যাহার যে নিয়তি, যাহার অদৃষ্টে স্রষ্টা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইবেই হইবে। সৃষ্টিবীজের গঠনই এইরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে, পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে, ক্রমে এই পরিত্রাণের রাজ্য উজ্জ্বলতর হইতেছে। আমরা পাপী বলিয়া কি ঈশ্বরের পরিত্রাণ কার্য্য বন্ধ থাকিবে? আমাদের স্বেচ্ছাচার আমাদের হাতে, এই হাতে আমরা ধর্ম্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করি; কিন্তু এই হাত আবার বিধাতার হাত। এই অঙ্গুলির মধ্যে তাঁহার শক্তি আসিয়া পাপকে পরাস্ত করে। আমরা যত কেন পাপ করি না দর্পহারী আমাদের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করেন। তিনি বলিয়াছেন পুণ্যের জয় হইবে, তাঁহার কথা অনিবার্য্য। তাঁহার ইচ্ছা হইতে যে বীজ উৎপন্ন তাহা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেই করিবে।

রসনা যন্ত্র।

রবিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০০ শক; ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহারা আধ্যাত্মিক এবং অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী তাঁহারা শরীরকে তুচ্ছ করেন, নানা প্রকার কঠোর তপস্যা করিয়া শরীরকে শুষ্ক করেন। তাঁহাদিগের সংস্কার মনই সর্ব্বস্ব। বিশ্বাস, প্রীতি, পুণ্য, শান্তি সকলই মনেতে হয়। শরীর অসার, অপদার্থ। শরীর

কিছুই নহে, মনই সার এবং নিত্য বস্তু। শরীরকে অবহেলা কর, নিগ্রহ কর, মনের মহিমাকে মহীয়ান কর। শরীর কিছুই নহে, শরীর অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, এ সমুদয় কথাতে আমরা সায় দিলাম বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? এই অসার শরীরের দ্বারাও ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গের আশ্চয্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেন। একটী ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড, তাহার নাম রসনা। যদি জিজ্ঞাসা কর পরিত্রাণ-পথে কি রসনা সহায় হয়? আমি বলিব রসনা দ্বারা জীবের পরিত্রাণ হয়। রসনা অমূল্য রত্ন, রসনা জীবের পরম বন্ধু। রসনার কথা মনে হইলে, দুটী কথা মনে পড়ে, একটা আশীর্ব্বাদ, অন্যটী অভিসম্পাৎ। রসনা বলিল, তোমার ভাল হউক, অমনই তোমার ভাল হইল। রসনা বলিল, তোমার মন্দ হইবে, অমনই তোমার মন্দ হইল। তোমরা বলিতে পার তবে রসনা কি রাজা, যে রসনা যাহা বলিবে তাহাই হইবে? রসনা হইতে জীবের মঙ্গল অমঙ্গল বিনিঃসৃত হয়। পাঁচ সহস্র বৎসর তোমার মঙ্গল হউক, রসনা এই কথা বলিতে পারে। রসনার সঙ্গে অমৃতধাম, পরলোকের কি সম্বন্ধ? রসনা দ্বারা মিষ্ট রস আস্বাদন করা যায়, মিষ্ট কথা বলা যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্তু ইহাতে যে পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে, তাহা কে জানে? আমি বলি রসনার মধ্যে স্বর্গের চাবি রহিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ যতক্ষণ না রসনা বলিতে পারে, আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন; আর যখন রসনা বলিল, ঈশ্বর-দর্শন হইল, তখনই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ সরল হইয়া জিহ্বা দ্বারা যেরূপ বলে, সেইরূপ হইতে পারে। মানুষ জিহ্বা দ্বারা বলুক, আমি বৈরাগী

হইব, সে নিশ্চয়ই বৈরাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহ্বা দ্বারা বলুক, আমি ভবসাগর পার হইব, সে নিশ্চয়ই ভবসাগর পার হইয়া যাইবে। আর যে ভবসাগরের তীরে বসিয়া কেবলই বলিতেছে, আমি এই দুস্তর সাগর পার হইতে পারিব না, তাহার শান্তিধামে যাওয়া হইল না। যে বলিল বহুকালের অভ্যস্ত পাপ জমাট হইয়া গিয়াছে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশা নাই, তাহার আর শীঘ্র পাপ হইতে মুক্ত হওয়া হইল না। আর যে হুঙ্কার করিয়া বলিল, এখনই আমি পাপের জমাট ভাঙ্গিব, তাহার পাপের অভ্যাস ভাঙ্গিল। যে অবিশ্বাসী, অলস, নিরুৎসাহ, যে রসনায় সাহস করিয়া বলিতে পারে না, যে আমি পাপ জয় করিবই করিব, তাহার পাপাভ্যাস খণ্ড খণ্ড হয় না। জিহ্বার কথার উপরে এত নিভর করে। অতএব প্রত্যেক ভক্ত রসনাকে অনুকূল করিয়া লউন! অত্যন্ত ভাল অবস্থায়ও বিপাকে পড়িতে হইবে, যদি রসনা সহায় না হয়। যাহার হাতে কথার বল আছে, সে অনায়াসে পাপ অসত্যকে জয় করে। কেন না কথাই ব্রহ্ম। যে কথা বলিতে পারিল না, যে শব্দ করিল না, সে ব্রহ্মের বল পাইল না। একবার রসনা হুঙ্কার করিয়া বলুক, এই পাপ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিলাম, রসনার কথা তখনই সিদ্ধ হইবে। এইজন্য রসনার আশীর্ব্বাদের এত বল এবং এমন ফল।

যখন জিহ্বা বলিল, তোমার মঙ্গল হউক, জিহ্বা ঈশ্বরের কথা বলিল। ঈশ্বর যখন সরস্বতীরূপে অবতীর্ণ হইয়া জিহ্বাকে বাক্যোচ্চারণ করিতে নিয়োগ করেন, তখন জিহ্বা জ্ঞান ও মঙ্গলের ভাব পাইয়া শতধারে অমৃত বর্ষণ করে। আর রসনা যতক্ষণ নাস্তিক থাকে, ততক্ষণ সে অবিশ্বাস, অহঙ্কার, নিরাশার কথা বলে। যার জিহ্বা

নাস্তিক হইয়া নিরাশার কথা সকল বলে, যার কর্ণ এই নাস্তিক জিহ্বার কথা সকল শুনে তার কল্যাণ হয় না, উন্নতি হয় না। কবে আমাদের রসনা আমাদিগকে প্রেমরস পান করাইতে সদয় হইবে? কবে রসনা ঈশ্বরের কথা বলিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে? কবে রসনার কথায় আমাদিগের শান্তি হইবে? সাধু হইবার জন্য, সুখী হইবার জন্য প্রতিদিন কত চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তোমার রসনা তোমার অনুকূল নহে। উৎসব আসিতেছে, কত লোক স্বর্গের কত রত্ন লাভ করিবে, কিন্তু তোমার রসনা তোমাকে বলিতেছে, তোমার কিছু হইবে না। চারিদিকে সকলেই তোমার অনুকূল, কিন্তু তোমার সেই নাস্তিক জিহ্বা তোমার প্রতিকূল। উৎসবের শত শত লোকের চক্ষু হইতে ভক্তিধারা বিনিঃসৃত হইবে, কিন্তু তোমার অবিশ্বাসী অভদ্র রসনা ক্রমাগত তোমাকে অভিসম্পাৎ করিতেছে। সকল দিক সহাস্যভাব ধারণ করিয়াছে। সকল ভাই ভগিনী কল্পতরুর নিকট পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেছেন, কিন্তু তোমার রসনা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইল না। রসনা যাহার প্রসন্ন না হয়, সে কিছুতেই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। নাস্তিক মনুষ্যের রসনা যে তাহাকে অভিসম্পাৎ দেয়, তাহার হেতু আছে। রসনার বাণী আর ব্রহ্মবাণী একই। ব্রহ্মবাণী রসনার শব্দ, সামান্য বস্তু নহে। রসনার শব্দে মানুষের পরিত্রাণ হইতে পারে। একবার যে বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারে, শত শত বৎসরের পাপ দূর হউক, আর সত্য সত্যই শত শত বৎসরের পাপ চলিয়া যায়। যে একবার বলিতে পারে আমার জীবনে শত শত ভয়ানক পাপ থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ব্রহ্ম-দর্শন করিবই করিব, নিশ্চয়ই তাহার কথা সিদ্ধ হয়।

এই কথা বলিল কে? ব্রহ্মাশ্রিত রসনা। যখনই রসনা এই কথা বলিল, তৎক্ষণাৎ চন্দ্র সূর্য্য ইহার সাক্ষী হইল। হাত যাহা করিতে পারে না, চক্ষু যাহা দেখিতে পায় না, রসনা তাহা করাইয়া দেয়, রসনা তাহা দেখাইয়া দেয়। সাধকের জিহ্বা যদি তাঁহার অনুকূল হয়, তিনি অন্ধ হইয়া দেখিতে পান, হস্তহীন হইয়া ধরিতে পারেন। সমস্ত পৃথিবী কিছুই হইল না, কিছুই হইল না, বলিয়া নিরাশার কথা বলিতেছে; কিন্তু ভক্তের রসনা আশার কথা বলিয়া স্বর্গরাজ্যের অভ্যুদয় করিল। ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড রসনা কি না করে? নাস্তিক অভদ্র রসনা পৃথিবীকে অসাড়, ভীত এবং নিরাশ করে, জ্ঞান শিক্ষা দেয় না, ভাল পথ দেখাইয়া দেয় না। একে ত পৃথিবী পাপভারে আক্রান্ত, তাহাতে রসনার কুবাক্য। রসনার দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া কত লোকের অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে। রসনা শত্রু ভয়ানক শত্রু। রসনা সদয় হইলে পরিত্রাণ। সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যদি দুই পাঁচটী লোকের রসনা শুভাশীর্ব্বাদ করে, এই দূষিত বায়ু ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইবে। রসনার আশীর্ব্বাদে দুর্ব্বল সবল, রোগী সুস্থ এবং নির্জ্জীব সজীব হইবে। একজনের আশীর্ব্বাদে শত শত বংশের লোক পরিত্রাণ পাইবে। কথার কত ক্ষমতা! অমৃত বাক্য উচ্চারণ কর, সাহসের কথা শান্তির কথা বল। ক্ষুদ্র রসনা সিংহের ন্যায় প্রবল হউক। ছোট কল, ছোট রসনা যন্ত্র। কেমন যন্ত্র তোমরা জান না। রসনার ভাল কথায় জীবের কল্যাণ হইবেই হইবে। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পাইবে, যদি রসনা আস্তিক হয়। মুখ ভাল কথা বলে না, তাই আমাদের ভাল হয় না। অতএব শুভ উৎসবে রসনা-পক্ষীটীকে শুভ কথা

বলিতে শিক্ষা দাও। সকল রসনা “মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক” এই কথা বলুক। রসনা যদি সহায় হয়, তোমরা পাঁচটী ব্রাহ্ম পাঁচ হাজার ব্রাহ্মের ন্যায় সবল এবং সতেজ হইবে। রসনা একটী প্রকাণ্ড যন্ত্র। পঞ্চাশটী ব্রাহ্ম প্রবল হইয়া যদি হুঙ্কার করেন, আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইবে। কেবল ব্রাহ্মেরা ভাল কথা বলিতে চাহেন না, এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা। রসনা তেজের কথা বলিলে, নিমেষের মধ্যে চিরজীবনের পাপ সকল ধ্বংস হইবে। রসনার কথা পাঁচ লক্ষ লোককে মঙ্গল-পথে লইয়া যাইবে। রসনা ঈশ্বরের সংস্পর্শে অলৌকিক বল এবং স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই রসনার আশীর্ব্বাদে আমাদের পরিত্রাণ হইবে।

আল্‌বার্ট কলেজ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০০ শক; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে সভাপতি যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এই দুঃখে সকলেই দুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ, ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা যে একটী স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা

আপনাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি মনে কর যে, দল বৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। যতদিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল হইয়াছে; এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায়, এরূপ দল হইবেই। কিন্তু কতকগুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ইংরাজীতে যাহাকে Party বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল হইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যতদিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূল সত্যে বিশ্বাস করিবেন, ততদিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাঁহারা

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন। আমরা কয়জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন দুই পক্ষ পরস্পরের বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না, সেইরূপ উভয় পক্ষ পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন, কিন্তু আক্রান্ত যদি ক্ষমাশীল হন, সংগ্রাম চলিতে পারে না। ঈশ্বর-কর্ত্তৃক-প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইহাঁর আপনার লোকেরাই যদি ইহাঁর প্রতি শত্রুতা করেন, তথাপি ইনি তাঁহাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে পারেন না। শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই ইহাঁর ক্রোড় প্রেমপূর্ণ থাকিবে। এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয় তৎসমুদয়ের প্রতি ইহাঁর সদ্ভাব থাকিবে, অন্যথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটী উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতি সপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা হইত, সেই গৃহ একটী সপ্তাহিক উপাসনা স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা একটী সপ্তাহিক উপাসনা স্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটী উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহাঁর বন্ধুতার সম্বন্ধ, শক্রতা নহে। উন্নতি-স্রোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত। অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্যাতন না হয়। সকল প্রকার বিরোধ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রমুক্ত। প্রেম বিস্তারের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যাহা করেন, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন।

আর একটী কথা। ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈক্য দেখা যায়, এ সকল সাময়িক উত্তেজনা। যখন বর্ত্তমান অপ্রেম-মেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন সত্য-সূর্য্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকুন, পরে এই বর্ত্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে, সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পুরুষ-প্রকৃতি ও নারী-প্রকৃতি।

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

কোন একটী প্রাচীন পুরাণে কথিত আছে যে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ সৃজন করিলেন, অবশেষে সেই পুরুষের ভিতর হইতে অস্থি লইয়া স্ত্রী রচনা করিলেন। ঈশ্বরের হস্তে সর্ব্বাগ্রে পুরুষ সৃষ্ট হইল, তৎপরে নারী। পুরুষ হইতে নারী উৎপন্ন হইল, নারীর পরে পুরুষ নহে। এই আখ্যায়িকা চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, ইহার ভিতরে কোন নিগূঢ় অর্থ থাকিবে। ভাবুকের হৃদয় সকল স্থান হইতেই সত্য উদ্ভাবন করিবার জন্য ব্যস্ত। এই আখ্যায়িকা গভীর জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে পরিত্রাণতত্ত্ব পাওয়া যায়। পুরুষ-প্রকৃতির ভিতর হইতে স্ত্রী-প্রকৃতি প্রস্ফুটিত হইল। কথিত প্রাচীন পুরাণে এই

আকারে এই সত্য কেন লিখিত হইল? মনুষ্যের সমস্ত প্রকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি এবং নারী-প্রকৃতি এই দুই বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মনুষ্য যখন প্রথম সাধন আরম্ভ করে, তখন তাহার পুরুষ-প্রকৃতি। মূল প্রথমে, বৃক্ষ পরে, ক্ষুদ্র শিশু আগে, যুবা পরে। ধ্যান যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর পুরুষ-প্রকৃতিকে সৃজন করিয়াছেন। মনুষ্য এই পুরুষ-প্রকৃতির উত্তেজনায় পৃথিবীতে যত প্রকার সত্য আছে, সমুদয় আয়ত্ত এবং সাধন করিয়া জগতে জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত হন, তিনি নীতিতত্ত্ব অধ্যয়ন এবং নানা প্রকার বিজ্ঞানানুশীলন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন, এবং গভীর ধ্যানযোগে মগ্ন হইয়া যোগী, ঋষি, মুনি হইতে থাকেন। ঋষি-প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি। উৎসাহী যুবা ধাৰ্ম্মিক হইয়া সংসারের মধ্যে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা পুরুষ-প্রকৃতির কার্য্য। বৃহৎ ব্রতধারী ব্রহ্মচারী সাধু হইয়া সংসারে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা পুরুষের ধর্ম্ম। এই পুরুষ-প্রকৃতি সাধন ধর্ম্মশাস্ত্রের এক পরিচ্ছেদ, কিন্তু এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের শেষ হইল না। স্বর্গে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ; নর-প্রকৃতি সেখানে যাইতে পারে না। যদি বল তবে পুরুষ কি কখনও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না? কি করিবে? তোমার আমার হাতে শাস্ত্র নহে। তোমার আমার বিচারনিষ্পত্তি ঈশ্বরের বিচারনিষ্পত্তি নহে। ঈশ্বর আমাদিগের বুদ্ধির পরামর্শ না শুনিয়া তাঁহার নিজের মনের মত ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছেন। পুরুষ স্ত্রী না হইলে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, স্বর্গের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নূতন পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে।

যখন ঈশ্বর দেখিলেন যে, মনুষ্যের পুরুষ-প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে

প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম পূর্ণাবস্থা ধারণ করিয়াছে, তখন মনুষ্যের প্রথমাবস্থা সম্পর্কে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ইহার পরেই মনুষ্যের দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ স্ত্রী-প্রকৃতি সাধন আরম্ভ হয়। এমন সময় ছিল, যখন সেই মনুষ্য কেবল পুরুষ ছিল, যখন তাহার মধ্যে নারী ছিল না; কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, যখন সে পুরুষ থাকিবে না, কেবল নারী হইবে; এমন সময় আসিতেছে, যখন ধর্ম্মরাজ্যের পুরুষেরা বালিকা, যুবতী এবং প্রাচীনা হইবে। নারী-প্রকৃতি ভিন্ন কঠোর প্রকৃতি পুরুষেরা কখনও উৎসবের রাজ্য অধিকার করিতে পারিবে না। একবার পুরুষ-প্রকৃতি অনুসারে মহা উৎসাহ এবং উন্মত্ততার সহিত হরিনাম গাঁন করিলাম, আবার নারী-প্রকৃতি লইয়া হরিনাম আরম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের পুরুষ-প্রকৃতির সাধনই পূর্ণ হয় নাই। কই ভাই, তোমার পুরুষের ধৈর্য্য অধ্যবসায়, উদ্যম উৎসাহ কই? এই তোমার বিশ্বাস, ক্ষণকাল পরে তোমার সংশয় অবিশ্বাস, এই তোমার জগতের প্রতি প্রেম, পরক্ষণে তোমার শুষ্কতা। কাপুরুষ তুমি, সাধুপুরুষ তুমি নহ, এখনও তোমার বিশ্বাস, প্রেম, উৎসাহ দুর্ব্বল। পুরুষ, যখন সামান্য বিঘ্ন দর্শনে তোমার চক্ষের জ্যোতি ম্লান হয়, তখন তুমি পুরুষ কিরূপে? যাহার পুরুষত্ব আছে, তাহার মন হইতে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং সমস্ত রিপু পলায়ন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, তোমার হুঙ্কারে সকল পাপ পলায়ন করিবে।

ব্রহ্মপুত্রের বেগের নিকট কোন বাধা তিষ্ঠিতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র, তোমার ধর্ম্মজীবন প্রবল তরঙ্গ, সেই তরঙ্গের আঘাতে পাপ-জঞ্জাল থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে কয়জন এইরূপ ব্রহ্মপুত্রের নাম

পাইয়াছেন? মন যাহাদের দুর্ব্বল, চক্ষু যাহাদের নিকৃষ্ট এবং অপবিত্র, হস্ত পদে যাহাদের বল নাই, তাহারা কি ব্রহ্মপুত্র অথবা সাধুপুরুষ উপাধির যোগ্য? তাহারা পুরুষ নহে, যাহারা দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ। যখন দেখিতেছি তুমি একটী কার্য্যের ভার লইয়া ছয় মাসেও তাহা নির্ব্বাহ করিতে পার না, তখন তোমাকে পুরুষ বলিতে পারি না। যেমন ছোট সিংহ বৃহৎ সিংহের আকার ধারণ করে, যথার্থ পুরুষও কার্য্যের সময় সেইরূপ বৃহৎ সিংহের ন্যায় বল প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মদিগের মনে যতদিন নিরুৎসাহ, নিরাশা থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজে পুরুষ নাই মনে করিতে হইবে। যাহার পদভরে ভূমিকম্প হয় না, সে পুরুষ নহে। আমি পুরুষ তাঁহাকে বলি, যাঁহার হুঙ্কারে পাপ ভস্মীভূত হয়। তিনি একবার হুঙ্কার করিয়া বলিলেন;—রে পাপ, রে অধর্ম্ম, দূর হও, আর পাপ তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

বহুকালের অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না—পুরুষ হইয়া কদাচ এ সকল নিরাশার কথা মুখে আনিও না। তুমি কার পুত্র, হে ব্রাহ্ম, তাহা কি জান না? পুরুষ কি কাহাকেও ভয় করে? ব্রহ্মপুত্রের নিকটে কোথাকার বিঘ্ন? ব্রাহ্ম, তুমি কি না বলিলে, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার মন অবসন্ন হইয়াছে? তুমি পুরুষতত্ত্ব জান না; ঘর্ষণে, পরিশ্রমে মনের বল বৃদ্ধি হয়। পুরুষ কখনও পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হন না। যদি ব্রাহ্মসমাজে দুই শত পুরুষ, দুই শত ব্রহ্মপুত্র দণ্ডায়মান হন, তবে কি আর এত অধর্ম্ম এত পাপ থাকিতে পারে? ব্রহ্মপুত্রের নিকটে, যথার্থ পুরুষের নিকটে কি ষড়রিপু তিষ্ঠিতে পারে? ষড়রিপু কি, ষাট রিপু একত্র হইলেও যথার্থ পুরুষের একটী চুলও ক্ষয় করিতে

পারে না। ঈশ্বরের দক্ষিণ-বাহু হইতে পুরুষের উৎপত্তি। যিনি পুরুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং তেজ দিয়াছেন, তিনি পুরুষের পুরুষ, পরমপুরুষ, মহাপুরুষ। তোমরা তাঁহার বল অন্তরে অনুভব কর, তাহা হইলে প্রকৃত পুরুষত্ব কি বুঝিতে পারিবে। যদি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় আজ সকলে বলিতে পার, আমি ঈশ্বরকে দেখিলাম যদি সহস্র সহস্র লোক তোমার এই কথার প্রতিবাদ করে, তুমি বলিবে, "কি আমি পুরুষ হইয়া, আমি ঈশ্বরের পুত্র হইয়া, ঈশ্বরকে যে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ইহা অস্বীকার করিব?" ব্রাহ্ম, তুমি একবার ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সোণা, রূপা, হীরা, মাণিক ঐহিক সুখ সম্পদকে বলিলে, "আমি তোমাদিগকে ছাড়িলাম, আর আমি তোমাদের প্রত্যাশায় ব্রহ্মধনকে অবহেলা করিব না।" একবার বৈরাগী হইয়া আবার কি তুমি সংসারে প্রবেশ করিবে? একবার সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক ভোগ লালসাকে জলে বিসর্জ্জন দিয়া, আবার পুরুষ হইয়া কোন্ মুখে ডুব দিয়া তোমার দুটা ঘসা পয়সা তুলিয়া লইবে?

পুরুষের কথার অন্যথা হয় না। যদি একবার ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়া থাক, এই আমি বৈরাগী হইলাম, আর কখনও সংসারী হইব না। যদি পুরুষোত্তম হও, সেই কথা পালন করিতেই হইবে। পুরুষের নাম মহাপরাক্রান্ত উৎসাহী বীর। পুরুষের পদভরে মেদিনী কাঁপে। একটী পুরুষ যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লইয়া আপনার কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মেদিনী ভারাক্রান্ত হইয়া বলেন, পুরুষ বটে; আর পুরুষত্ব-বিহীন লক্ষ লক্ষ লোক যদি পৃথিবীর উপরে বসে, তাহাদিগের ভার পৃথিবী বুঝিতেও পারেন না, যেমন গাভীর শৃঙ্গে

মশা বসিলে, গাভী তাহা টেরও পায় না। অতএব ভাই, পুরুষ হও। ব্রহ্ম এক পুরুষ। তাঁহার তেজ হইতে পুরুষের উৎপত্তি। যখন ব্রহ্ম আপনার মুখে বলিলেন পুরুষ হউক, তখন পুরুষের জন্ম হইল। ব্রহ্ম মুখের কথা হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। তেজ হইতে পুরুষের জন্ম, অতএব সকল প্রকার আলস্য, জঘন্যতা এবং নির্জ্জীব ও নিস্তেজ ভাব পরিহার করিয়া ঈশ্বরের তেজের দিকে তাকাও। তেজস্বী ঋষিদিগের কথা শুনিয়াছ, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে পাপ ভস্ম হইয়া যাইত। ব্রহ্মপুত্র, তেজের পুত্র তুমি, তুমি কেবল সেই তেজোময়ের কাছে আপনার আসনে বসিয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে এক একটী করিয়া পাপ আপনি পলায়ন করিতেছে। ব্রাহ্ম, তুমি তেজোময় হও। যখন তুমি পুরুষের পূর্ণ তেজ লাভ করিবে, তখন স্বর্গরাজ্যে তোমার জন্য নূতন ব্যবস্থা হইবে, তখন তুমি ঈশ্বরের মুখে নূতন আদেশ শুনিবে। তুমি বৃহৎ ব্রতধারী তেজস্বী পুরুষ হইয়া ব্রহ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে; ব্রহ্ম বলিলেন, এখানে তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়া তুমি জন্মগ্রহণ কর। পুরুষের এই নারীজাতিতে জন্মগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্যের পুনর্জ্জন্ম। প্রথমে নর-প্রকৃতি, পরে নারী-প্রকৃতি। নর-প্রকৃতির ভিতর হইতে তেজের সহিত বলপূর্ব্বক এক নূতন প্রকৃতি বাহির হইল। তাহাই যথার্থ প্রকৃতি, অকৃত্রিম প্রকৃতি অর্থাৎ নারী-প্রকৃতি। নর-প্রকৃতির ভিতরে বালক খেলা করিতেছিল, এখন দেখি বালিকা খেলা করিতেছে। নরের খেলা নরের মত, নারীর খেলা নারীর মত। বাস্তবিক বালিকারই ভাল খেলার ঘর আছে, তাহার খেলার ঘরে কত রকমের ছোট ছোট পুতুল আছে, মানুষ

আছে, ছোট ছোট বিছানা আছে, ছোট ছোট আকারে নানা প্রকার সামগ্রী আছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পুরুষ-প্রকৃতির ভিতর হইতেই ব্রহ্মকন্যার জন্ম হইল। নূতন পুরাণ আরম্ভ হইল। নারীপুরাণ। এই পুরাণ বেদ উপনিষদ হইতেও উত্তম। শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত নারী-চরিত্র। অতি সুললিত স্বর্গের ভাষায় নারী-প্রকৃতি লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মকন্যার জন্ম হইল, কোমল চক্ষু, কোমল হস্ত, কোমল ভাব, যেন ঈশ্বরের বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুটিতেছে। প্রকৃত হিন্দু জানেন, নর হইতে নারী শ্রেষ্ঠ। নারীরূপ মনোহর, নারীর কোমলতায় সকলের মনোরঞ্জন হয়। ছোট বালিকা, তোমার রূপ দেখিয়া মনে হয়, তুমি আমাদের দেশের লোক নহ। আমাদের এই দেশ কঠোরপ্রকৃতি খোট্টাদিগের দেশ। আমাদিগের এই দুরন্ত দেশে তুমি আসিলে কেন? তোমাকে যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি কি জানিতেন না যে, আমাদের দেশে তোমার মনের মত উপকরণ নাই? এই দেশ একটী প্রকাণ্ড মরুভূমি, এখানে পদ্মফুল ফুটে না, চন্দন নাই, জল নাই, আরবদিগের দেশ, এখানে সেই সুধা নাই, যাহা পান না করিলে তুমি বাঁচিতে পার না। বাছা, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও, এখানে তোমার থাকিবার স্থান নাই। বাস্তবিক ব্রহ্মকন্যার স্থান এখানে নাই। দুর্জ্জন দেশে, দস্যুদিগের নিকট থাকিলে তাঁহার কষ্ট হয়। এই কন্যাটীর নাম কি জান? ভক্তি। প্রত্যেক কন্যা দেবকন্যা। দেবকন্যার প্রকৃতি স্বর্গের প্রকৃতি, পুরুষের প্রকৃতি হইতে তাঁহার স্বভাব স্বতন্ত্র। পরের দুঃখে ইহাঁর মহা দুঃখ হয়, কিন্তু ইনি ইহাঁর নিজের দুঃখের ভিতরে এমনই শান্তভাবে

বসিয়া থাকেন, যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। ইহাঁর চরিত্র দেখিলে, ভাবিলে চক্ষে জল আসে। আমরাও সময় সময় গরিবকে পয়সা দিয়া থাকি, কিন্তু এই ব্রহ্মকন্যা যখন একটী গরিবকে পয়সা দেন, তাহার দুঃখ ভাবিয়া আগে আধ ঘণ্টা কাঁদেন। গরিবকে গরিব বলিয়া ডাকেন না, ডাকিতে পারেন না, কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুমধুর ভাবে কথা বলিয়া তাহার দুঃখ মোচন করেন। আমরা পরের জন্য কি নিজের সম্বন্ধে একটুকু দুঃখ সহ্য করিতে পারি না, কিন্তু ব্রহ্মকন্যার কোমল প্রাণ সহস্র একাদশীর কষ্ট সহ্য করে। রৌদ্র বৃষ্টি নারীকে অবসন্ন করিতে পারে না।

নারীর হৃদয়ে যদি যথার্থ ধর্ম্ম স্থান পান, নারী সহস্র বিপদে পড়িলেও সেই ধর্ম্মকে আর ছাড়িতে পারেন না। ভয়ানক দুঃখের তরঙ্গেও নারীর বিশ্বাস টলমল করে না। নারীর কি সুন্দর ধর্ম্মভাব! তিনি এমনই স্থানে তাঁহার বিশ্বাসকে রাখিয়াছেন যে, সেখানে কোন শত্রু যাইতে পারে না। তিনি বলেন, আমার প্রাণের ঠাকুর ইষ্টদেবতাকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া গেলে আমি বাঁচিব না। যাক এ সকল কথা। আসল কথা এখনও বলা হয় নাই। পুরুষ-প্রকৃতির ভিতর হইতে যে নারীর জন্ম হইল, তাহার যে বিবাহ হইবে। বালিকার বয়স হইল স্বামীকে চিনিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল, চেষ্টা হইল। ঘটক আসিল, সম্বন্ধ স্থির হইল, চারিদিকে আনন্দধ্বনি, বাদ্যধ্বনি এবং সুমধুর সঙ্গীতের লহরী উঠিল। ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হইবে। পাত্র কোথায়? পাত্র কে? যথা সময়ে সুঘটক আসিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। ধর্ম্মের রূপ গুণের কথা শুনিয়া বিবাহের জন্য উপযুক্ত

হইয়াছেন যে ব্রহ্মকন্যা তাঁহার এক গুণ কান্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইল। আমার পিতা মাতার কাছে বসিয়া ধর্ম্মকে বিবাহ করিতে পারিব, এই বলিয়া ব্রহ্মকন্যা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। যেমন বর তেমন পাত্রী, যেমন পাত্র তেমন কন্যা। ধর্ম্মের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইবে, ইহা মনে করিয়া পিতা মাতারই বা কত আহ্লাদ! শুভক্ষণ আসিল ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হইল। আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইল, স্বর্গের দেবতারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মূল কথা, বিবাহের মূল মন্ত্র পতিব্রতা হওয়া।

যেথানে ধর্ম্মের সঙ্গে ব্রহ্মকন্যার বিবাহ হয়, সেই দেশে পাপ ব্যাভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়া পতিব্রতা ব্রহ্মকন্যা কেবল পতি, পতি, পতি, বলিয়া ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ব্রহ্মকন্যা ঐশ্বর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্যের পানে তাকান না, অন্যের বাড়ী যান না। তাঁহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্ব্বদা স্থির রহিয়াছে। সতীত্ব তাঁহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন, ধর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা, ধর্ম্ম ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না। নূতন বিবাহ হইয়াছে, ধর্ম্মপতির পূজা করিবার জন্য ব্রহ্মকন্যা সংসারে নানাবিধ আয়োজন করিলেন। সতী স্ত্রী প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার হৃদয়-উদ্যানের সরোবরে স্নান করিবেন। তুমি যথন উঠ নাই, আমি যথন উঠি নাই, ব্রহ্মকন্যা তথন উঠিয়াছেন। সতীর সাধন লুক্কায়িত। তোমার আমার সমক্ষে তিনি কিছু প্রকাশ করেন না। গোপনে অন্ধকার মধ্যে তিনি পুষ্প চয়ন করেন। প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সেই ধর্ম্মের পতিব্রতা নারী, সেই ঈশ্বরের কন্যাটী তাঁহার

পিতার রচিত হৃদয়-উদ্যান হইতে ভাল ভাল ফুলগুলি আহরণ করিলেন। প্রেমের ফুলগুলি হাতে লইয়া সুন্দর মালা গাঁথিলেন, পরে ভক্তি-চন্দন লইয়া হাসিতে হাসিতে পুণ্যের আসন পাতিয়া দিয়া ধর্ম্মপতিকে বলিলেন, প্রভু, প্রাণ-সিংহাসনে বস। পরে প্রভুর গলায় পুষ্পহার, এবং কপালে চন্দন দিয়া পতিপূজা আরম্ভ করিলেন। প্রাণ-পতিকে সতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর, প্রাণারাম, আমার আর কিছু নাই, আমার এই হৃদয়, মন, প্রাণ, সর্ব্বস্ব তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়াছি। আমি ইহকাল, চিরকাল তোমার সেবা করিব, তোমার পূজা করিব। ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, তথাস্তু, তোমার কোমল হৃদয় সহস্রগুণ কোমল হউক, তোমার হৃদয়ে পুণ্য শান্তি বৃদ্ধি হউক! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমি কি ছবির কথা বলিতেছি? যথার্থ নারী-প্রকৃতি আমি দেখি নাই। দেখি নাই বা বলিব কেন? হৃদয়ের এক পার্শ্বে দেখিয়াছি। নারী-প্রকৃতির এই আদর্শ। ঐ ব্রহ্মকন্যা প্রত্যূষে উঠিয়া পতিপূজা করিতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেছেন। ব্রহ্মকন্যা নিতান্ত কোমল প্রকৃতি, তিনি বলেন, আমার মস্তকে বুদ্ধি চাপিয়া দিও না, বুদ্ধি এবং কুটিল শাস্ত্রের ভার আমি বহন করিতে পারি না। আমার মনে বুদ্ধি একটু বিদ্ধ করিলে, আমার হৃদয় হইতে রক্ত পড়ে। আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমরা আমাকে চেন নাই; যাহারা কঠোর ব্যবহার করে, তাহাদিগের নিকটে আমি থাকিতে পারি না, বিধাতা আমাকে অতি কোমল সামগ্রী দিয়া রচনা করিয়াছেন, আমি কঠোর প্রকৃতি সহ্য করিতে পারি না। এমন কি জ্ঞানের সহিত যে পূজা সেই পূজায় যোগ

দিতেও আমার প্রাণেশ্বর আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। ভক্তির সহিত যে উপাসনা, তাহাতেই কেবল আমি যোগ দিতে পারি। ভাই, পুরুষ-প্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, এখন নারী হও। পুরুষ নারী হইবে, ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক বলিবে, পুরুষ কি কখনও নারী হয়? না হইলে এই কথা হইল কেন? ব্রহ্মপুত্র, তুমি ব্রহ্মকন্যা হইবে কবে? পতিধন পুরুষ কিরূপে বুঝিবে, নারী না হইলে? নারী না হইলে সতীত্ব ধর্ম্ম কিরূপে জানিবে? সতী যেমন আপনার স্বামীকে ভালবাসে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমরা ভালবাসিব? স্বর্গের নারী-প্রকৃতি এবং হরিভক্ত অভিন্ন। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, ভক্তিরাজ্যে একটাও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোক হইয়া গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে হরিকন্যাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আমরা হরিপাদপদ্ম পূজা করিব? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্যাগণ, তোমরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরিনাম-গুণ গান কর। ব্রহ্মকন্যা, তুমি তোমার অবিভক্ত প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবং সুখী কর। এখন হরিকন্যার ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, কেহই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভক্তির ধর্ম্ম না হইলে, এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও, হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারী-প্রকৃতি পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার

অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!

ধ্যানের উদ্বোধন।

অপরাহ্ণ, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

এ সময়ে আমরা ব্রহ্মধ্যানের জন্য প্রস্তুত হই। আকাশের পক্ষী যদি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, আমরা ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ করি। ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই সুন্দর পক্ষীকে ধরিতে চেষ্টা করি। ঘন অন্ধকার মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া থাকি। পরে পক্ষীটী ক্রমে ক্রমে হস্তগত হইয়া যায়। জীবাত্মা পরমাত্মাকে ধরিবার জন্য ঠিক সেই কৌশল প্রকাশ করে। অনন্ত আকাশে অনন্ত পক্ষী উড়িতেছেন। আকাশে ধরিতে গেলে কোন্ আকাশে চলিয়া যাইবেন। এইজন্য আকাশ হইতে তাঁহাকে হৃদয়ের ঘরে লইয়া যাইতে হয়। যখন একবার হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্ম-পক্ষী উপস্থিত হইলেন, তখন জীবাত্মা সুযোগ পাইয়া সেই ঘরে দর্শন শ্রবণের জানালা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরের আলোক আসিবার পথ না পাওয়াতে হৃদয়ের ঘর ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সেই অন্ধকার মধ্যে পরমাত্মা পক্ষীর লোভে জীবাত্মা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সেই অন্ধকার ঘরে আর কেহ নাই। একটী লোক নাই, একটী পদার্থ নাই, সব অন্ধকার, সেই অন্ধকার মধ্যে পরমাত্মা রহিয়াছেন। সেই ছোট ঘরের ভিতরে পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন। আমার এই অন্ধকার হৃদয়-ঘরের মধ্যে

পরমাত্মা-পক্ষী নিশ্চয়ই আছেন, নিশ্চয় আছেন, ইহা বারবার স্মরণ কর, বারবার সাধন কর। যোগী তাহার ভক্তি-হস্ত দ্বারা ব্রহ্ম-পক্ষীকে ধরিয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দিল। পক্ষীকে লইয়া ক্রমাগত ক্রীড়া করিতে লাগিল। একবার হস্তে, একবার বক্ষে, অবশেষে পক্ষীকে প্রাণ-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল, আর পক্ষী উড়িতে পারিল না। সুচতুর যোগী ব্রহ্মকে চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করিয়া লয়। এই কার্য্যটী এখন আমাদিগের করিতে হইবে। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উপাসনা করিলাম, মধ্যাহ্ন উপাসনা হইল, সঙ্গীত হইল, পাঠ হইল, এখন ধ্যান করি। দয়াময় বিধাতা, যোগী ঋষিদিগের ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অন্ধকারের ভিতর হইতে বাহির করিতে হইবে। হৃদয়ের সমুদয় দ্বার বদ্ধ করিতে হইবে। কেন না হৃদয়-দ্বার খোলা রাখিলে, তন্মধ্যে বাহিরের বিষয়-চিন্তার আলোক আসিবে। অতএব সমুদয় দিক বদ্ধ করিয়া একাগ্র মনে অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করি। ব্রহ্ম-পক্ষী আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই ক্ষুদ্র মনের ভিতরে অনন্ত আকাশের পক্ষী বর্ত্তমান। আরও অন্ধকার হউক, আরও অন্ধকার হউক, হৃদয়ের গভীর স্থানে ঘোরান্ধকার মধ্যে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করি। বাহিরের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গেল। হৃদয়-রাজ্যে হৃদয়েশ্বর প্রকাশিত হউন। ধ্যানের আরম্ভে মনে হয় ব্রহ্ম-পক্ষী একবার এই দিক একবার ঐদিক যাইতেছেন, কেন না তখনও মন চঞ্চল থাকে। এইজন্য মনকে স্থির করিতে হইবে। একাগ্রতা-রজ্জু দ্বারা মনকে বদ্ধ করিব। সকলে ব্রহ্ম-পক্ষীকে ধরিবার জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ করুন। হৃদয়ের সকল কপাট কি বদ্ধ করিয়াছি? একটুও

কি আলোক আসিতেছে না? একটীও কি বিষয়ের চিন্তা আসিতেছে না? একটুও কি বায়ু আসিতেছে না? একটী কোলাহলও কি আসিতেছে না? অন্ধকার, তুমি এস। ব্রাহ্মগণ, ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মধ্যান কর। যত নিকটে জমাট করিয়া সেই ঘন পদার্থ ব্রহ্মকে দেখিবে, ততই কৃতার্থ হইবে। সেই ব্রহ্ম-পক্ষী অন্ধকারের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়া তোমাদের সমক্ষে ভিতরে এবং চারিদিকে রহিয়াছেন। কৃপাসিন্ধু তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন!

নামসাধন। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সমাগত বন্ধুগণ, হরিনামের ধ্বনিতে আজ এই মন্দির পূর্ণ হইল। এখানে যে নামের লহরী উঠিল স্বর্গে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল। আবার স্বর্গে যে নামের অমৃত, যে নামের সুধানদী বহিতেছে, এখানেও সেই আনন্দস্রোত দেখা দিল। ভাই, বন্ধু, তোমরা সকলে এই আনন্দরস পান কর। দূরে থাকিয়া কেবল দয়াল নাম শ্রবণ করিলে চলিবে না; কিন্তু ঐ নামসুধারসে ডুবিতে হইবে। নানা মতে এই ব্রহ্মনামধ্বনি উঠিয়াছে, ব্রাহ্মগণ তোমরা এই নামে মত্ত হও। যদি তোমরা কঠিন পাথর না হও, যদি তোমরা জড় না হও, যদি তোমাদিগের অন্তরে কোমল প্রাণ থাকে, তবে এই নামরসে তোমরা অভিষিক্ত হও। যদি তোমাদের মনে শান্তি পাইবার বাসনা

থাকে তবে এই নামে সুখী হও, এই নামসাধনের পথ অবলম্বন কর, দীনবন্ধুর নামসুধা পান কর। এই কলিযুগে আর পুরাতন কঠোর শুষ্ক তপস্যার পন্থা নাই। এখন হরিনামেই জীবের পরিত্রাণ হয়, নামরসে মত্ত হইলেই জীবের সুখ হয়। চারিদিকে ভারি দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, বঙ্গদেশ গেল, ভারতবর্ষ দুঃখের অনলে জ্বলিয়া যায়, এই সময় প্রাণের হরি বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহার নামসুধা প্রেরণ করিয়াছেন। বন্ধুগণ, এই সুধা তোমরা পান কর, এই নাম তোমরা অবহেলা করিও না। ওহে ভাই সকল, গলায় বস্ত্র দিয়া কি তোমাদের পায়ে পড়িব? কিরূপে তোমাদিগের নিকটে মনের ব্যাকুলতা জানাইব জানি না। বড় সুখের সময় আসিয়াছে। জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য হরি বড় আনন্দের ব্যাপার করিতেছেন। তোমরা পড়া শুনা কর, সংসারের কাজ কর্ম্ম কর, ইহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম এবং হরির পদসেবা করিতে হইবে। তোমরা স্ত্রী পুত্র ভাই বন্ধু সকলের সেবা করিবে, কেবল হরিকেই কি তোমাদের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে? তোমরা কি মনে কর হরি একদিন তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এখন দূরে চলিয়া গিয়াছেন? হরির প্রাণ অত্যন্ত কোমল, হরি কখনও তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। হরি জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য যুগে যুগে যাহা করিয়াছেন, তোমাদিগের জন্যও তাহাই করিতেছেন।

বঙ্গবাসিগণ, তোমরা এমনই কি পাথর দিয়া বুক বাঁধিয়াছ যে, তোমরা এমন হরিনামরসে মজিবে না? কিন্তু হরির এমনই লীলা, হউক না কেন তোমাদের পাষাণ হৃদয় তাঁহার নামরসে

তাহা গলিয়া যাইবে। হরি স্বর্গ হইতে এমনই এক আনন্দপাত্র হাতে লইয়া আসিয়াছেন যে, ঐ আনন্দপাত্র হইতে যে এক বিন্দু পান করিতেছে সেই মাতিয়া যাইতেছে। এই যুবকদল খেপিবে। দয়াময় সাক্ষী হইয়া দেখিতেছেন তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার নামরসে মাতিয়া উঠিতেছে। ইহা মিথ্যা নয়, স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়। বঙ্গদেশের কতকগুলি লোক কেন জাগিয়া উঠিল? কে ইহাদিগকে জাগাইলেন? কে ইহাদিগকে মাতাইলেন? সকলই যেন মাতিতেছে। এই বৎসর সহজ বৎসর নয়। এক বৎসরের নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণার পর, হরি আজ উৎসবের দিন আমাদিগকে আরাম দিতে আসিয়াছেন; আজ যে যত পার মনের আনন্দে ব্রহ্মনাম-সুধারস পান কর। বন্ধুগণ, এস আজ হরির বাগানে গিয়া প্রেম-পুষ্প, ভক্তি-পুষ্প, তুলিয়া মালা গাঁথি এবং সেই মালা হরির গলায় এবং পরস্পরের গলায় দিই। এবার হরিকে এমনই করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিব যে, আর কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িব না। হরিকে হারাধন বলিয়া আর কাঁদিব না। বঙ্গদেশ হরিকে পাইয়া আনন্দ করিবে, সুখী হইবে। হরিশূন্য হইয়া আমাদের প্রিয় বঙ্গদেশ কি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণত্যাগ করিবে? শুনিয়া প্রাণ কেমন করিতেছে; আমাদের প্রাণের হরি প্রেমের ভিখারী হইয়া প্রেম বিলাইতে আমাদের দেশে আসিয়াছেন, আমরা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া টানিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিব। ইচ্ছা হয় প্রাণের হরির চরণ জড়াইয়া ধরি।

ও হরি, ভাল হরি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, সুন্দর হরি, আমাদিগের প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ, তুমি আমাদিগকে এত ভালবাস আমরা কি জানি? আমরা জানিতাম

কে একজন ঈশ্বর কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখা যায় না ; কিন্তু হরি, তুমি করিলে কি ? তুমি এই মলিন পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছ, শুদ্ধ তাহা নহে, তুমি আমাদের বাড়ীর বাসন মাজিতেছ, গৃহের সামান্য কার্য্য সকল পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল ? বিশ্বের বিধাতা স্বর্গের দেবতা হইয়া তুমি পাপীর গৃহে দাসত্ব করিতেছ। হরি, কেন ঋণ বাড়াও ? মরণকালে কি বলিব ! ঋণের উপর সুদ বাড়িতেছে। একে পয়সা কড়ি কিছু নাই তার উপরে আবার তোমার এ সকল ঋণ। আমাদের কি হইবে ? অনাথনাথ, তুমি যে রকম প্রেম বিলাইতেছ, ইহাতে দেশশুদ্ধ লোক তোমার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিবে। পাপী তরাইতে তুমি যেমন চতুর এমন আর কেহ নাই। তুমি আমার যুবক ভাইদের সঙ্গে কথা কও। তুমি আমার ভগ্নীদিগের সঙ্গে কথা কও। ও হরি, এই দেশের কত কৃতবিদ্য লোক যে একবারও তোমার নাম করে না। হে হরি, হে দয়াময়, হে আমার বক্ষের ধন, একবার আমার কাছে এস। ও মা, কেবল আমাকে সুখী করিলে হইবে না, সকলকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সকলকে সুখী কর।

সকলে আজ সুখের দৃশ্য দেখ, হরি আজ কত লোককে কাঁদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ কত লোক মাতিল। হরি, তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে। আর তোমাকে যাইতে দিব না। আবার কি কাল সকালে তোমাকে বলিব, হরি যাও, যাও। গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরজ্জু বাঁধিয়া আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তুমি টানিয়া লইবে

সেই দিকে যাইব। যখন তোমার ঘরে পৌঁছিয়াছি তখন নিশ্চয়ই সুখী হইব। করুণাসিন্ধু, তোমার প্রেমলীলার শেষ হয় না। তোমাকে ছাড়িব না। নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন? এই শতাব্দীতে তুমি দুঃখী অবিশ্বাসী নাস্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এত প্রেম লীলা করিবে আমরা জানিতাম না। বলে দাও পিতা, আমরা মরিব না। আজ উৎসবরাত্রে তোমাকে মনের কথা বলিয়া কত আহ্লাদ হইতেছে। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই লাভ। চোর যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকে ততক্ষণ তাহার কত রত্ন লাভ হয়। বৎসরের মধ্যে এই এক উৎসবরাত্রে তোমার সঙ্গে বাস কি সামান্য লাভ? যাঁহারা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও হরি, তুমি বলিতেছ;—"তোরা কেন এই মাঘোৎসব দেখ্‌তে এলি? আয়, প্রাণের সন্তানগুলি, তোদের আজ প্রেমসুধা পান করাইয়া মাতাইব।" পিতা, একবার কাছে দাঁড়াও, চিরসুহৃদ, আমার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, আমার নয়নের তারা, আমার গলার হার, আমার হীরকখণ্ড, আমার চিরকালের ধন, আমার আর কেহ নাই, আমার কেবল তুমি আছ, আমি আর কার কাছে কাঁদিব? তোমাকে দেখিয়া আমার মুখ কেমন উজ্জ্বল হইল। ছিলাম আমি অত্যন্ত কদাকার কাল, তোমার জ্যোতিতে সুন্দর হইলাম। পিতা, সমক্ষে দাঁড়াও, সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে পড়ি।

শান্তিকুটীর।

পতিভক্তি।

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

শাস্ত্রে অতি উৎকৃষ্ট কথা সকল লেখা আছে, কিন্তু যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না, সে সকল কথা মনুষ্যের মনকে শীঘ্র ভাল করিতে পারে না। কেন না পুস্তকের কথা মৃত কথা তাহার প্রাণ নাই। পুস্তকের কথা জীবন্ত কথা নহে, পুস্তকের উপদেশ সজীব উপদেশ নহে। মনে কর এই চমৎকার কথাটা পুস্তকে লেখা আছে,—"যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥" ৯, ৪, ৬৫—৬৬॥ "যাহারা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় প্রাণ বিত্ত ইহকাল পরকাল ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকিব? সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করে।" শাস্ত্রে এই কথা পড়িয়া তোমরা ইহাকে ভাল বলিলে, কিন্তু তোমরা এই কথাকে কি ঈশ্বরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে? "সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে

বশীভূত করে।" কে এই কথা বলিলেন? ইহা শাস্ত্রকার-লিখিত কথা না ঈশ্বর-মুখ-নির্গত কথা? শাস্ত্রলেখক এবং ঈশ্বর এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। যদি ঈশ্বর মানুষের মত হইয়া কিম্বা কোন সাকার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগের হাত ধরিয়া বলিতেন,—"দেখ যাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।" তাহা হইলে তোমরা বিস্ময়াপন্ন এবং মোহিত হইয়া তোমাদিগের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিতে। তোমরা চমৎকৃত হইয়া বলিতে, কি! ঈশ্বর—যিনি এত বড় লোক, যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, তিনি সামান্য মনুষ্যকে এত আদর করেন? তিনি কি না নিজ মুখে বলেন, স্বাধ্বী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্ত সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে? ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, ওরে আমার ভক্তকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। যদি তোমরা স্বকর্ণে পিতার মুখে এই কথা শুনিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা মোহিত হইতে। স্বর্গের রাজা যাঁহার কোন অভাব নাই, মহাসাগর যাহার শ্রীচরণ ধৌত করিতেছে, যিনি আকাশে কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য এবং রাশি রাশি হীরকখণ্ডের ন্যায় নক্ষত্র সকল ছড়াইয়াছেন, যিনি এত বড় রাজা তিনি একজন সামান্য অনুরাগী ভক্তকে বলিলেন,—ওহে পর্ণকুটীরবাসী ভক্ত, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। আমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে ডাকিয়াছ তাহাতে আমি তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি, তোমার ঘর ছাড়িয়া আমি আর কোথাও যাইতে পারিব না। ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইয়া একটী সামান্য ক্ষুদ্র ভক্তকে এমন কথা বলিলেন।

ভক্তরাজ্যে এই কথার বহুমূল্য, বিশেষতঃ নারীজাতির মধ্যে এই কথার বড় আদর। পতিব্রতা স্ত্রী এই কথার আদর জানেন। ঈশ্বর বলিলেন পতিব্রতা সতী যেমন আপনার সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ আমার ভক্ত আমাকে বশীভূত করে। ভক্ত হইলেন স্ত্রীর ন্যায়, ঈশ্বর হইলেন স্বামীর মত। স্ত্রীর কথায়, ভক্তের কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হইলেন, ভক্তের কাছে তিনি আড়ষ্ট হইলেন। স্বামী যেমন স্ত্রীর কোমল ব্যবহারে বশীভূত হন, রাজাধিরাজ ঈশ্বর সেইরূপ ভক্তের ভাবে বশীভূত হন। সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্ত সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে; ঈশ্বর এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন কেন? তিনি ত বলিতে পারিতেন, যে আমাকে ভক্তি করে, আমি তাহার বশীভূত হই। তিনি এ দৃষ্টান্ত দিলেন কেন? এইজন্য দৃষ্টান্ত দিলেন যে সাধ্বী স্ত্রী এবং সাধু স্বামী উভয়েই তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিবে। তিনি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে তাঁহার কাছে ডাকিলেন, স্ত্রীকে বলিলেন,—"স্বাধ্বী স্ত্রী, তুমি যেমন স্বামীকে বশীভূত কর, আমার ভক্তও তোমার ন্যায় আমাকে বশীভূত করে। তিনি স্বামীকে বলিলেন, তুমি যেমন স্বাধ্বী স্ত্রী দ্বারা বশীভূত হও, আমিও তোমার ন্যায়, আমার ভক্ত দ্বারা বশীভূত হই। স্বামী স্ত্রী, তোমরা যেমন উভয়ে এক প্রাণ এবং অভিন্নহৃদয়, আমি এবং আমার ভক্তও তেমনই অভিন্ন। আমি আমার ভক্তের চিত্তরঞ্জন। আমার ভক্ত ব্যাকুল অন্তরে আমার নিকট কাঁদিলে আমার প্রেম উথলিয়া পড়ে। দেখ আমি সমস্ত আকাশ ঘুরিয়া বেড়াই, কোথাও আমার অগম্য স্থান নাই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার জমিদারী; কিন্তু আমার ভক্ত আমাকে

প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এত বড় যে আমি আমার ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা হারাইতে হইল।”

যখন স্বামী স্ত্রী ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুনিল, তখন তাহারা ভাবিল, ঈশ্বর যখন এইরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন, তখন আমাদের দুজনেরই প্রাণ তাঁহাকে উৎসর্গ করা উচিত। আমাদের চির-কালের বন্ধু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বর আমাদিগের ঘরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর আর আমাদের ঘর ছাড়িতে পারেন না। স্ত্রী সংসারের সামান্য কার্য্য রন্ধনাদি করিতে যান, সেখানেও ভক্তাধীন হরি সেই স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যান। তিনি ভক্তের কাছে বসিয়াই আছেন। প্রভু পরমেশ্বর সর্ব্বদাই ভক্তের সঙ্গে ভক্তি-রজ্জুতে বাঁধা রহিয়াছেন। ভক্ত বলিল, “মহাপ্রভু, কই আজ তুমি যাও না,” ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন, “আর কি তুমি যাইতে দাও?” ভক্ত আবার বলিলেন, “প্রভু এত বেলা হইল, এখনও তুমি আমার কাছে বসিয়া আছ?” ঈশ্বর বলিলেন,—“ভক্ত, তোমার ঘর যে আমার বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। এ ঘর ভিন্ন আমি আর কোথায় যাইব, তোমার ঘরে চিরকালের জন্য বন্দী হইয়াছি।” নিশীথ সময়ে ভক্ত জাগিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া বলিলেন; “প্রভু, সকলেই এখন নিদ্রায় অচেতন, তুমি কেন এখনও প্রহরী হইয়া রহিয়াছ?” ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন, “ভক্তের ঘরে দিনেতেও আমি, রজনীতেও আমি, যখন একবার আমি এই গৃহ অধিকার করিয়াছি, আর আমি ইহা ছাড়িতে পারি না।” ভক্তবৎসলের ক্ষমতা নাই যে, ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া যান, সে গৃহ হইতে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর বলেন, “যে ভক্ত আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, আমি কি

তাঁহার জন্য এইটুকু করিব না যে, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ করিব?" ঈশ্বর নিজে বলিয়াছেন, "পতিব্রতা নারী যেমন তাহার সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্তও সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে।" পৃথিবীর পণ্ডিতেরা আর কি শিখাইবে?

ব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা ঈশ্বরের ব্যবহৃত এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিবে। যখনই তোমরা এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবে, তখনই যেন তোমাদের মনে হয়, তোমাদিগের আসল পতি পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর। যিনি সকলের পতি, পরম পতি, চিরকালের পতি, যিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, একটু ভক্তি দিলেই যদি সেই পতির পতি জগৎপতি ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বশীভূত করিতে পার, তবে আর নীচ সাংসারিকতা ছাড়িবে না কেন? ঈশ্বর যখন নিজে স্পষ্টরূপে তাঁহাকে বশীভূত করিবার এই মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন, আমরা যেন ইহা অবহেলা না করি। তিনি আমাদের কাছে বশীভূত হইয়া থাকিবেন! সংসারে আমাদের আর কোন বন্ধু থাকিবে না, কেবল সেই পরম বন্ধু চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। প্রভুর চরণে আমাদের মতি ভক্তি বৃদ্ধি হউক! ব্রাহ্মিকামণ্ডলীর নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ঈশ্বরের ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দয়াময় ঈশ্বর, তোমরা একটু তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তিনি সহজে ধরা দিবেন। কোমল হৃদয় ব্রাহ্মিকা, তুমি কদাচ ভক্তির এই সহজ পথ পরিত্যাগ করিও না। ভক্তিশৃঙ্খলে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ করিয়া চিরকৃতার্থ হও এবং পরিবারের কল্যাণ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ।

হরিদাস ও কড়িদাস।

অপরাহ্ণ, সোমবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। একজনের নাম হরিদাস, অন্যের নাম কড়িদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। একদিন কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নটী এই,—তিনি যেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও? কড়িদাস বলিলেন,—ঠাকুর আমাকে নানাবিধ সম্পদ ঐশ্বর্য্য দাও, অনেক ভৃত্য দাও। ভগবান কড়িদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, তুমি পাইবে। কড়িদাস বুঝিলেন, ভগবান তাঁহার সহায় হইয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ থাকিবে না। কড়িদাসের অনেক ধন ঐশ্বর্য্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক আসিল, কিন্তু তার পর শুন কি হইল! কড়িদাস বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া হাজার পাঁচ ছয় টাকা অর্জ্জন করিলেন। সেই টাকাগুলো বাক্সে রাখিয়া কড়িদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দেখেন, সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া গিয়াছে, কেবল

একটী মাত্র কড়ি রহিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, কেবল ধন কড়ি উপার্জ্জন করিলে হইবে না; কিন্তু ধন রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে। পরে তিনি যেমন অর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া কাপড় এবং সাল প্রভৃতি কিনিলেন; কিন্তু গাড়ী রাখিয়াও অনেক সময় তাঁহাকে হাঁটিতে হইল, সালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ করিলেন, কতকগুলি সন্তান হইল, সন্তানগুলি দুষ্ট হইল, কেহ মদ্যপায়ী, কেহ ব্যাভিচারী হইল। তিনি দেখিলেন, সন্তান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল ছিল। অনেক টাকা খরচ করিয়া বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না, তিনি মনে করিলেন, এইরূপ বাড়ী না হওয়া ভাল ছিল। অনেক চাকর চাকরাণী রাখিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে নিজ হস্তে অনেক কার্য্য করিতে হইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। তিনি অনেক অর্জ্জন করেন, কিন্তু যখনই বাক্স খুলিয়া দেখেন, তখনই কেবল একটী কড়ি দেখিতে পান। ভগবানের আরাধনা করিয়া তিনি কড়ির উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার অদৃষ্টে কেবল কড়ি লেখা। এত বড় ধনী যিনি, তিনি গরিব দুঃখী। নিজের বিদ্যা বুদ্ধিতে কিছুতেই সুখ পান না, আপনার চাকরদিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। খুব বড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই সম্ভ্রম করিত, কিন্তু তিনি মনে করিতেন, ইহারা আমাকে উপহাস করিতেছে। কড়িদাস মনে করিতেন, তাঁহার মত দুঃখী আর কেহ নাই। তাঁহার মুখে হাসি নাই, মুখ জিহ্বা বিকৃত, পোলাও খাইলেও তাঁহার সুখ হয় না।

সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধনা করিলেন।

তিনি দেখিলেন, ভগবান আশুতোষ তাঁহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বর চাও? হরিদাস বলিলেন, আমি কেবল হরিকে চাই, আর কিছুই চাহি না। প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে। তিনি বারম্বার ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি একবার মনে মনে ভাবিলেন, আমি ত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু আমার সংসার চলিবে কিরূপে? তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু সেই শাকান্ন ভোজন করিয়া তিনি এত হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দাদা কড়িদাস পোলাও খাইয়াও সে সুখ কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর বাকর নাই, নিজেই বাসন মাজিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ঘরখানি ভাঙ্গা, কিন্তু তাহার ভিতরে চাঁদের আলোক আসিত। চাঁদের আলো দেখিয়া তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাঁহার কাছে কেহই আসে না; কিন্তু তিনি মনের আনন্দে মনে করেন, সকলেই ত আমার। পাড়ার লোক সকলে দেখিবা মাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়িদাসের কেহ নামও করে না। হরিদাস গাছ তলায় থাকেন, আকাশের তারা দেখিয়া বলেন, ভগবান আমার জন্য প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার একখানি কাপড় চুরি হইল, তাঁহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল, দুইখানি কাপড় ত চুরি করিল না। কতকগুলি লোক তাঁহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া আহ্লাদ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অপমান ত হইল না। হরিদাস গরিব, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন।

বাস্তবিক পাগলামি নহে, ভক্তির উন্মত্ততা। হরিদাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী, ধর্ম্মে যোগ দিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন করেন। হরিদাস বলিলেন, আমার টাকা কড়ি নাই, কিন্তু আমার অনেক ধন রত্ন আছে। আমার চারিটী সন্তান, হীরা, মাণিক, মণি, মুক্তা। কড়িদাসের কি হইল? কড়িও পাইল না, হরিকেও পাইল না। হরিদাসের দুই হইল।

সাধন-কানন।

প্রকৃতির ঈশ্বর।

প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

তরু যদি আমাদের বন্ধু হয়, তবে আমরা তরুর ঈশ্বরকে দেখিতে পাই। পাখী যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়, তবে আমাদের মন বুল্‌বুল্ ডাকে, এবং পিতার নাম গান করে। গোলাপ ফুলের বড় লজ্জা দেখিতেছি, ঘোম্‌টার ভিতরে মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ঈষৎ হাস্যে ভক্তের প্রতি তাকাইতেছে। গোলাপ লজ্জাবতী নারী, উহার অতি কোমল লাবণ্য, যদি উনি প্রসন্ন হন, তবে উনি যে পিতার দাসী, উনি যে পিতার কন্যা, উহাঁকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারি। বায়ু যদি অনুকূল হয়, তবে পিতার প্রেম-সমীরণ সেবন করিতে পারি। জল যদি সহায় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই

প্রেমের জলধি পিতাকে দেখিতে পাই। আমার বাড়ী এখানে নহে, আমার বাড়ী প্রকৃতির রাজ্যে। প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিলে, প্রকৃতি সহায় হইলেই, মনের মানুষ অন্তরাত্মাকে দেখিয়া সুখী হয়। পৃথিবীর লোক হইলে সভ্যতাকে আমি বন্ধু বলিতাম। প্রকৃত সরল মানুষ প্রকৃতিকে ভালবাসে, সভ্যতার কৃত্রিম আড়ম্বরে তাহার সুখ হয় না। নিস্তব্ধ স্থানে তাহার লোকালয়, গাছের উপর পাখীদের সঙ্গে তাহার খেলা। নানা জাতীয় পুষ্প একত্র করিয়া সে তাহাদের কাছে স্বর্গের লজ্জা, বিনয়, লাবণ্য শিক্ষা করে। সহরের ঐ দিকে সাধন-কানন। সেখানে প্রকৃতি হাসে, পাখী গান করে, সেখানকার গাছগুলি নারদমুনি। তাহারা বীণা হাতে করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম গান করে। প্রকৃতির মধ্যে যদি আমরা পাঁচ মিনিট থাকি, আমাদের মনের সমস্ত বিকার ঘুচিয়া গিয়া শরীর মন প্রকৃতিস্থ হয়। পাখীকে যদি গুরু করিতে পারি, তবেই ত বৈরাগ্য শিখিতে পারিব। পাখী কোন্ দেশ হইতে আসে তাহা যদি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে এখনই পাখী আমার আত্মাকে তাহার পক্ষের উপর বহন করিয়া উড়িতে উড়িতে পিতার শান্তি নিকেতনে লইয়া যায়। আহা! পাখী কেমন শীঘ্র উড়ে। আর পাখী সকলের উপর দিয়া চলে। আমার পাখী-বন্ধু এই দেশে আসে না। পাখী ব্রহ্মরাজ্যে উড়ে। পাখী বৈরাগী, পাখী বড় যোগী, পাখী নির্লিপ্ত হইয়া পৃথিবীর উপরে থাকে।

গাছ বল, পাখী বল, ফুল বল, জল বল, বায়ু বল প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই সেই রাজ্যের ব্যাপার। তাঁহারা সকলেই সাধকদিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সেখান হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সহায় হইবেন না কেন? গোলমালের

লোক সেখানে যায় না। সেখানে কেহই মান সম্ভ্রম চাহে না। পাথর পড়েই আছে, তাহার দুঃখ অপমান নাই। পাথর, তুমি লোক ভাল। জল, তুমিও ভাল, তোমার স্বার্থ নাই, তোমার নিজের কখনও তৃষ্ণা হয় না, কিন্তু তুমি সকলের তৃষ্ণা নিবারণ কর, দুঃখী ধনী যে কেহ তোমার কাছে আসে, কাহারও কলস অগ্রাহ্য কর না। সরোবর, সকলকে জল দিলে তুমি শুকিয়ে যাবে, এটী তুমি ভাব না; কিন্তু যতক্ষণ তোমার ভিতরে আধ কলসী জলও থাকে, ততক্ষণ তুমি দিবেই। বায়ু, তুমি এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাক না কেন? তুমি একটী বাড়ী কর না কেন? তোমার আপনার থাকিবার একটু স্থান নাই, তুমি সকল স্থানে গিয়া সকলের সেবা করিতেছ। তোমরা যে রাজ্যের লোক সেই রাজ্যের সকলই ভাল। তোমরা অতি দুর্ল্লভ বস্তু। তোমরা পৃথিবীতে থাক না, তোমরা স্বর্গে থাক। ফলতঃ আসল জিনিসগুলি ভক্তদের কাছে, পৃথিবীতে নাই। যাঁহাদিগকে দেখিলে স্বর্গরাজ্য মনে পড়ে, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে থাকেন। তরু, লতা, জল বায়ু, আলোক ইহাঁরা সকলেই সাক্ষ্য দিতেছেন, সকলেই বলিতেছেন এই কথা ঠিক। মধুর প্রকৃতির হাতে যে আপনার মনকে ফেলে দিবে, সে ঠিক হইবে। যে বিকৃত সংসারের পদতলে আপনার প্রাণ ঢেলে দিবে সে মরিবে। অতএব বন্ধুগণ, প্রকৃতির বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফুল তোমাদের বন্ধু হউক! প্রকৃতির রাজ্য নির্দ্দোষ পবিত্র রাজ্য, ঐ রাজ্যের যাহা কিছু স্পর্শ কর, তাহাতে শরীর মন পবিত্র হয়। কেহ কোথাও নাই, কেবল জল, নবীন ঘাস। এ সকল সাধুসঙ্গে নিশ্চয় সাধুতার সঞ্চার হয়। এ সকল সাধুদের সঙ্গে থাকিলে মনের বিকৃতি দুর হয় এবং প্রকৃতির

জয় হয়। জয় প্রকৃতির জয়, জয় তরুর জয়, জয় তৃণের জয়। তোমরা এখন বন্ধু বান্ধব হইয়া জীবের পরিত্রাণের সহায় হও।

হে সুন্দর প্রকৃতিদেশের সুন্দর রাজা, তোমার প্রকৃতির মধ্যে রাখিয়া তুমি আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর, শুদ্ধ কর। প্রকৃতির তৃণ বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য পথে পথে পড়িয়া আছে, কেবা দেখে? কেবা সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে? মানুষ দৈত্যের মত তৃণ মাড়াইতেছে। জগদীশ্বর বসে আছেন যে প্রকৃতির মধ্যে, দুরন্ত মানুষ সেই প্রকৃতিকে ধরে মারে। এমন বন্ধু তৃণ, ইহাকে কে না অগ্রাহ্য করে? বদ লোক, দুষ্ট লোক পৃথিবীর, তাহারা প্রকৃতির মর্য্যাদা জানে না, তাহাতেই তাহাদের এত দুর্গতি হয়। পিতা, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মনটা মলিন হইলে তৃণের পায়ে পড়ে শুদ্ধ হইতে পারি। তোমার সেই প্রাচীন কত সহস্র বৎসরের সাধন কাননে বসিয়া তোমাকে ডাকিতেছি। যতদিন তোমার প্রকৃতির শুদ্ধতা থাকিবে, ততদিন মানুষের খোসামোদে কাজ নাই, ততদিন তৃণ ভবসাগর পার করিবে। জীবন্ত ঈশ্বরের বাসস্থান প্রকৃতি। দীনবন্ধু, সমস্ত শরীর মনে প্রকৃতির বায়ু লাগাও, সরল বৈরাগী হই। অনেক সাধু বৈরাগী আছেন এই প্রকৃতির ভিতরে। সমস্ত হিন্দুস্থানে এবং পৃথিবীতে এত যোগী পাওয়া যায় না। কলিকাতা থেকে কয়জন লোক এল না এল প্রকৃতি খবর নেন না। যাহাদের মতি আছে, তাহারা আসিবেই। হে শ্রীহরি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রকৃতির পর্ণকুটীরে বসিয়া থাকিয়া সরল হইয়া, ভক্ত হইয়া কৃতার্থ হই। হে পিতা, তোমার সন্তানগণ, তোমার প্রাচীন সাধন-কাননে ভিক্ষা করিতেছে যেন এমন নির্দ্দোষ, সরল সুন্দর প্রকৃতিকে প্রাণের

বন্ধু বলিয়া সেই তোমার নির্জন, লুকায়িত কাননের মধ্যে যোগ ভক্তি শিখিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? অত প্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটী তৃণ রাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আর যদি এই অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষগুলি সোণা দিয়া মোড়া হতো, ইহাদিগকে কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুলো জরির সাটিনের জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তান্পুরা হাতে নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোকগুলি তাহাদিগকে ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে সাল, আর যার সাল আছে তাহাকে সাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু যে পাখী কত গান করে, তাহাকে কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাঁক কর্‌ছে। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রহ্মের হাতের। আমি যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্য্যাদা হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ হত্যার দোষে দোষী হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ব্রহ্ম বাস করেন যে সকল বস্তুতে, তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাঁহারা কেমন করিয়া মার পূজা করিতে হয় শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক

বৈরাগ্য মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দিই, আর বিকৃত স্থানে দুর্গন্ধে যেন মলিন না হই। বীজ মন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে ইন্দ্রিয়দোষ থাকে না, বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষ, লতা, পুষ্পগুলি যোগী ঋষি হইয়া আমাদের মন ভুলাইতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে যে বেঁচে যাবে যাক্, এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে সে পাক্! মা জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতি-গঙ্গায় আমাদিগকে স্নান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসার-পরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও। *

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভগবান এবং ভক্তদল। *

রবিবার, ২১শে মাঘ, ১৮০০ শক; ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আমরা যদি কেবল ঘনীভূত স্বতন্ত্র ব্রহ্মকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের পরিত্রাণ হয় না। বিস্তৃত অস্বতন্ত্র ব্রহ্মকে গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মের এই দুই ভাব ভাবগ্রাহী-ব্যক্তির

* ভুলক্রমে ১৫৪ পৃষ্ঠার হেডিংএ ঊনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব দেওয়া হয় নাই। ১৫৪ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৯ই মাঘ হইতে ১৬ই মাঘ পর্য্যন্ত উপদেশগুলি ঊনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের উপদেশ। গঃ—

বুঝা আবশ্যক। সকলেই মনে করেন ব্রহ্মের স্বভাব একই। কেবল নির্লিপ্ত ব্রহ্মকে ধ্যান করিলেই আমরা স্বর্গারোহণ করিতে পারি, অনেকের এইরূপ সংস্কার; কিন্তু তাহা নহে। দুই ভাবেই ব্রহ্মকে ধারণ করা আবশ্যক। এক ভাবে ব্রহ্ম সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং নির্লিপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। যিনি পূর্ণব্রহ্ম, জগতের পিতা, পাতা, পরিত্রাতা; তিনি একাকী স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করিতেছেন। যোগী ধ্যান যোগে ব্রহ্মের এই নির্লিপ্ত ভাব সাধন করেন। যোগেতে যোগেশ্বর এইরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু ব্রহ্মের আর একটী ভাব আছে, তিনি অস্বতন্ত্র ও বিস্তৃত ভাবে ভক্তদিগের মধ্যে রহিয়াছেন। ব্রহ্মকে কেবল নির্লিপ্ত এবং অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিলে জীবের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। ভক্ত ছাড়া ভক্তবৎসলকে আমরা যোগের সময় ধ্যান করি বটে; কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। প্রকাণ্ড সূর্য্য এক দিকে স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছে, আবার সেই সূর্য্য প্রতি বস্তুতে প্রতিভাত দেখা যায়। সূর্য্য একই, কিন্তু বিচিত্র বস্তুতে ইহার কিরণ নানারূপে বিকীর্ণ হয়। বস্তু ছাড়িয়া সূর্য্যকে দেখা যায় আবার বস্তুতেও সূর্য্যকে দেখা যায়। সেইরূপ পুরাতন সনাতন ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র ভাবে স্থিতি করিতে দেখা যায়। আবার ভক্তদিগের মধ্যে তাঁহার কেমন মনোহর কান্তি! জীবের পক্ষে হরির এই দুই ভাবই দেখা আবশ্যক। যেমন ধ্যান যোগে নির্লিপ্ত একাকী ব্রহ্মকে দেখিব, সেইরূপ ভক্তি ভাবে তাঁহাকে ভক্তবৃন্দের মধ্যে দেখিব।

ভক্ত দুই শ্রেণীভুক্ত। এক প্রেরিত ভক্ত সকল—যাঁহারা এখন পরলোকে বাস করিতেছেন, দ্বিতীয় জীবিত ভক্তগণ—যাঁহারা

আমাদের সঙ্গে আছেন। এই দুই শ্রেণীর একটীও পরিহার্য্য নহে। হরির উদ্যানের মধ্যে ভক্তেরা উৎকৃষ্ট পুষ্প স্বরূপ, প্রত্যেকটী আদরের বস্তু। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলের জন্য আপনার কতকগুলি স্বর্গীয় ভাব দিয়া সাধু ভক্তদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর ভক্তশ্রেণীর মধ্যে ঘনতররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখা যায়। ঈশ্বর তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মনুষ্যের আকারে প্রেরণ করেন। কে বলে মনুষ্যের জীবনে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, এই সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কি ঈশ্বরের প্রকাশ নাই? পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যেমন পৃথিবীতে ভক্তদল আসিয়াছিলেন, ঈশ্বর দয়া করিয়া বর্ত্তমান কালেও আমাদিগের নিকট ভক্তদল প্রেরণ করিয়াছেন। এই কতকগুলি রত্ন রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড দল ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশের স্থল। আমাদিগের নিকট ঈশ্বরের প্রেম, পুণ্য, শান্তি প্রকাশ করিবার জন্য এই দল প্রেরিত। যদি এই দল না থাকিত আমরা ঈশ্বরকে তত ভালবাসিতে পারিতাম না। এই বর্ত্তমান সময়ে ঈশ্বর দলের আকার ধরিয়া, আমাদিগের বন্ধু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। যাহারা ব্রাহ্মদলকে ঘৃণা করে, তাহারা ভক্তবৎসলকে আদর করিতে পারে না। ব্রহ্ম এই পৃথিবীতে ভক্তসমাজের জীবনরূপে প্রকাশিত হন। দল ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ হয় না, এইজন্য ঈশ্বর যুগে যুগে দলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মোৎসাহের অগ্নি দলের ভিতর প্রথম প্রজ্বলিত হয়। সকলকে অমৃত পান করাইবার পূর্ব্বে একটী দলকে অমৃত পান করাইয়া বিহ্বল করিতে হয়। দলের ভিতরে ধর্ম্ম দৃঢ়তররূপে বদ্ধ না হইলে, পৃথিবীতে সেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়

না। ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, একটী দল, একটী সমাজ প্রস্তুত করেন। সেই দলরূপ-প্রণালীর ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেম, পুণ্য, শান্তি জগতের নর নারীদিগের নিকট প্রবাহিত হয়।

স্বর্গ হইতে ঈশ্বর আপনার ভাল ভাল সমগ্রীগুলি আনিয়া দলের মধ্যে রক্ষা করেন। দলটী ঈশ্বরের ভাবের আধার, প্রেমের আধার, পুণ্যের আধার, শান্তির আধার। সেই আধার হইতে পৃথিবীর পক্ষে ধর্ম্ম, পুণ্য, প্রেম শান্তি তুলিয়া লওয়া সহজ। সেই দলস্থ লোকগুলির পরস্পরের প্রতি ধর্ম্মযোগ দেখিয়া পৃথিবী মুক্তি লাভ করে। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিবেন, তেমনই পরলোকবাসী ভক্তদিগকে স্কন্ধের উপর এবং বর্ত্তমান ভক্তমণ্ডলীকে বক্ষের উপর রাখিবেন। এই তিনটী গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসাধন পূর্ণ হয়। উপাসনার সময় আমরা এই তিনটীকে একত্র করিব। ঈশ্বর বর্ত্তমান সময়কে অন্ধকার করিয়া রাখেন নাই। এখনও ঈশ্বর এই দেশে এমন শত শত ভক্ত চারিদিকে রাখিয়াছেন, যাঁহাদের সঙ্গে হরিনাম করিলে নিশ্চয়ই আমাদের পরিত্রাণ হয়। ভক্তকে দেখিলে যে ভাল না বাসে, তাহার হৃদয়ে কি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম স্থান পাইয়াছে? ভক্তদল একটী যন্ত্র স্বরূপ। এই দল ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই দলের নিকট প্রচুর শক্তি, আশা, সাহস লাভ করা যায়। যখনই নির্জীব হইয়া পড়ি, তখনই এই দল হইতে বল এবং জীবন লাভ করি। ভক্তদলাশ্রিত না হইলে আমরা সম্পূর্ণ সাধন ভজন কিরূপে করিব? দলের মধ্যে না থাকিলে কিরূপে হরিভক্তি চরিতার্থ করিব?

যিনি যথার্থ সহৃদয়, ভক্ত ব্যক্তি, তিনি কতকগুলি প্রকৃত ভক্তকে কাছে রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট হরিনাম শুনিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে হরিনাম শুনাইতেছেন। এইরূপ মন্ত্র না থাকিলে, হরিভক্তের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। যাঁহার বক্ষঃস্থলে দলের চিহ্ন দেখিতে পাই, তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া নমস্কার করিব। এক দিকে যেমন ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া, দেখিব অন্তরের পূজা তাঁহার দিকে যাইতেছে, তেমনই ঈশ্বর যে বিস্তৃত ভাবে জগতে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও দেখিব। যেমন ভিতরে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার নির্জন ঈশ্বরকে দেখিব, তেমনই বাহিরে জগতের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ মহাসাগর-রূপ-স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে দেখিব। ধ্যান-যোগে স্বতন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরেতে যেমন মগ্ন হইব, তেমনই আবার সেই ব্রহ্ম সাধু সজ্জন-সমাজে কেমন লীলা করিতেছেন তাহাও দেখিয়া সুখী হইব। ঈশ্বর-প্রেরিত সাধু সজ্জনদিগের সেবা করিব। যত জীবিত ভক্ত দেখিতেছি তাঁহারা আমাদের বিরোধী হউন, অথবা আমাদের মতাবলম্বী হউন, যদি তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হন তাঁহাদিগকে সমাদর করিব। তাঁহা-দিগকে একটী দল নাম দিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিব। ভক্তদলকে চিরকাল বক্ষের মধ্যে রাখিব। প্রাণান্তেও ভক্তদল ছাড়িব না। ভক্তদল-ভ্রষ্ট-ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট। তাহার অন্তরে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি নাই। একবার যে বক্ষঃস্থলে দলকে রাখিবে, সে চিরকাল অনন্ত-কালের জন্য তাহা বক্ষে রাখিবে। দলেতে ঈশ্বর আছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে। ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বসিয়া আছেন ইহা যাঁহারা দলবদ্ধ হন নাই, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব দলবদ্ধ হইয়া ভক্তি-নয়নে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ব্রহ্মপ্রেমের লীলা দর্শন

কর। হরিকে যোগেতে দেখ, হরিকে প্রাচীন পরলোকগত সাধু-দিগের মধ্যে এবং বর্ত্তমান ভক্তদলের মধ্যে দেখ। এক হরিকে ত্রিবিধ ভাবে দেখ। এই ত্রিবিধ প্রেমানন্দে ভক্তগণ আনন্দিত হউন।

উত্তরদাতা জাগ্রত ঈশ্বর। *

রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যতই আমাদের দিন যাইতেছে, ততই আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতেছি ঈশ্বরের কৃপা-বায়ু ভিন্ন সংসারের বিপদ প্রলোভনের মধ্যে মনকে সাধু রাখিতে পারা যায় না। যখন ঈশ্বরের কৃপা-সমীরণ সেবন করি, যখন হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করি, তখন যথেষ্ট আলোক প্রকাশিত হয়। আবার যখন জাগ্রত ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারি না, তখন ভিতরে বাহিরে ঘন অন্ধকার হয়। নাস্তিকতা অনেক প্রকার। যদিও আমাদের রসনা "ঈশ্বর নাই" এই কথা বলিতে সাহস করিতে পারে না, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে নাস্তিকতা থাকিতে পারে। ব্রাহ্ম-অভিধানে নাস্তিকতার অর্থ কি দেখা উচিত। কে আস্তিক? কে নাস্তিক? ভালরূপে এ সকল প্রশ্ন আলোচনা করা উচিত। কেবল মুখ যদি বলে ঈশ্বর আছেন, তাহাতে আস্তিকতা হয় না, অথবা মুখ যদি বলে ঈশ্বর নাই, কেবল তাহাতেও নাস্তিকতা হয় না। মনের ভিতরে কোন গূঢ় আকারে নাস্তিকতা আছে কি না, জীবন দেখ, মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তুমি মুখে বলিতেছ ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যদি তুমি হৃদয়ের মধ্যে মনে কর যে, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ হইবে,

তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে গূঢ়ভাবে নাস্তিকতা রহিয়াছে। অথবা যদি আমরা মনে করি, আমাদের কোন ক্রিয়াতে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন হইয়া থাকেন, তাহাও নাস্তিকতা হইল। যে বস্তু দেখে না, শুনে না, কথা কহে না, নড়ে না, সেই বস্তুকে আমরা পুতুল বলি। যাহারা এই প্রকার বস্তুর পূজা করে তাহাদিগকে আমরা পৌত্তলিক বলি। আমাদের ব্রহ্মকেও যদি আমরা এইরূপ বস্তু মনে করি, অর্থাৎ এমন পদার্থ যাহা দেখে না, শুনে না, কথা কহে না, নড়ে না, এবং নিষ্ক্রিয়, তবে আমরাও পৌত্তলিক হইলাম। ব্রাহ্ম এবং পৌত্তলিক, দুইয়েরই হস্তে কেমন বিভিন্ন বর্ণের পুতুল। কিন্তু আমাদিগকে পুতুল ফেলিয়া সত্য গ্রহণ করিতে হইবে।

নির্জীব নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর নহেন। আমরা যে ঈশ্বরের পূজা করি তিনি দেখেন, তিনি দেখা দেন, তিনি কথা শুনেন, কথা কহেন, এবং তিনি নিত্য কার্য্য করেন, তিনি পর্ব্বত সকল চূর্ণ করেন, তিনি মহাসাগর সকল আন্দোলিত করেন। আমরা যে বলিতেছি ঈশ্বর আছেন, ইহা কি ভাবে বলি? ঈশ্বর আছেন বলিলেই কি যথার্থ ঈশ্বর আছেন বলা হইল? যথার্থ ঈশ্বর যিনি তিনি আছেন বলিলেই যথার্থ ঈশ্বর আছেন বলা হয়, এবং যথার্থ আস্তিকতা হয়। সেই সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করিলেই প্রকৃতরূপে আস্তিক হওয়া যায়। সেই সত্য ঈশ্বরকে না মানিয়া তুমি যদি বল ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলে প্রকারান্তরে তুমি বলিলে সত্য ঈশ্বর নাই। মিথ্যা, কৃত্রিম ঈশ্বর আছেন বলিলে আস্তিকতা হয় না। তাহাতে প্রকৃত অকৃত্রিম পিতাকে স্বীকার করা হয় না, তোমার নিজের প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছানুসারে তুমি এমন একটা দেবতা রচনা করিলে, তোমার জীবনের সঙ্গে

যাহার সম্পর্ক নাই, যিনি কোন দূরবর্ত্তী স্বর্গে বাস করেন, এবং অনেক কাতরভাবে ডাকিলে কেবল উপাসনার সময় তোমার নিকট আসেন। এইরূপ ঈশ্বর মানা আস্তিকতা নহে। ইহা এক প্রকার নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা হইতে আস্তিকতা পর্য্যন্ত যে পথ আছে, সেই পথে চলিলে দেখিবে অনেক পথ চলিতে হইবে। যিনি কখনও কথা কহেন না, তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন। যিনি বৎসরের মধ্যে একদিন কথা কহেন, তিনি ক্ষুদ্র দেবতা, যিনি সহস্র বৎসরে একটী বজ্রধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কম্পিত করেন, তিনি ক্ষুদ্রতর দেবতা, কিন্তু যিনি নিত্য কথা কহেন তিনিই যথার্থ ঈশ্বর। যিনি সর্ব্বদা কথা কহেন তিনি যথার্থ জাগ্রত দেবতা, ব্রাহ্মের হরি।

ব্রাহ্ম, তুমি কল্পনার নিদ্রিত হরিকে তাড়াইয়া দাও। যিনি কথা কহিয়া সমস্ত জীবনকে আন্দোলিত করেন সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর। ব্রহ্মের কথায় সমস্ত জীবনের পরিবর্ত্তন হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বদা কথা কহিতেছেন, অভক্ত নাস্তিকেরা তাহা শুনিবে কিরূপে? যখন আস্তিকতার পথে চলিতে আরম্ভ করিবে, যখন সত্যভাবে উপাসনা করিতে শিখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে ঈশ্বর কেমন সর্ব্বদা কথা বলেন। মনুষ্যের জীবনে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা করা উচিত কি না, এই সম্পর্কে ঈশ্বর কথা বলেন না। অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার হইতে নিতান্ত ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আজ্ঞাতে সম্পন্ন হয়। তৃষ্ণা হইয়াছে জল পান করিব কি না, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ দেশে প্রচার করিতে যাইব, কোথায় কখন কোন্ গান করিব, এ সকল প্রশ্ন আমার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিব। যদি তিনি এ সকল কথার উত্তর না দেন, তবে তিনি সত্য ঈশ্বর নহেন,

অথবা আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর মৌনী নহেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না ঈশ্বরের এরূপ স্বভাব নহে। গাভী যেমন বৎসের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভক্তবৎসল হরিও তেমনই তাঁহার ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। কে বলিল তোমার যৌবনকালে ঈশ্বর তোমার সঙ্গে কথা কহিবেন না, তিনি তোমার বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন? ঈশ্বর যৌবন বার্দ্ধক্য মানেন না। তিনি সকল অবস্থাতেই তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। তোমরা পৃথিবীতে গুরু, সাধু, মহাপুরুষ খুঁজিতেছ; কিন্তু তোমরা একবার যদি ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাহা হইলে তোমাদের মনে কোনও ভ্রম এবং সংশয় থাকিতে পারে না। ঈশ্বর নিজে গুরু হইয়া শিষ্যের দ্বারে বসিয়া আছেন। একবার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে ডাক। প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাক, তাঁহার মুখের কথা না শুনিলে কখনও মনের সমস্ত সংশয় দূর হইবে না, এবং কেহই খাঁটি ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে না। অতএব জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিয়া খাঁটি ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

মাটীর ভিতর হইতে যেমন ফোয়ারার জল উঠে, সেইরূপ তোমাদের চিত্ত-ভূমির ভিতর হইতে হরির মধুর কথা উঠিবে। হরি কথা বলিতে পারেন না; সাবধান, কোন ব্রাহ্মের মুখ হইতে যেন ভ্রমেও এই মিথ্যা কথা বাহির না হয়। যে বলে ব্রাহ্মসমাজের হরি নিদ্রিত— তিনি গুরুতর প্রশ্নেরও উত্তর দেন না, সে মিথ্যাবাদী নাস্তিক। যথার্থ হরি সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। যদি বলি হরি উদাসীন, তিনি আমাদের কথার উত্তর দেন না, আমি কখন কি করিব কখন কোন্ স্থানে যাইব, সংসারের জন্য টাকা উপার্জ্জন করিব কি না,

সন্তানাদি কিরূপে পালন করিব, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না, তাহা হইলে হরির নামে কলঙ্ক হইবে। এইরূপে যদি আমরা হরির আদেশ এবং উপদেশ গ্রহণ না করি, হরি মনে করিবেন, এখন আর আমার ভক্তগণ আমাকে কথা জিজ্ঞাসা করে না, আমাকে মৃত পাথর মনে করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছামত কার্য্য করে। ব্রাহ্মগণ, হরিকে এইরূপ আঘাত করিও না। গুরুতর, লঘুতর সমুদয় বিষয় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে। যাহাদের মনের ভিতরে ভূত আছে তাহারাই ঈশ্বরের কথা শুনে না। তাহারা সেই ভূতকে জিজ্ঞাসা করে—সুখের আসক্তি ছাড়িব কি? তাহাদের স্কন্ধের ভূত বলে, না। অতএব ভূতের কথা না শুনিয়া ঠিক ভাবে ঈশ্বরের নিকট যাইবে। যদি পাপে আলস্যে অচেতন হও, তবে আর কিরূপে হরির কথা শুনিবে? ঘোর বিপদ প্রলোভনের মধ্যে হরি রক্ষা না করিলে আর বাঁচিতে পারিবে না। হরির কথা না শুনিলে কেহই বাঁচিতে পারিবে না; কিন্তু সেই সময় আসিতেছে যখন তুমি আমি যেমন কথা কহিতেছি, তেমনই ব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন। অতএব ব্রাহ্মের হৃদয় সাধকের হৃদয় হউক! ব্রহ্মের কথা সুমিষ্ট, শুনিতে ভাল লাগিবে। সেই কথা মধুময়, সুধাময়, অমৃতের সমান, তাহাতে জ্ঞান হয়, এবং শোক দুঃখ যায়। সেই সময় আসিতেছে, যখন জীবন্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। ঈশ্বরের কথার নিকট বজ্রধ্বনি লজ্জা পাইবে। সেই সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মগণ ক্ষিপ্ত হইয়া দলে দলে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিবে। সকলের সমবেত বিশ্বাসের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজের এক একটী ঘটনা এক একটী জ্বলন্ত অগ্নি। সেই সময় এই সময় যখন জীবন্ত ভাবে ঈশ্বর

আপনার করুণার পরিচয় দিবেন। হরি ভবকাণ্ডারী হাল ধরিবেন। আমরা নিরাপদে নৌকায় বসিয়া আস্তে আস্তে নৌকা চলিতেছে দেখিব, হরি হাল ধরিয়াছেন দেখিয়া নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তি-ধামে চলিয়া যাইব।

শরীর ব্রহ্মমন্দির। *

রবিবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮০০ শক ; ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মন্দিরের ভিতরে মন্দির। ব্রহ্মমন্দিরের ভিতরে ভক্তদিগের দেহ-মন্দির। যেমন এই জড়-মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, দেহের মধ্যেও সেইরূপ ঈশ্বর বাস করিতেছেন। যিনি জীবের জীবন এবং এই ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তিনি দেহ-মন্দিরে দেহ-দেবতা হইয়া বাস করিতেছন। এক মন্দির দেখে না, শুনে না ; আর এক মন্দির দেখে, শুনে। এক মন্দিরের গতি নাই, আর এক মন্দিরের গতি আছে। এই দেহ-মন্দির সামান্য নহে। যাহার সৌভাগ্য আছে, এই দেহ-মন্দির স্পর্শ করিয়া সে নিমেষের মধ্যে স্বর্গারোহণ করিতে পারে। ভাই, আমার শরীরকে আমি স্পর্শ করিয়া আমি স্বর্গারোহণ করিব। শরীর স্পর্শ সামান্য সাধন নহে। শরীর কি? জড়, মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত অতি অসার বস্তু ; কিন্তু ইহা আবার স্বর্গীয় বস্তু। কেন না শরীরের মধ্যে কেবল জীবাত্মা বাস করে তাহা নহে, শরীর আবার ঈশ্বরের আবাস স্থান। শরীরের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন বলিয়া শরীর পবিত্র এবং অমূল্য বস্তু। এক দিকে শরীর নানা প্রকার ব্যাধির আলয়, অন্য দিকে ইহা আবার ব্রহ্মমন্দির।

কিন্তু আমরা ব্যাধির দিক দেখিব কেন? মনুষ্যের শরীর দেবমন্দির, সেই দেবতাকে শরীরের মধ্যে দেখিয়া আমরা শরীরের মর্য্যাদা করিব। যাঁহারা শরীরকে অবহেলা করেন তাঁহারা যথার্থ দেহতত্ত্ব জানেন না। এই শরীরের মধ্যে চমৎকার বস্তু সকল আছে। এই শরীর একটী রত্নাকর, ইহার মধ্যে অনেক রত্ন আছে।

শরীরের প্রতি দৃষ্টি মাত্র স্মরণ করা উচিত, এই শরীরের বল শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু "ঈশ্বর, ঈশ্বর" এই নাম উচ্চারণ করিতেছে, আর দৌড়িতেছে। স্বচক্ষে যদি সেই রক্ত-স্রোত দেখিতে পাও, এবং তাহার এক একটী বিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে, প্রত্যেক রক্তবিন্দু হরিনাম উচ্চারণ করিতেছে। মস্তকের একটী কেশকে শতখণ্ড কর প্রত্যেক খণ্ড হরিনাম উচ্চারণ করিবে। সমস্ত শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে ঈশ্বরের শক্তিতে। শরীরের প্রত্যেক অংশে ঈশ্বরের বল কার্য্য করিতেছে। বাহুবলে, রক্তবলে সেই পরম প্রভু পরমেশ্বরের শক্তি কার্য্য করিতেছে। সেই শক্তি আমাদিগের দেহ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই শক্তি আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। আমাদিগের শক্তি সামর্থ্যের মূলে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি সামর্থ্য কার্য্য করিতেছে। সমস্ত শরীরে ব্রহ্ম-শক্তি, ব্রহ্মতেজ। আমাতে আর আমিকে দেখিতে পাই না। কত চেষ্টা করিয়াও সেই আমি পদার্থকে আর দেখিতে পাইলাম না।

আগে সাধক হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ক্রিয়ায় কর্ত্তা আমাকে দেখিতে পাইতাম। দেহের সমস্ত ক্রিয়াকে আমার ক্রিয়া বলিতাম, এখন দেহাধিকারীর পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। এখন আমি, আমি, আমি, তিনবার ডাকিলেও তাহার দেখা পাওয়া যায় না। সেই

আমির মৃত্যু হইয়াছে। এখন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, শরীরের অধিকারী হইয়াছেন, বিশ্বপতি দেহপতি হইয়াছেন। এখন শরীরের ভিতরে, বাহিরে ও চারিদিকে ব্রহ্মতেজ। আমি বলিয়া যে শরীরের একটী পুরাতন অধিকারী ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন, কোথায় আছ আমি? কোথায় আছ আমি? কোথায় আছ আমি?—বলিয়া তিনবার ডাকিয়া দেখিলাম, কেহ কথা কহে না, কেহ উত্তর দেয় না। তুমি কাহার সম্পত্তি? তুমি কাহার বাড়ী? শরীরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শরীর বলে, "আগে ছিলাম আমি বলিয়া এক ব্যক্তির অধীন, এখন অধিকারীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন ঈশ্বর আমার পতি এবং অধিকারী হইয়াছেন। তাই আমার রক্ত মাংস এবং অস্থি এত পবিত্র হইয়াছে। আগে যে অহং অহং অহং বলিয়া একজন অহঙ্কার করিত সে মরিয়াছে, এখন আমি ঈশ্বরের হইয়াছি।"

পুণ্যের ঈশ্বর, অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর শরীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। শরীরের মধ্যে যে বিভাগে প্রবেশ করি সেখানেই দেখি ব্রহ্মের আবির্ভাব। শরীর জাগ্রত জীবন্ত মন্দির। আগে সাধনের পূর্ব্বে শরীর নাস্তিক বিষয়ী ছিল, এখন শরীর ব্রহ্মবান্ এবং ব্রহ্মময় হইয়াছে। শরীর-মন্দিরের ভিতরে ঈশ্বর বিরাজমান রহিয়াছেন। ব্রহ্ম-সাধকের আর অন্য তীর্থে যাইবার প্রয়োজন হইল না। ব্রহ্মের আবির্ভাবে যাঁহার শরীর তীর্থস্থান হইয়াছে, তাঁহাকে আর শ্রীক্ষেত্র, কাশী, বৃন্দাবন, মক্কা, কিম্বা জেরুজেলাম যাইতে হয় না। তিনি নিজের শরীরের মধ্যেই তাঁহার ইষ্টদেবতার আবির্ভাব অনুভব করেন। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীর দেবালয়। তোমাদের দেহ-মন্দিরে

আমার দেহ-মন্দিরে, সেই বিশ্বপতি দেবতাকে দেখিব। কি ব্রহ্মমন্দিরে, কি পথে, কি গাড়ীর উপরে, কি নৌকার মধ্যে যত মানুষ দেখিব, সকলের দেহ-মন্দিরে সেই দেহপতিকে দেখিব। এক দেবতা কোটী কোটী দেহ-মন্দিরে প্রকাশ পাইতেছেন। শরীর স্পর্শ করিলে ঈশ্বরের মন্দির স্পর্শ করা হয়। হঠাৎ যদি বিশ্বাসের শুভ মুহূর্ত্তে এক হস্ত দ্বারা আর এক হস্তকে স্পর্শ করি, তখনই সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারি। যতদিন "আমি" শরীরের কর্ত্তা ছিল, ততদিন শরীর ঘৃণিত ছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে শরীর ঈশ্বরের হইয়াছে, তখন হইতে শরীর পবিত্র হইয়াছে। আমি আগে আমার সেবা করিতাম, এখন আমির কার্য্য রহিত হইয়াছে, এখন শরীর ব্রহ্মসেবা করিতেছে। ব্রহ্মের অভিপ্রায় সাধনের জন্য শরীরের সমুদয় কার্য্য ব্রহ্মতেজ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। এখন আমার শরীর বলিয়া আমি গর্ব্ব করিতে পারি না। অহং অথবা অহঙ্কারের মৃত্যু হইয়াছে। এখন ব্রহ্মময় শরীর, ব্রহ্মবান্ শরীর দেখিলে পুণ্য হয়। শরীরের মধ্যে যদি ব্রহ্মকে দেখিতে চাও তবে এই শতাধিক ব্রাহ্মদিগের দেহ মধ্যে তাঁহাকে দেখ। মিথ্যা বলিতেছি না, প্রত্যেক দেহ ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্ম-অগ্নিতে পরিপূর্ণ।

হে পাপী ভ্রাতঃ, তুমি পাপী থাকিতে পারিবে না, কেন না তোমার শরীরে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। সেই শরীর লইয়া তুমি কি আর পাপের পথে আমোদ করিতে পার? কাহার শরীর লইয়া তুমি পাপ করিতে যাইতেছ? পাপাচার করিয়া কাহার শরীর তুমি কলুষিত করিতে যাইতেছ, কাহার চক্ষু লইয়া তুমি কুদর্শন করিবে এবং কাহার কর্ণে তুমি কুকথা শ্রবণ করিবে? দাঁড়াও, আবার

জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার সম্পত্তি লইয়া পাপ করিতে যাইতেছ? রসনা কাহার শরীরের অঙ্গ যে, তুমি রসনা দ্বারা মিথ্যা অথবা কটু কথা বলিবে? যখনই তুমি তোমার শরীরে ব্রহ্মকে দেখিলে, তখনই তুমি বুঝিতে পারিলে তোমার শরীর আর তোমার নাই। যখন তুমি বিশ্বাসী হইলে, তখন তুমি দেখিলে তোমার শরীর আর তোমার নহে; কিন্তু ঈশ্বরের। ব্রহ্মশক্তিতে তোমার শরীর সঞ্জীবিত। তোমার নামে আর কেন শরীর উপাধি পাইবে? সেই তুমিও নাই, সেই তোমার শরীরও নাই। এখন দেখিতেছি তোমার শরীর দেবমন্দির উপাধি পাইয়াছে। সমস্ত শরীরে ব্রহ্মতেজ দীপ্তি পাইতেছে। যেমন এক গ্যাসের আলোক সকলের ঘরে জ্বলিতেছে, সেইরূপ সকলের শরীরে এক ব্রহ্মতেজ দীপ্তি পাইতেছে। যতদিন অহঙ্কার থাকে ততদিন মনুষ্য বলে তুমি, আমি; কিন্তু যখন বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেখিতে পায় তাহার সমুদয় শরীর ব্রহ্মের। মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বাসী দেখিতে পায় তাহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল, এবং জ্যোতির্ম্ময়। সে আর মন্দ কর্ম্ম করিতে পারে না। তাহার ব্রহ্মময় আত্মিক চক্ষু আর মন্দ দেখিতে পারে না, তাহার কর্ণ মন্দ কথা শুনিয়া আমোদ করিতে পারে না, তাহার হস্ত পাপ করিতে পারে না।

যখনই সাধক বিশ্বাস করিল যে তাহার শরীর ব্রহ্মমন্দির তখনই শরীরের দ্বারা পাপ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে বুঝিতে পারে তাহার শরীর তপস্যার জন্য, সাধনের জন্য। যতদিন 'অহং' শরীরের মালিক ছিল ততদিন শরীর পাপ করিত; কিন্তু যখন ঈশ্বর শরীরের অধিকারী হইলেন, তখন আর শরীরের পাপ করিবার ক্ষমতা রহিল

না। ব্রহ্মের আবির্ভাবে শরীর তেজোময় হয়, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে রসনা পবিত্র হয়। সেই রসনা সত্য ভিন্ন আর মিথ্যা বলিতে পারে না। আমরা শুনিতে পাই ব্রহ্মচারী তেজস্বী ঋষিদিগের শরীর, কেহ স্পর্শ করিতে পারিত না। ইহার ভিতরে যদিও কুসংস্কার থাকিতে পারে; কিন্তু তোমরা ব্রাহ্ম, ইহার ভিতর হইতে সত্য বাহির কর। সমস্ত শরীর যদি তেজোময় না হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। ব্রহ্মতেজ প্রভাবে সেই বহু রোগে আশ্রিত শরীর কোথায় গেল? দেহতত্ত্ব অতি চমৎকার শাস্ত্র। যাহারা ঈশ্বর নির্ম্মিত শরীরকে অবহেলা করে তাহারা অপরাধী। তুমি যখন আহার কর, আমি বলিব তুমি ব্রহ্মতেজকে প্রবল রাখিবার জন্য ব্রহ্মের অভিপ্রায় সাধন করিতেছ। ব্রহ্মপূজা এবং ব্রহ্মসেবার জন্য এ সমুদয় শারীরিক ব্যায়াম আবশ্যক। সাধু-শরীর স্পর্শ করিবার জন্য দূরে যাও কেন? ব্রহ্মসন্তান, সঙ্কেত বলি শুন। ঘরে বসিয়া থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে আপনার শরীরকে সতেজ কর। জয় ব্রহ্মের জয়, জয় হরির জয়, জয় ব্রহ্মজ্যোতিবিশিষ্ট শরীরের জয়, বলিতে বলিতে তোমার সমস্ত রক্ত মাংস এবং অস্থি পবিত্র হইবে। ব্রহ্ম অর্চ্চনা করিতে করিতে ভিতরের ব্রহ্মাগ্নি বাহিরে আসিবে, বাহিরের ব্রহ্মাগ্নি ভিতরে প্রবেশ করিবে। এইরূপ সাধন করিতে করিতে সমস্ত পাপবন্ধন ছিন্ন হইবে এবং জীবাত্মা পরিত্রাণ লাভ করিবে।

ভক্তদল বৃদ্ধি। *

রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০০ শক; ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

স্বপ্নেতে পৃথিবী দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় পরলোক দেখা যায়। যে ইহলোকের ধন সম্পদ দেখিতেছে সে স্বপ্ন দেখিতেছে, যিনি পরলোক ও পরলোকবাসী যাজ্ঞবল্ক্য, ঈশা, মুসা প্রভৃতি প্রেরিত মহাপুরুষ সকলকে দেখিতেছেন তিনি জাগ্রত। স্বপ্নেতে মনুষ্য পৃথিবী সাধন করে, জাগ্রত অবস্থায় মনুষ্য পরলোকে বাস করে। চক্ষু খুলিলে যদি পরলোক পাও তবে তোমাদের জাগ্রত অবস্থা। যতই তোমাদের আত্মার চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, ততই তোমাদের ঐহিক সুখের স্বপ্ন নষ্ট হইবে, এবং জীবনের প্রাতঃকাল দেখিতে পাইবে। যাহারা বিষয়-সুখে মত্ত তাহারা অচেতন প্রায় হইয়া স্বপ্ন দেখে এবং ভয়প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা চক্ষু খুলিবা মাত্র সত্যের প্রশস্ত পথ দেখিতে পান, এবং যাঁহাদিগকে পরলোকের মহাত্মাগণ অভয় দান করেন, তাঁহারাই জাগ্রত ব্রাহ্ম। যে সকল নিদ্রিত আত্মা স্বপ্ন দেখিতেছে তাহারাই মৃত্যুর প্রেরিত দূত সকল দেখিতে পায়, তাহারাই একটা সামান্য ক্ষুদ্র মেঘ অথবা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা দেখিলে বলে ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ হইল। যাহারা বলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের অধোগতি হইতেছে, তাহারা পৃথিবীর মোহ, মায়ায় অভিভূত হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। এ সকল ভয়ানক স্বপ্নের কথা, এ সকল বিকারের রোগীর প্রলাপ বাক্য। জাগ্রত লোকেরা কথনও এ সকল কথা বলিতে পারে না যে, ঈশ্বরের রাজ্য এবার ডুবিল, ঐ মনের মধ্যে ছয়জন তস্কর প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধন হরণ

করিল, কাল প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ব্রাহ্মসমাজের নিপাত দেখিব। নিত্য লীলাপরায়ণ জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া আর স্বপ্ন দেখিব না। পরলোকের মহাত্মাগণ আমাদিগের স্বপ্নের প্রতিবাদ করিতেছেন।

ব্রহ্মসন্তান, সত্যের সন্তান সত্য দেখেন, সত্য ভোগ করেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া ভীত বা নিরাশ হন না। ব্রাহ্ম, তুমি যদি এখনও ভয় পাও তবে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ। যদি জাগ্রত হইতে চাও তবে সেই পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখ। যতই ইহ-লোকের বস্তু সকল দেখিবে ততই অচেতন হইবে। অতএব কেবলই পরলোকবাসী মহাপুরুষদিগকে দেখ, সকলেই পারলৌকিক অকৃত্রিম, অতীন্দ্রিয় বস্তু সকল ধারণ করিতে চেষ্টা কর। এখানকার উপদেশ, মন্ত্রণার প্রয়োজন নাই। এক একবার চক্ষু খুলিয়া পরলোকের দিকে তাকাইয়া দেখ। দেখিতেছ কি? মিথ্যার জয় একবারও হয় না, কেবলই সত্যের জয় হয়। যত প্রার্থনা করিয়াছ, তাহার ফল হইতেছে। যত সত্য কথা বলিয়াছ নিশ্চয়ই তাহার জয় হইবে। ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য যে পরিমাণে কাঁদিয়াছ, সেই পরিমাণে তোমার দুঃখ আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর লোকেরা তোমাদিগকে গ্রহণ করুক আর না করুক, পরলোকবাসী সাধুগণ তোমাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন। যাহারা নিদ্রিত, তাহারা স্বপ্নে মনে করিতেছে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার হইতেছে না; কিন্তু যাঁহারা জাগ্রত তাঁহারা দেখিতেছেন ভক্তদল বৃদ্ধি হইতেছে, অভক্তদল হ্রাস হইতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন নাস্তিক দল ক্ষয় হইতেছে এবং আস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

হইতেছে। তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন কাল পৃথিবী সাদা হইবে এবং নরলোক দেবলোক হইবে। ব্রাহ্মগণ, যখনই তোমরা জাগ্রত হইবে তখনই তোমরা বুঝিবে এ সকল কথার কথা নহে। আমরা প্রত্যেকে স্বচক্ষে দেখিতেছি ভক্তের দল বৃদ্ধি হইতেছে। সংসার যাহাদের বল উদ্যম কাড়িয়া লইয়াছে, যাহাদের জীবনে সংসারের জয় হইতেছে, তাহাদিগের নিকটে দল বৃদ্ধির কথাই নাই। পৃথিবীর সত্য রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য, ব্রাহ্মগণ তোমরা কি আর কোন চেষ্টা করিবে না?

দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলে আমাদের কত আহ্লাদ হইত? আহার করিতেছ, আমোদ করিতেছ, দৈনিক তাবৎ কার্য্যই করিতেছ, কেবল সত্য প্রচার করিবার জন্য কি তোমাদের সময় নাই? স্বার্থপরতার ভিতরে পড়িয়া তোমাদিগের জীবন-ভূমি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। বন্ধু সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য তোমাদের আর তেমন উদ্যম, উৎসাহ নাই। তোমরা মনে করিতেছ, দুই পাঁচটী বন্ধুকে লইয়া উপাসনা করিয়া আমরা আপনারা ভাল হইলেই হইল। কবে তোমরা এই স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ অবস্থা হইতে মুক্ত হইবে? স্বপ্নে কেহই দৌড়িতে পারে না ইহা সকলেই জান। ভয়ানক মৃত্যু সমক্ষে, দৌড়িয়া প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু স্বপ্নে দৌড়িতে পারি না, অগ্রসর হইতে পারি না, বল নাই, মনে তেজ নাই। পরলোকের যাত্রিগণ যদি চলিতে চাও, যদি দৌড়িয়া অমৃতধামে যাইতে চাও, তবে স্বপ্নের অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হও। ঈশ্বর যখন তোমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন, তখন তিনি দয়া করিয়া তোমাদিগকে একটী দল-বদ্ধ করিয়াছিলেন।

যদি তিনি তাহা না করিতেন তাহা হইলে কি তোমরা এতদিন তিষ্ঠিতে পারিতে? সেই দলের উৎসাহ এতদিন তোমাদিগকে সজীব রাখিয়াছে। যে দলের গুণে তোমরা বাঁচিয়া আছ সেই দলকে তুচ্ছ করিও না। সেই দল বৃদ্ধি করিতে প্রাণপণে যত্ন কর। স্বপ্নের ভিতরে পড়িয়া আর ক্রমে ক্রমে নিরুদ্যম হইও না। চারিদিকে চলিয়া যাও, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সাধক প্রস্তুত কর, ভক্তদল বৃদ্ধি কর, যাহারা এখন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই তাহাদিগকে দীক্ষিত কর। ধর্ম্মরাজ্য, প্রেমরাজ্য বিস্তার কর, ঈশ্বরের এই আজ্ঞা।

আমরা এই আজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম। ঈশ্বরের জ্বলন্ত আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া আমরা আলস্য-শয্যায় শয়ান রহিলাম। আমাদিগের চারিদিকে কোটী কোটী লোক ভয়ানক দুঃখের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, আমরা তাহাদিগকে ঈশ্বরের ধর্ম্মামৃত পান করাইলাম না। ঈশ্বর কি আমাদিগকে আমাদের আপন আপন গৃহের দ্বার অবরোধ করিয়া স্বার্থপর হইয়া থাকিবার জন্য আমাদিগের হস্তে তাঁহার অমৃত দান করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন তোমরা প্রত্যেকের কাছে যাও। তাঁহার আজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া আমরা কি এখন স্বপ্ন দেখিব? এক পল্লীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাহাতেই কি সেই স্বর্গের অগ্নি ফুরাইল? না, সেই অগ্নি দ্বারা শত শত পল্লী জ্বলিয়া উঠিবে। পরে ঈশ্বরের সেই দাবানলে ক্রমে ক্রমে লক্ষ লক্ষ লোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। হে ব্রহ্মসন্তান, স্বর্গ তোমার নির্জীব-তার প্রতিবাদ করিতেছে। যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে। তোমরা দীক্ষা-রত্ন পাইয়া কত সুখী হইয়াছ, অন্যকে সেই

সুখের অধিকারী করিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না? ঈশ্বর এইজন্য তাঁহার ধর্ম্ম-রত্ন বিতরণ করিতেছেন যে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম আর দশ জনকে তাহা দিবেন, তিনি আর দশ জন বন্ধুকে ঈশ্বরের রাজ্যে আনিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় প্রাণকে শীতল করিবেন। দল-বদ্ধ হইয়া আমরা বাঁচিয়াছি, অতএব আমাদের অন্যান্য ভাইদিগকে দল-বদ্ধ করিতে কেন চেষ্টা করিব না? যে দীক্ষা আমাদের প্রতিজনের পক্ষে অমূল্য রত্ন, অন্য লোককে কেন আমরা সেই রত্ন দিব না? অন্য লোক সম্পর্কে কেন আমরা এই কথা বলি যে, সময় হইলে তাঁহারা আপনারা আসিবেন। যে রত্ন দান করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন সেই ঋণ কি পরিশোধ করিতে হইবে না?

ঈশ্বর চিরকাল আপনার দল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরের জয় হইবেই হইবে, তাঁহার দল বৃদ্ধি হইবেই হইবে। যাহারা বলে ঈশ্বরের দল হ্রাস হইতেছে, তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে। জাগ্রত অবস্থায় সত্যবাদী হইয়া বল স্বর্গরাজ্যের বিস্তার হইতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ ঈশ্বরের রাজ্য স্ফীত হইতেছে। একদিন আসিবে যখন—যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে—তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিবে যে পৃথিবী স্বর্গ হইতেছে। পরলোকের মহাত্মাগণ এই স্বপ্নের প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে, তোমরা সত্য প্রচার করিয়া অকুতোভয়ে চলিয়া এস, সকল ভয় ভাবনা ফেলিয়া দাও। প্রাণপণ করিয়া ভক্তের দল, সাধকের দল বৃদ্ধি কর, দল পুষ্টির জন্য চেষ্টা কর। স্বার্থপর হইয়া আপনারা সুধা পান করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। "সে ঈশ্বরের মুখ দেখে নাই, যে পাগল হইয়া অন্যকে সেই মুখ

না দেখায়। ব্রহ্ম চাহিতেছেন তাঁহার সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। তাঁহার সন্তানেরা সংসারের সন্তান হইয়া থাকিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে বিষয়ের সন্তানের সংখ্যা কমিবে। কেবল বক্তৃতা করিয়া প্রচার করিলে চলিবে না, জীবন দ্বারা দেখাও যে অন্ততঃ একজনও ঈশ্বরের নামে মোহিত হইয়াছে। যদি জীবন দেখিয়া দশ জন লোক আকৃষ্ট না হয় তবে প্রচার মিথ্যা। কবে দশ জন লোক ব্রাহ্ম হইবে এই তোমাদের ভাবনা হইবে, দশ জন লোক—দশ কোটী টাকা। এক এক ভাই এক এক রত্ন। দেখাও তোমাদের ঘরে এইরূপ কত রত্ন বাড়িতেছে।

হরিভক্তের সংখ্যা বাড়িবে। ব্রহ্মভক্তি-রসে দেশকে পরিপ্লুত করিতে হইবে। এস সকলে আমাদের দয়ালের কাছে এস, যাঁহারা দীক্ষিত হন নাই তাঁহারা দীক্ষিত হউন! যাঁহারা স্বপ্ন-শৃঙ্খলে বদ্ধ তাঁহারা জাগ্রত হইয়া পরলোক দর্শন করুন, পারলৌকিক আনন্দ সম্ভোগ করুন। সকলে জাগ্রত হইয়া ঈশা, চৈতন্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির কথা শ্রবণ কর। স্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া সকলে বিবেকের কথা শুন। ব্রহ্মনাম ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না, ভক্তির সৌরভ চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, বন্ধু সংখ্যা বৃদ্ধি কর দেখিবে তাহাতে আপনারা বাঁচিবে এবং আর দশ জনও বাঁচিবে।

একে দশ। *

রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০০ শক ; ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

একের ঘরে দশ, ভক্তি-শাস্ত্রের এই অদ্ভুত তত্ত্ব। এই গণিত বিদ্যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। একের ঘরে দশ কিরূপে হইবে ? যদি ইহা জানিতে ইচ্ছা কর, তবে মনুষ্য কে ? আমি কে ? তুমি কে ? এ সকল প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া জানিতে চেষ্টা কর। আমারও নাম আছে, তোমারও নাম আছে, অন্যেরও নাম আছে, সেই নাম উচ্চারণ করিলে, আমাকে, তোমাকে কিম্বা অন্য কাহাকেও বুঝায় ; কিন্তু যথার্থ আমি কে ? তুমি কে ? তিনি কে ? ইহা কেবল নাম কিম্বা উপাধিতে বুঝা যায় না। নামেতে, উপাধিতে, জাতিতে, দেশেতে ভিন্ন ; কিন্তু সেই লোক কে যাহাকে এই নাম নির্ব্বাচন করে ? যত মূর্খ থাকি তত আমাকে আমি স্বতন্ত্র, একাকী দেখি, যত জ্ঞানী হই ততই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই আমার ঘরে আর দশ জন। যতদিন আমাদের মন নীচ এবং ক্ষুদ্র থাকে ততদিন আমরা মনে করি, আমার ঘরে আমি থাকিব, আমার ঘরে আমার মত চলিবে, আমার সম্পত্তি আমি ভোগ করিব, ইহাকেই সাধারণতঃ আমি বলি, সহজ বুদ্ধিতে তুমি আমি ইহাই বুঝিতাম, কিন্তু আজ কাল ভক্তি-শাস্ত্রে ইহার বিপরীত কথা শুনিতেছি। আমি আমার ঘরে বিচরণ করি এবং আমার ঘরে আর দশ জন বিচরণ করেন। সেই দশ জন হইতে স্বতন্ত্র আমার চরিত্র নাই। আমার ঘরে সেই দশ জনেরও অধিকার আছে। আমার জীবন-উদ্যানে সেই দশ

জন বসিয়া আমোদ করিতেছেন। আমার রক্তের ভিতরে আমাকে দেখি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দশ জনকে দেখিতে পাই। যেমন রক্ত-নদীতে আমার জীবন-তরী চলিতেছে, তেমনই দেখি তাহার মধ্যে আরও দশ জনের জীবন-তরী বেড়াইতেছে। অতএব আমার জীবন তাঁহাদের না আমার ইহা বুঝিতে পারি না।

যদি আমার শরীরকে খণ্ড খণ্ড করি, এক এক খণ্ড হয় ত বলিবে, আমি তোমার নহি। এখন কি করি? অধিকারীর বিবাদ। এ সকল পরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য কথা। অনুমান দ্বারা এ সকল কথা বলিতেছি না। এই যে এত সহস্র বৎসর পৃথিবীতে কত শত শত বংশের উত্থান এবং পতন হইল, সেই সমুদয় বংশের রক্ত এই বর্ত্তমান বংশের রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে! ভূতকালের সমস্ত বংশ বর্ত্তমান বংশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, আবার বর্ত্তমান বংশ ভবিষ্যদ্বংশাবলীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তোমরা রসনায় মান আর না মান, তোমাদিগের আত্মা স্বীকার করিবে যে, তাঁহারা সকলেই তোমাদিগের আত্মার ভিতরে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভিন্ন দেশীয়, বিজাতীয়, তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই, তোমাদের রসনা অথবা শরীর, মন তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিল; কিন্তু তোমাদের রক্তের ভিতরে তোমাদের আত্মার ভিতরে, তাঁহাদের রক্ত বহিতেছে। তোমরা তোমাদিগের রক্ত ধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইতে চেষ্টা কর, তাড়াইতে পারিবে না। যদি তোমরা আপনাদিগকে আপনারা কাটিতে পার তবে পার, নতুবা পারিবে না। তোমরা এই পৃথিবীর ক্ষেত্র হইতে যে ধান্য সংগ্রহ করিয়া আহার করিতেছ

সেই ধান্য সাধুদিগের রক্ত। সাধুদিগের জ্ঞান, সাধুদিগের ধর্ম্মভাব তোমাদিগের জীবনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

সন্ধ্যাকালে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা মনে কর তোমরা বায়ু সেবন করিতেছ; কিন্তু সেখানে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির নিঃশ্বাস বায়ুর আকারে তোমাদিগের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বায়ুর আকারে ভক্তগণ তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করেন। এইরূপে ঈশ্বর দশ জনের চরিত্র লইয়া একজনের চরিত্র গঠন করেন। ঈশা, মুসা, চৈতন্য প্রভৃতির জীবন লইয়া বিধাতাপুরুষ মনুষ্য-চরিত্র গঠন করেন। মনুষ্যের অর্থ নাম নহে, শরীর নহে, মনুষ্যের অর্থ কেবল চরিত্র। তোমার চরিত্র তুমি, আমার চরিত্র আমি। তোমার চরিত্রের ভিতরে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, দশ জনের চরিত্র আছে। তোমার চরিত্রের ভিতরে দশ জনের চরিত্র খেলা করিতেছে। অমুক সাধুর বিনয়, অমুক সাধুর বৈরাগ্য ভাব, অমুক সাধুর তপস্যা, অমুক ভক্তের কোমলতা, অমুকের প্রখর জ্ঞান, অমুকের উৎসাহ, এ সমস্ত একত্র হইয়া একজনের চরিত্র গঠিত হয়। তুমি মনে করিতেছ, তুমি একজন স্বতন্ত্র জীব; কিন্তু সত্য কথা এই, তোমার ভিতরে স্বতন্ত্র অহং নাই, তোমার ভিতরে আর দশ জন বসিয়া আছেন। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া তোমার আমিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। আর অহঙ্কার খুঁজিয়া পাইবে কিরূপে? দশ জন মহাপুরুষের চরিত্র তোমার চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। তোমরা যদি ভাল লোক হও, তবে তোমরা সাধুদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছ, তাঁহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছ। অতএব ব্রাহ্মগণ, যদি সাধু হইতে চাও, তবে আর আপনাদিগকে স্বতন্ত্র মনে করিও না।

স্বতন্ত্র থাকিয়া কি হইবে? চারিদিক হইতে সোণার জল, মুক্তার জল আসিয়াছে। সেই নির্ম্মল সুমিষ্ট জল ছাড়িবে কেন? একে দশ ইহার মধ্যে অনেক গূঢ় কথা আছে। ভাবিলে বুঝিবে বিদেশে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সাধু ছিলেন তাঁহারা তোমাদের কাছে বসিয়া আছেন। সাধু মস্তকে, সাধু কেশে, সাধু স্কন্ধে, সাধু রক্তে এবং সাধু হস্তে। সমস্ত শরীর মন সাধুময় হইল। আমিই ত পর, পরই ত আমি। তাঁহারা যদি বলপূর্ব্বক আমার উদ্যানে আসিলেন, আমি তাঁহাদিগকে বিজাতীয় বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? তাঁহাদিগের সঙ্গে বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর একত্র বাস করিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত হইয়াছে। কে কে আমাদের সঙ্গে আছেন? যত সাধু জগতে ছিলেন। তাঁহারা ইনি, উনি নন, তাঁহারা আমি। ইহাতে অভিমান নাই। যদি বল আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম, আমরা কাহারও নিকট ঋণী হইব না, তবে তোমরা তোমাদের স্বতন্ত্রতা লইয়া তোমাদিগের সেই কল্পিত স্বতন্ত্র স্বর্গে প্রবেশ কর। আমি সেই জঘন্য স্বর্গ চাহি না। আমি পৃথিবীর সমস্ত সাধুদিগের সঙ্গে থাকিব। আমি ত আমি নহি, আমি সাধুদিগের। আমি সাধুদিগকে সর্ব্বব্যাপী বলি না, আমি স্বচক্ষে তাঁহাদিগের বাহ্য মূর্ত্তি দেখিয়াছি ইহাও বলি না, অথচ আমি মানি, আমার মনের ভিতরে সক্রেটিস্, পল্, ঈশা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। তোমাদের বুকের ভিতরে তাঁহারা, আমার বুকের ভিতরে তাঁহারা। পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগের জীবনের মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রখর জ্ঞান এবং সাধুতা সমস্ত জগতের চরিত্র গঠন করিতেছে, সাধুতা সম্পর্কে দেশের এবং কালের ব্যবধান নাই। অতএব বিজাতীয় বলিয়া কোন সাধুর অবমাননা করিও না।

পৃথিবীর সাধুরা তোমাদিগের প্রাণের দুর্গ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাড়াইতে পার না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সাধুদিগের দ্বারা অধিকৃত! ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সাধুদিগের জীবন-নদীর মধ্যে সর্ব্বদা অবগাহন করিয়া রহিয়াছেন।

দ্বিজ। *

রবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০০ শক; ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণ জন্মাবধি ব্রাহ্মণ তাঁহারা ঠিক বলেন না। যাঁহারা বলেন চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় তাঁহারা সত্য বলেন। সদ্যোজাত শিশু ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। বেদেতে শিশুর অধিকার নাই। ক্ষুদ্র শিশুর ভিতরে ব্রাহ্মণত্ব নাই। ব্রাহ্মণতনয় হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। পশু পক্ষী যেমন সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণতনয়টীও তদ্রূপ। তাহার ভিতরে বিবেক নাই। যেমন পশু পক্ষী চালিত হয়, সেই শিশুও সেইরূপে চালিত হয়। সেই শিশু চণ্ডাল, তাহাকে পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুদ্র শিশুর মনের ভিতরে জ্ঞানের কথা নাই, ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে এমন ভূমিই সেখানে দেখা যায় না। যত শিশু পৃথিবীতে আসে তাহারা সকলেই এই নীচ জাতি, এই চণ্ডালদিগের ভিতর হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। চণ্ডাল হইতে কিরূপে ব্রাহ্মণ হয় কে বলিতে পারে? সেই পশু তুল্য শিশু হইতে মনুষ্য, এবং মনুষ্য হইতে দেবতা উৎপন্ন হয়। চণ্ডালের ঘরে ব্রাহ্মণের জন্ম। সেই চণ্ডালের ভিতর হইতে দ্বিজ বাহির হইবেন, এক হাতে জ্ঞান এবং অন্য হাতে ধর্ম্ম

লইয়া। সেই শি ু দ্বিজ ছিল না। শিশু পৃথিবীতে পশুর ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ উন্নত হইয়া সে ব্রাহ্মণ হইল, ঈশ্বরতত্ত্বে তাহার অধিকার জন্মিল, তাহার মনের ভিতরে বিবেক প্রস্ফুটিত হইল। সেই শিশুর ভিতরে অলক্ষিত ভাবে দ্বিজ ঘুমাইতেছিল। জরায়ু মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তেমনই আবার সেই শিশুর মধ্যে যথা সময় পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। ক্রমে ক্রমে সেই দ্বিজের সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়। যথা সময়ে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার গৌরব এবং মহিমা প্রকাশ করেন।

অত্যন্ত নীচ জাতির ভিতর হইতেও ব্রাহ্মণ বাহির হইবেন। চণ্ডাল, যবন প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যে অপ্রস্ফুটিত ভাবে সেই দ্বিজ বাস করিতেছেন। এই পৃথিবী ক্ষুদ্র শিশু এবং পশু পক্ষীদিগের বাসস্থান, কিন্তু এখান হইতেই সেই ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি হয়, যাঁহারা বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী। মনুষ্য-সন্তানের ভিতর হইতে যখন ব্রাহ্মণ জন্মিলেন তখন তাঁহার ইহলোক ছাড়িবার সময় হইল। দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পৃথিবীর অতীত স্বর্গে বাস করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ধর্ম্ম পাইলেন। তিনি বলিলেন আর আমি এই অন্ধকার ঘরের ভিতরে থাকিব না। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই তেজোময় ব্রাহ্মণতনয় উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে চলিলেন। শরীর মন ভাঙ্গিয়া আত্মার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠধামে চলিলেন। শিশু কিছুদিনের জন্য মাতৃগর্ভে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর ভিতর হইতে ক্রমশঃ কিরূপে দ্বিজ জন্মিল ইহা সকলে দেখিল না, বুঝিতে পারিল না। একটী ভৌতিক, অন্যটী আধ্যাত্মিক। স্থূলদর্শী আধ্যাত্মিক রাজ্য দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল দেশেই শিশুর

ভিতর হইতে ব্রাহ্মণ বাহির হইতেছেন। প্রতি দেশে ক্রমাগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ সঙ্কীর্ণ দেহ-গৃহ ভাঙ্গিয়া স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছেন।

এই বঙ্গদেশে, নানা প্রকার পাপ এবং কুসংস্কার প্রযুক্ত প্রকৃত বয়সে ব্রাহ্মণের জন্ম হয় না। হয় ত পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর বয়সের পর এই দেশীয় লোকের মনে যথার্থ ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। তখন তাঁহাদের দীক্ষা অথবা ব্রাহ্মণত্ব হয়। সেই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিতে চলিলেন। পরলোকে যাইবার অল্প সময় পূর্ব্বে তাঁহাদের চৈতন্য হইল। আক্ষেপের বিষয় যে জীবনের অধিকাংশ বৃথা চলিয়া গেল। অতএব যাঁহাদের পরিবার ব্রাহ্ম-পরিবার তাঁহাদিগের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, তাঁহাদিগের শিশু সন্তান সকলের যেন এরূপ দুর্দ্দশা না হয়। তাহারা যেন উপযুক্ত কালে ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী হইতে পারে। তাহাদের পিতা মাতাকে পাপ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করিয়া দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল; তাহারা যেন যথা সময়ে দীক্ষিত হইয়া পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। যেমন অণ্ড ফাটিয়া সুন্দর পক্ষী বাহির হয়, তেমনই সঙ্কীর্ণ শরীর মন ভাঙ্গিয়া যেন লাবণ্যযুক্ত দ্বিজ-সন্তান বাহির হয়। ব্রাহ্মের যুবক সন্তানেরা কুলপাবন সৎপুত্র হইয়া গৃহের মাণিক হইবেন। উপযুক্ত সময় হইলে যেমন অণ্ডকে বলিব, হে অণ্ড, তুমি আর তোমার মধ্যে ঐ সুন্দর পক্ষীকে লুকাইয়া রাখিও না, যেমন মাতাকে বলিবে, হে মাতা, তোমার ভিতরে যে সন্তানকে রাখিয়াছ, তাহাকে আর লুকাইয়া রাখিও না, সেইরূপ উপযুক্ত সময় হইলেই মনকে বলিব, হে মন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের

এই আত্মা, তোমার ভিতরে লাবণ্যযুক্ত পুরুষ লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহাকে প্রকাশ কর।

যাহারা মনে করে, আজ নহে, কাল দ্বিজ হইব তাহারা ঈশ্বরের বিধির সঙ্গে সংগ্রাম করে। প্রতিজনের সম্পর্কে ঈশ্বরের দিন এবং লগ্ন স্থির রহিয়াছে। শুভক্ষণে দ্বিজ জন্মগ্রহণ করিলে বাড়ীর পিতা মাতার মনে কত হর্ষ হয়। আর যদি ছেলে ষোল বৎসর কিম্বা বিশ বৎসরের হইয়াও ধর্ম্ম বিহীন থাকে পিতা মাতার মনে কত দুঃখ হয়। সকলে ছেলের তেজ, লাবণ্য এবং প্রখর জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছে; কিন্তু সেই প্রশংসা ধ্বনির মধ্যেও পিতা মাতার চক্ষু হইতে দুঃখের জল পড়িল। তাঁহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আমাদের ছেলে এখনও পর্য্যন্ত চণ্ডাল রহিল কেন? এত বয়স হইল, কুলপাবন সৎপুত্র হইবে দূরে থাকুক, বরং সুরাপানে আসক্ত হইয়া অসুরের ন্যায় হইল। মনুষ্যাকারে পশু হইয়া কুলের কলঙ্ক হইল। সহজ অবস্থা হইলে কখনও এরূপ হইতে পারে না। শরীর মনের প্রাদুর্ভাব কমিলে নিশ্চয়ই যথা সময়ে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে। ঠিক প্রকৃত অবস্থা থাকিলে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানেরা আপনারা আসিয়া তাহাদিগের ধার্ম্মিক পিতা মাতাকে বলিবে; পিতঃ, মাতঃ, আমাদের সময় হইয়াছে, আর আমরা পশু তুল্য থাকিব না, রিপুকুল জয় করিয়া আমরাও আপনাদের সঙ্গে অমৃতধামে যাইব। আপনারা আমাদিগকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পরলোকের যাত্রীদিগের সঙ্গী করুন; এবং সেই সন্তানবৎসল পিতা মাতাও তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিবেন তোমাদিগের শূদ্রত্ব ঘুচিল, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, তোমরা ব্রাহ্মণ

হইয়া আমাদিগের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গের সুধা পানে অধিকারী হও।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা তোমাদিগের সন্তানদিগের ধর্ম্মের প্রতিকূল হইও না। যাহাতে তাঁহারা দ্বিজ হইতে পারেন ইহার জন্য যত্নবান্ হও। সকল দেশে এই প্রকার যাত্রীদল প্রস্তুত হইতেছে। ঈশ্বর সে সকল দলের সেনাপতি। বঙ্গদেশের যুবাদল, সেই দলবদ্ধ হও। সকলে পশুর রাজ্য বিনাশ কর। যাহাতে দেশ পবিত্র হয় সেই ধর্ম্মব্রত গ্রহণ কর। আপনারা পবিত্র হও, দেশকে পবিত্র কর। বিবেকের মধ্য দিয়া ঈশ্বর বলেন, অমুক, দ্বিজ হও। আক্ষেপের বিষয় সকলে সেই কথা শুনে না। প্রত্যেকের সুসময় আছে। প্রতিজনের নিকট ঈশ্বর দীক্ষাগুরু হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সকলে তাঁহার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ কর। দীক্ষাগুরু ডাকিতেছেন। আন্তরিক দীক্ষায় দীক্ষিত হও। ঈশ্বরের কথায় বধির থাকিও না। যখনই পরম পিতা পরমেশ্বর ডাকিয়া বলিবেন সন্তান, দীক্ষার সময় হইয়াছে, যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইয়া দীক্ষিত হইয়া জীবনকে সার্থক করিবে।

মাসিক সমাজ

দলের মাহাত্ম্য। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০০ শক ;
৬ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আপনার দলস্থ করিবার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। একাকী অসঙ্গ, উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিবার শক্তি বহু সাধনেও মনুষ্য লাভ করিতে পারে না। এমন কি নিঃসঙ্গ যোগীরাও অন্যান্য যোগীদিগের সঙ্গ লাভে অভিলাষ করেন। এইরূপে মনুষ্য আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্বভাবতঃ আপনার দল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে ; অন্যকে আপনার দলস্থ করিয়া লইবার জন্য বিধিমতে যত্ন করে। ধার্ম্মিক লোকেরা যেরূপ অন্যকে তাঁহাদের দলস্থ করিয়া লইতে চেষ্টা করেন, সংসারী লোকেরাও সেইরূপ অন্যকে আপনাদের দলস্থ করিতে যত্ন করে। ধর্ম্মসম্প্রদায় ছাড়িয়া আমরা যদি দশ জন সংসারী লোকের সঙ্গে কিছুকাল থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম্ম ভাব নিস্তেজ হইয়া আইসে, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্যম থাকে না। বিষয়ীর সঙ্গে থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নির্ভর হ্রাস হয়।

আমরা দেখিয়াছি কত যুবা কিছুকাল আচার্য্যাদিগের সঙ্গে থাকিয়া কত ধর্ম্মোৎসাহ প্রকাশ করে, কিন্তু যাই তাহারা সংসারে প্রবেশ করে, অমনই তাহাদিগের সেই উৎসাহ উদ্যম নিস্তেজ হইয়া যায়।

সংসারী লোকেরা তখন তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দেয়, তোমরা যদি অত ধর্ম্মোৎসাহী হও, তাহা হইলে সংসার ও বাণিজ্য চলে না। যুবা এ কথা প্রথমতঃ অগ্রাহ্য করিল, কিন্তু সময়ে সংসারিগণের দলস্থ হইয়া পড়িল। সংসারের সহিত চিরকালই ধর্ম্মের বিরোধ চলিতেছে। সংসার চিরকালই ধর্ম্মাগ্নিকে ক্রমশঃ শীতল করিয়া অবশেষে একেবারে নির্ব্বাণ করে। এইজন্য যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, যাঁহারা ঈশ্বরকে চান, তাঁহারা সংসারী লোকের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিকের প্রবল দল অন্বেষণ করেন। যতই তাঁহারা সেই ধার্ম্মিক দলের মধ্যে বাস করেন, ততই তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্মবল, এবং পুণ্য শান্তি লাভ করেন।

এ কথা সকলেই জানেন যে, যে দলে আমরা থাকি, সেই দলের দোষ গুণ আমাদিগকে স্পর্শ করেই করে। যে দলে মিথ্যা, বঞ্চনা, চাতুরী ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যদি সেই দলে থাকি আমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হইবে। এখন আমরা যে সকল পাপকে ঘৃণা করি, যাহাদের মধ্যে সে সকল পাপ আছে তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে আমাদিগের প্রাণের মধ্যে গূঢ় ভাবে সে সকল পাপ প্রবিষ্ট হইতে থাকে। অসাধু দলে প্রবেশ করিয়া এইরূপে কত যুবা পাপে ডুবিল। দলের কত সামর্থ্য তাহা তাহারা জানে না। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, প্রবল দল দুর্ব্বলদিগকে অতি সহজে টানিয়া লয়। অবিশ্বাসী দল বিশ্বাসীর বিশ্বাস সহ্য করিতে পারে না। যদি কেহ বল আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অবিশ্বাসীরা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলে, কত মুনি ঋষি কত ধ্যান তপস্যা করিয়া যাঁহার দেখা পান না, এই নির্ব্বোধ যুবা বলিতেছে সেই

ঈশ্বরকে দেখিয়াছে। অতএব ধর্ম্মার্থীদিগকে এ সকল বিদ্রূপকারী অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে বিযুক্ত হইয়া সাধকদিগের সঙ্গে বাস করিতে হইবে। ঈশ্বরের সাধকগণ আমাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমরা নানা প্রকার বিপদে আক্রান্ত হইলে সেই দল আমাদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া আশ্বাস এবং অভয় দান করে।

যে স্থানে আশ্বাস এবং অভয় সে স্থান ছাড়িয়া সাধনার্থী কোথায় যাইবেন? সংসারাসক্ত মনুষ্যদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া সাধকমণ্ডলীর সঙ্গে অবস্থিতি করিতে না পারিলে কেহই নিরাপদ হইতে পারে না। কেবল জীবিত সাধুমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিলেও হইবে না। ইহা হইতেও উচ্চতর কথা আছে। সেই পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ, যাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য কত নির্যাতন সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করিতে হইবে। যদিও এই পৃথিবীতে তাঁহাদের শরীর নাই, কিন্তু এখানে এখনও তাঁহাদিগের দুর্জ্জয় স্বর্গীয় প্রবৃত্তি রহিয়াছে। তাঁহারা সংসারে আপনাদিগের উৎকৃষ্ট জীবনবৃত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কোন কালে তাঁহাদিগের প্রবল আকর্ষণ কমিবে না। তাঁহারা ক্রমশঃই অধিকতর বেগের সহিত আমাদিগকে টানিতে থাকিবেন। যখন সংসারের বিপদ প্রলোভন দেখিয়া ভয় পাইব, তখন ঐ মহাত্মাদিগের জীবন স্মরণ করিব। তাঁহারা আমাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তাঁহাদিগের দুর্জ্জয় প্রেমবলে কত জগাই মাধাই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইল। তাঁহাদিগের শিষ্যানুশিষ্যেরাও যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন আমরা কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাইব না? অতএব

সাধুদিগের জীবন দর্শন করা নিতান্ত প্রয়োজন। সাধুগণ আমাদিগকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যান।

পৃথিবীর পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি যতদিন সংসারাসক্ত থাকেন ততদিন তাঁহারা আমাদিগকে ঘোর নরকে ডুবাইতে চেষ্টা করেন। সংসারী মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগের সন্তানগণকেও সংসারী করিয়া লইতে চেষ্টা করে। অতএব যদি আমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিষয়ী আত্মীয় কুটুম্বদিগের দল হইতে মনে মনে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। কেন না পৃথিবীর পিতা মাতা গুরুজন ও স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই আমাদিগকে সংসারাসক্ত করিতে চেষ্টা করে। তাঁহাদিগের সঙ্গে আবদ্ধ থাকিলে ক্রমশঃ ধর্ম্মভাব দুর্ব্বল হয়। যে দলে থাকিলে ঈশ্বরের জন্য চিত্ত লালায়িত হয় আমরা সেই দলস্থ হইব। ঈশ্বরানুরক্ত ভক্ত যাঁহারা ভূতকালে ছিলেন এবং বর্ত্তমান কালে আছেন, তাঁহাদের দলে থাকিয়া আমরা বিপদ প্রলোভনের অতীত থাকিব। শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভ বলিয়াছেন, তিনি আমার পিতা মাতা গুরু এবং স্ত্রী বন্ধু নহেন, যিনি আমার মৃত্যুপাশ বিমোচনে সহায় হন না। ফলতঃ যিনি আমাকে বিষয়াসক্ত করেন তিনি আমার শত্রু। যাঁহারা আমার চিত্ত ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করেন তাঁহারাই আমার পিতা মাতা গুরু বন্ধু। সেই মহাত্মা সকল আমাদিগকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন অতএব তাঁহারাই আমাদের যথার্থ বন্ধু। সাংসারিক মমতা ছেদন করিয়া ঈশ্বরার্থী হইয়া যদি কুলের মধ্যে একজনও সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সেই একজনের দ্বারা সমস্ত কুল পবিত্র হয়। কারণ তাঁহার জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে তাঁহারা সকলেই স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট

জন। যদি আমরা ভক্তদলস্থ না হই তাহা হইলে আমরা প্রাণকে ঈশ্বরের নিকট রাখিতে পারিব না। দলস্থ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইবে। তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যথার্থ বন্ধুতা স্থাপন করা আবশ্যক—যাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে পাই।

বসন্তোৎসব। *

পূর্ণিমা, রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০০ শক;
৬ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় সুধাময় পরমেশ্বরের এক প্রকার প্রেম শরৎকালের পূর্ণিমাতে প্রকাশিত। তাঁহার অন্য প্রকার প্রেম বসন্তকালের পূর্ণিমাতে প্রকাশিত। শরৎকালে ভাগীরথীর উপরে বসিয়া ফল শস্য-দাতা ঈশ্বরের পূজা করিয়াছি। শারদীয় উৎসবের সময় শরৎকালের এক প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন বসন্তকালে আর এক প্রকার শোভা পৃথিবীকে শোভিত করিয়াছে। এই কালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অন্য কোন ঋতুর তুলনা হইতে পারে না। এই সময় সেই সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা আনন্দময় বিধাতার পূজা করিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হই। কেমন আশ্চর্য্য চিত্তবিনোদন দেবতা তিনি—যিনি অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া ভক্তের প্রাণ হরণ করেন! শরৎকালের নূতন ধান্য এবং ধন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ প্রকৃতির মুখশ্রী দেখিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছি,—"হে বিধাতা, তুমি এই পাপীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য, আমার এই পাপ দেহ পোষণ করিবার জন্য, এমন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সকল

শস্যপূর্ণ করিয়াছ এবং আমারই জন্য, তুমি গঙ্গাজল স্ফীত করিয়াছ। শরৎকালের শস্যক্ষেত্র এবং স্ফীত জল দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে বিস্মৃত হও নাই।” যিনি প্রত্যেক ঋতুতে অবিশ্রান্ত জীবের উপকার করেন সেই হিতসাধক দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কে শেষ করিবে? সেই উপকারী বন্ধুর কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বসন্তকালের একটা ফুল নয়নগোচর হইল। এই বসন্তের ফুলের কাছে শরৎকালের ধান্য হারিয়া গেল। ধান্য দেখিয়া বরং ভাবিতে পারি ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাঁহার ছেলেগুলিকে এক মুষ্টি অন্ন দিতেই হইবে। তাঁহার সন্তানগুলি কি অন্যের দ্বারে গিয়া বলিবে অন্ন দাও? এই দয়াতে অবাক্ হইতে হয় বটে, কিন্তু মনে হয় যেন সন্তানের পিতার অন্নে অধিকার আছে। কিন্তু যেখানে বড় বড় গোলাপ এবং গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুটিয়া আছে সে সকল বাগানে প্রবেশ করিলে আর কথা সরে না।

ঈশ্বরপ্রদত্ত এক মুষ্টি অন্নে আমাদের অধিকার থাকিতে পারে; কিন্তু এমন সুন্দর ফুলের সৃষ্টি হইল কেন? বিচিত্র বর্ণের ফুলগুলি আমাদের কি উপকার করে? ফুলের প্রয়োজন কি? ফুল কি লোকে খায়? ফুল কি ঔষধের জন্য? এই ফলবাদী এবং ফলাকাঙ্ক্ষী পৃথিবীতে ফুল আসিল কেন? বোধ হয় স্বর্গের জিনিস পথ ভুলিয়া এই কঠোর পৃথিবীতে আসিয়াছে। স্বার্থপর পৃথিবী ফুলের মর্য্যাদা জানে না। ফুল দেখিলে সাধুদিগকে মনে হয়। ঈশ্বরের হস্তরচিত ফুল স্বর্গের পবিত্রতা এবং স্বর্গের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে যে পৃথিবীতে জঘন্য ইন্দ্রিয়ের আমোদ, যেখানে

পাপের ভয়ানক দুর্গন্ধ সেখানে ফুল আসিল কেন? কেবল যে, দুই পাঁচটী ফুল তাহা নহে, পৃথিবী ফুলেতে পরিপূর্ণ, বিশেষতঃ এই বসন্তকালে চারিদিকে ফুলের সৌন্দর্য্য এবং ফুলের সৌরভ জগৎ আমোদিত করিতেছে। বাগানে ফুল দেখিতে পাই, তাহার অর্থ আছে; কিন্তু যেখানে মনুষ্যের হস্ত নাই সেই অরণ্য মধ্যে কে রাশি রাশি বিচিত্র বর্ণের ফুল সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন? বিধাতা জানিয়া শুনিয়া যেমন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে বলিলেন, তোমরা আমার জীব সকলের হিতসাধন করিবার জন্য অমুক অমুক সময়ে উদিত হইবে, তেমনই পুষ্পগণকে বলিলেন, তোমরা অমুক অমুক সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া আমার ভক্তদিগের প্রাণ হরণ করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে।

চিত্তবিনোদন সুন্দর ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার জন্য ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা কি বলিব পুষ্প সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না, বসন্তকালের কি প্রয়োজন? কেবল শীত বর্ষা হইলেই হইত? সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বর সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া জগৎকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন। সৌন্দর্য্য স্বর্গের দুর্ল্লভ সামগ্রী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কুৎসিত কঠোর মনকেও পবিত্র এবং সরস করে। বসন্তের পূর্ণিমার চন্দ্র, বসন্তের মধুর সমীরণ, বসন্তের পুষ্প এই তিন পদার্থই অতি সুন্দর। সমীরণ এক দিকে যেমন গগন হইতে সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্না বহন করিয়া আনিতেছে, তেমনই অন্য দিকে আবার পুষ্পোদ্যানের সৌরভ বহন করিয়া আমাদিগের নিকট লইয়া আসিতেছে। যে সমীরণ এমন সুন্দর জ্যোৎস্না এবং স্বর্গের সুগন্ধ বিস্তার করিল, সেই সমীরণের ন্যায়

এমন উপকারী বাহক আর কে কোথায় দেখিয়াছ? যখন এই তিন সংযুক্ত হইল তখন ভক্তকুলে মহা বিপদ ঘটিল। এক ফুলের আক্রমণই ভক্তেরা সহ্য করিতে পারেন না, তার উপর পূর্ণিমার চন্দ্র, তার উপর আবার সুগন্ধবহ সমীরণ। ইহারা সকলেই এমন নিষ্ঠুর যে, ভক্তকে স্বর্গে লইয়া যাইবেই, কোন মতেই তাঁহাকে ছাড়িবে না। বসন্তকাল ঈশ্বরের একটী প্রকাণ্ড অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মগণ, ইহা কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, পৃথিবীতে একখানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসন্তকালকে প্রেরণ করেন। বাছা বাছা সুন্দর জিনিসগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসন্তোৎসবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গৃহস্থের ঘরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধান্য, অন্ন এবং লক্ষ্মীশ্রী সঞ্চিত হয়, এ সকল চিন্তার বিষয় ছিল; কিন্তু বসন্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতেছি, আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর আনন্দোৎসব। আজ সুখবাদী সুখময়ের পূজা করিতে আসিয়াছেন। সেই দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হল হৃদয়ের আনন্দ। সেই দিন ধন ধান্য এবং আহারের কথা, আজ হইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথা। ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিধাতা ফল শস্য রচনা করিলেন; কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেন কেন? রাত্রে কেবল আলোক দেওয়া যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে তেজোময় কতকগুলি সূর্য্যকে আকাশে রাখিয়া দিলেই হইত, সুশীতল চন্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল? এ সকল প্রশ্নের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই

যে, ঈশ্বর আমাদিগকে ভালবাসেন। আর কোন যুক্তি নাই। আমাদিগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্যই তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য্য রচনা করেন, তিনি বায়ুকে এত সুমিষ্ট করেন এবং সমস্ত প্রকৃতিকে এইরূপ হাস্যপূর্ণ করেন। তিনি ভক্তদিগকে জানাইতে চাঁহেন যে তিনি তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু দিতে চাহেন। অন্ন এবং আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী যাহা আমাদের প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে চাহেন। এইজন্য তিনি পৃথিবীতে এমন সুন্দর বসন্ত ঋতুকে প্রেরণ করেন। ইহা তাঁহার প্রেমের ক্রীড়া, ইহা তাঁহার আনন্দের লীলা। যে সকল ভয়ানক লোক বসন্তকালকে অপবিত্র আমোদের কাল মনে করে তাহারা কি জঘন্য! এমন পবিত্র ফুলকে কি অপবিত্র স্থানে রাখিতে হয়? ধিক্ ধিক্ মানুষের মনকে! বসন্তকাল আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছে, বসন্তকালের অন্য অর্থ দেখি না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই বাহিরের বসন্ত আমাদিগের মনের বসন্ত হউক। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চিরবসন্ত, চিরসৌন্দর্য্য সম্ভোগ করি।

বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না; কিন্তু হৃদয়ের ভক্তি-ফুল, হৃদয়ের প্রেম-চন্দ্র, হৃদয়ের পুণ্য-হিল্লোল চিরকাল থাকিবে। ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটী সখা চাই, হৃদয়-নিকুঞ্জবনে সেই সখাকে লইয়া সুখী হইব। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ ব্রাহ্মদিগের এই আন্তরিক নিত্য বসন্তোৎসব গ্রহণ করুক! যতই এই অধ্যাত্ম বসন্তোৎসবে মত্ত হইবে ততই চিত্তশুদ্ধ হইবে। এত সুখের বসন্ত ঈশ্বর কেন

প্রেরণ করিলেন এই বলিতে বলিতে প্রেমে মত্ত হইয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সেই সখাকে আলিঙ্গন করিব। এই বসন্তের সুখ, হে জীবিতেশ্বর, তুমি আমাদিগের জন্য আনিয়াছ কি না বল? ঈশ্বর ভক্তের ভাব বুঝিয়া বলিতেছেন,—"ওরে ভক্ত, আমার প্রেরিত এই বসন্তের গূঢ় রহস্য তুই জানিয়াছিস, প্রাণ ভরিয়া তুই স্বর্গের সুধারস পান কর।" ভক্ত বসন্তের ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ফুল, তোমরা হাসিতেছ কেন? হে সুন্দর গোলাপ, হে চমৎকার বেলফুল, তোমরা কখনও কাঁদ না কেন? তোমাদের সহাস্য বদন দেখিয়া আমার প্রাণসখার প্রসন্ন মুখ স্মরণ হইতেছে।" ব্রাহ্ম, যখন তুমি সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ফিরিয়া আসিলে তখন পাঁচ জাতীয় পাঁচটী ফুল দেখিলে তোমার মন কি স্বর্গের দিকে, ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে ধাবিত হয় না? এইজন্য সাধকেরা চিরকালই প্রকৃতির পক্ষপাতী। আজ প্রকৃতি কেমন হাসিতেছে। আজ গগনের পূর্ণচন্দ্র এবং উদ্যানের পুষ্পগুলি হাত যোড় করিয়া ভাই ভগিনীদিগকে বলিতেছে, তোমরা সকলে প্রাণেশ্বরকে ডাক। আহা! ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিত্র!

প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম। বল দেখি ভাই, তোমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন কেন? তোমার দলের ভিতরে সেই আদি অনাদি পুরুষ হাসিতেছেন, তুমি তাঁহারই, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার পিতার হস্তের রচিত পুষ্প তুমি, তোমাকে আমার অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে যিনি রচনা করিয়াছেন আমি তাঁহার আরাধনা করি, তাঁহার গুণ-

কীর্ত্তন করি, এই বলিয়া কত গর্ব্বিত হই; কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখনও অহঙ্কার কর না, তুমি কখনও গর্ব্বিত ভাবে কাহাকেও উপদেশ দাও না, তুমি কেবল প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত হইয়া সমস্ত দিন সুগন্ধ দান কর, তোমার আড়ম্বর নাই, তুমি নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ বিস্তার কর। তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি শুনিতেও পাও না, আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি, তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি আমার গুরু হইলে। তুমি বড় সুন্দর; কিন্তু তুমি দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হও না। তোমার সহস্র ভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য্য যদি আমার থাকিত আমি কত গর্ব্বিত হইতাম। তুমি আমার বেদ হও, তোমার কোমল দলের ভিতরে তোমার নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত কোমল এবং লাবণ্যযুক্ত হয়, তুমি এইরূপ শিক্ষা দাও। ব্রাহ্মগণ, খুব গভীর ভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, যত জাতীয় পুষ্প আছে সকলের নিকট পবিত্রতা এবং কোমলতা শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমরা সহজে অতীন্দ্রিয় পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য-রসে মগ্ন হইতে পারিবে। বাহিরের বসন্তের তাৎপর্য্য বুঝিলে অন্তরের চিরবসন্ত দেখিয়া প্রমত্ত হইবে। যে দয়াময় সুধাময় পরমেশ্বর এই বসন্তোৎসব প্রেরণ করিলেন, তিনি চিরকালের জন্য আমাদিগকে তাঁহার অধ্যাত্ম বসন্তোৎসবে মত্ত করুন।

নব বর্ষ

ভবিষ্যতের সন্তান। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রথমে অসৎ, পরে সৎ, ক্রমে সত্য, সর্ব্বশেষে সত্যরাজ্য। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কাল-সমুদ্রের স্রোতে ক্রমাগত প্রবাহিত হইয়া দৌড়িতেছে। এক বৎসর চলিয়া গেল, এই এক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল। সকল চলিয়া যায় ; কিন্তু মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যতের সন্তানের নাম মনুষ্য। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, যতই পশ্চাতে যাইতেছ ততই অন্ধকার, এবং যতই সম্মুখে যাইতেছ ততই আলোক। এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পুর্ব্ব দিন কি ছিলে, এবং মাতৃগর্ভে জন্মিবার পুর্ব্বে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিবে, দেখিবে যতই ভূতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে, সমক্ষে আলোক। পশ্চাতে পাপরাশি, অজ্ঞান অন্ধকার, অসত্যের অন্ধকার, নানাপ্রকার অন্ধকার, আরও পশ্চাতে ঘোরতর অন্ধকার। এখন আমরা মানুষ হইয়াছি, ইহার পূর্ব্বে আমরা অজ্ঞান বালক ছিলাম, তাহার পূর্ব্বে জড়ের ন্যায় মাতৃগর্ভে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, এবং তাহার পূর্ব্বে একেবারে অসৎ ছিলাম অর্থাৎ ছিলাম না। ছিলাম না, বালক হইলাম, যুবা হইলাম, বৃদ্ধ হইলাম।

ঘোরান্ধকার মধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক আলোক দেখিলাম, কিন্তু তখনও পশু পক্ষীর স্থায় জ্ঞানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির আলোক দেখিলাম, তাহার পরে যখন ধর্ম্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম তখন ধর্ম্মের আলোক আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিল। অন্ধকার মধ্যে অসৎ ছিলাম, এখন চক্ষের আলোক, মনের আলোক, আত্মার আলোক এই ত্রিবিধ আলোক দেখিলাম। ঘোরান্ধকারের ভিতরে জন্মিয়া সূর্য্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, এবং ধর্ম্মের আলোক দেখিলাম, ভবিষ্যতে আরও কত আলোক দেখিব কে বলিতে পারে? যদি মাতৃগর্ভে মরিতাম পৃথিবীর আলোক দেখিতাম না, যদি শিশুকালে মরিতাম জ্ঞান এবং ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি ঈশ্বর আমাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর, নির্ম্মল হইতে নির্ম্মলতর আলোকরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। এই বর্ত্তমান আলোকের অবস্থাও আমাদিগের পূর্ণাবস্থা নহে, ইহা কেবল আমাদিগের ধর্ম্মজীবনের প্রাতঃকাল, এই জীবন ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের স্থায় আলোকময় হইবে।

*

আমাদিগের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। এইজন্য মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে সেই দিকে দৃষ্টি করিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমাদের ভবিষ্যতের আশা অতি প্রশস্ত আশা। আমরা ছিলাম না, সত্য হইয়াছি, পূর্ণসত্য এবং সত্যরাজ্য আমাদের সমক্ষে। যেমন যতই পশ্চাতে যাই ততই অন্ধকার হইতে ঘোরতর অন্ধকার আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে, তেমন যতই ভবিষ্যতের দিকে যাই ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক আমাদিগের চিত্ত রঞ্জিত

করে। পশ্চাতে যত যাইব মরণের অবস্থায় পড়িব, ভবিষ্যতের দিকে যত যাইব মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব না। এখন অল্প অল্প সত্য শিখিতেছি; কিন্তু ভবিষ্যতে, পূর্ণসত্য শিখিয়া নিত্যকালের সত্যরাজ্যে বাস করিব। এখন আমরা মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকদিগের মধ্যে বাস করিতেছি; ভবিষ্যতে সত্যবাদী সত্যপরায়ণদিগের নিকটে গিয়া উপনীত হইব। এখন এক একজনের উন্নতি দেখিতেছি; এক একজন সত্যপরায়ণ হইতেছে। ক্রমে ক্রমে যখন দশ জন সত্যপরায়ণ হইবে তখন ধরাতলে সত্যরাজ্য হইবে, অবশেষে সকলেই এই সত্যরাজ্যের প্রজা হইবে। সেই ভবিষ্যতের সত্যরাজ্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, বিরোধ পাপ তাপ থাকিবে না, সকলেই সদ্ভাবে সম্মিলিত হইয়া ঠিক যেন একখানি আত্মা এবং একখানি মনুষ্য হইবে। সত্যের জয় হইবে, সত্যবাদীর দল ক্রমশঃ প্রবল হইবে, সকলেই সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আলোক মধ্যে বিলীন হইবে। এইরূপ যতই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইব ততই আমাদিগের আশা বৃদ্ধি হইবে।

হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে? কি হইয়াছ? কি হইবে? যাহা হইবে তাহার তুলনায় যাহা হইয়াছে তাহা অতি অল্প। পরকালে গিয়া সত্যরাজ্যের সঙ্গে মিলিবে। তুমি হে সত্যের সন্তান, সত্যরাজ্যের অধিকারী। তুমি যত ভাবিবে তুমি কি হইবে তত বাঁচিবে, আর যত ভাবিবে তুমি কি ছিলে তত মরিবে। বিগত বর্ষ এবং নব বর্ষ—এই দুজনের পথে একবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা হইল; কিন্তু একজনের নৌকা উত্তর দিকে চলিতেছে আর এক জনের নৌকা দক্ষিণে চলিতেছে। পুরাতন বৎসর তাহার পূর্ব্বপুরুষ-

দিগের সঙ্গে গিয়া ভূতকালে বিলীন হইয়া গেল, নূতন বৎসর আমাদিগকে তাহার বক্ষের উপর লইয়া ভবিষ্যতের দিকে চলিল। পুরাতন বৎসরের মৃত্যু হইল; কিন্তু আমাদের জীবন বৃদ্ধি হইল। পুরাতন বৎসর আমাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বধামে অর্থাৎ অন্ধকার মধ্যে চলিয়া গেল, কারণ সে চলিল এক পথে, আমরা যাইব অন্য পথে। আমরা ভবিষ্যতের সন্তান, এইজন্য আমরা চলিয়া যাইতেছি। আমরা ভূতকালের বিষয় স্মরণ করিয়া নিরাশায় মরিবার জন্য জন্মি নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্যা করিল, আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্ম এ কথা বলিতে পারেন না। তাহারা ব্রাহ্ম নহে যাহারা বলে যতই আমাদের বয়স হইবে ততই বল উদ্যম নিস্তেজ এবং উৎসাহ ক্ষীণ হইবে। কত ব্রাহ্ম যাহারা আগে তেজস্বী ছিল এখন নিরাশ হইয়া বলিতেছে, আর পৃথিবী ভাল হইবে না, আর পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার হইবে না, আর কেহ ব্রাহ্ম হইবে না, এখন ক্রমে ক্রমে পৃথিবী পশ্চাৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পৃথিবীর অধোগতি হইবে। তাহাদের আপনাদিগের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এইজন্য তাহারা এরূপ নিরাশার কথা বলে।

যদি বর্ষশেষে আমাদের শেষ দেখি তাহা হইলে আমরা অন্ধকার অথবা নরকের দিকে যাইতেছি। যদি দেখি নব বর্ষের সঙ্গে নব জীবনের আরম্ভ হইল, তাহা হইলে বুঝিব আমরা আলোকের দিকে, স্বর্গের দিকে যাইতেছি। ব্রাহ্মগণ, যদি তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের গৃহ দেখিতে পাও তাহা হইলে নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনে জ্যোতির প্রয়াস বৃদ্ধি হইবে, এবং তোমাদের মন সহজে বলিবে সমস্ত পৃথিবী ভাল হইবে। যে ব্রাহ্ম দুঃখিত অথবা যিনি নিরাশার কথা

বলিলেন তাঁহার ধর্ম্মভাব নিস্তেজ, তিনি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করেন; কিন্তু বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে ঐ জ্যোতির্ম্ময় ঘরখানি দেখিতে পান। ব্রাহ্মগণ, তোমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবে, সেখানে তোমাদের চক্ষের সমক্ষে কোটী সূর্য্য দেখিতে পাইবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পাপ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু দুর্গন্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না। অতএব তোমরা পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়া ভবিষ্যতে গিয়া বসিয়া থাক। ১৮০০ শক চলিয়া গেল, কিন্তু সাধকগণ, তোমরা সেই পরলোকে, পিতৃলোকে বসিয়া সাধন ভজন করিতেছ। তোমাদের রাজ্যে নিত্য প্রেমচন্দ্র বিরাজমান, সেখানে অমাবস্যা আসিতে পারে না। যোগী ব্রাহ্ম, তুমি-বসিয়া আছ সেই মনোহর ঘরে। পিতার পাদপদ্মতলে তুমি বসিয়া আছ। ঐ বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উৎসাহের সহিত চলিয়া যাও। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিও না। পশ্চাতে খড়্গ, মৃত্যু। অগ্রগামী ব্রাহ্ম হইয়া অগ্রসর হও। ঐ ঘরে গিয়া সকলে ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিব, এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

কমলকুটীর।

দীক্ষিতা ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ। *

মধ্যাহ্নকাল, রবিবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় পরমেশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ব্রাহ্মপরিবারে সম্বদ্ধ করুন! তিনি তোমাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লউন! দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের শরীর, মন, আত্মাকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের মধ্যে রাখিয়া তোমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করুন! এই ভবসাগরে দয়াময় ঈশ্বর কাণ্ডারী হইয়া তোমাদের জীবন-নৌকাকে রক্ষা করুন! পরম পিতা তোমাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার ঘরে যাইতে ডাকিতেছেন, তোমরা সেই মধুর আহ্বান শুনিয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ কর। তাঁহার ঘরে তোমাদের প্রতিজনের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেই ঘরে গিয়া তোমরা প্রতিজনে আপন আপন স্থান গ্রহণ কর। সতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও। ব্রাহ্মিকা হইয়া আপন আপন পরিবার মধ্যে সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শান্তি বিস্তার কর। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন তোমরা বিশেষ ভক্তি ও উৎসাহের সহিত এই পবিত্র ব্রত পালন করিয়া কৃতার্থ হইতে পার। ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা আজ দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা পালন করিতে প্রাণপণে

যত্ন করিবে। তোমরা প্রতিদিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পূজা করিবে। তোমরা সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। রাগ প্রভৃতি মনের যত প্রকার কুৎসিত ভাব সমুদয় জয় করিবে। ঈশ্বরের পূজা সেবা করিয়া নারী কিরূপে শুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, তোমরা জগৎকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা নির্ম্মল সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা এত দিন যাহা ছিলে এখনও তাহাই রহিলে কদাচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে তোমরা যে শুদ্ধ ব্রত গ্রহণ করিলে তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়। আজ হইতে তোমাদের জীবন শুদ্ধ হইতে চলিল। এই চিত্তশুদ্ধি ব্রত তোমাদিগকে ব্রহ্মধামে, পুণ্যধামে লইয়া যাইবে। সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তোমরা সংসার করিও না। নির্ব্বিকার মনে, শুদ্ধভাবে তোমরা সংসার করিবে। কি ভৃত্য কি বড়লোক সকলেরই সেবা করিবে। ব্রহ্মকন্যা আজ বিশেষরূপে ব্রহ্মদাসী হইলেন। দাসীব্রত পালন করিলে পুণ্য হইবে; সুখ শান্তি পাইবে। শান্তি, শান্তি, শান্তি বলিয়া তোমরা সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ের ভূষণ করিবে। সকল অপেক্ষা ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরকে বড় জানিয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসে নির্ম্মল সুখ শান্তি লাভ করিবে। আরাম এবং তৃপ্তির জন্য আর কাহারও নিকটে যাইবে না। তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধর্ম্মের আনন্দ ভোগ কর, এবং তোমাদের প্রিয় যাঁহারা তাঁহাদিগের ও সমস্ত জগতের কল্যাণ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের সন্তানগণ, আজ তোমরা যথারীতি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্ম পরিবারে সম্বদ্ধ হইলে এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে। অদ্য তোমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের দিন। তোমরা ঈশ্বরের শান্তিধামের দিকে অগ্রসর হইতে চলিলে, আর তোমাদের পশ্চাতে মলিন সংসার আপনার পাপ দুঃখ লইয়া পড়িয়া রহিল। তোমরা একবার দয়াময় ঈশ্বরকে ডাক। যে নির্জীব ভাবে দীক্ষিত হয় সে দীক্ষিত হয় না। যে নিদ্রিত ভাবে দীক্ষিত হয় সে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ব্রাহ্মসমাজ চাহেন যে, তোমরা ব্রহ্মাগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া অপ্রতিহত যত্নের সহিত অদ্যকার ব্রত পালন করিবে। আর অপবিত্র হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। যে ব্রত ধরিলে প্রাণের সহিত সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদি সমক্ষে আসিয়া ভয় দেখায়, পৃথিবীর সকল লোক যদি শত্রু হইয়া খড়্গাহস্ত হয়, তথাপি ব্রত ভঙ্গ করিবে না। কি ব্রত? ভক্তিব্রত, পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, সুখী হইবে। ভ্রাতৃগণ, তোমরা নূতন পরিবার মধ্যে এস। আমরা আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে স্থান দিতেছি। তোমরা

আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মপূজা এবং ব্রহ্মসেবা করিয়া ধন্য হও। মনুষ্য-জীবনে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর কার্য্য নাই। ভ্রাতা ভ্রাতৃমণ্ডলীর সঙ্গে একত্র হইয়া সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলীর দুঃখ দূর করিবেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? ব্রহ্মভক্ত কেমন, ব্রহ্মযোগী কেমন, ব্রহ্মসেবক কেমন, তোমাদের জীবনে যদি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে। তোমাদের নৌকা আজ খুলিল। বন্ধুগণ, তোমরা মোহরজ্জু কাটিলে, সংসারাসক্তি ছেদন করিলে। আজ খুব প্রাণ ভরিয়া হরিনামের জয়ধ্বনি কর। কাজ কি আর এ সংসারের অসার ধন মান লইয়া? ঐ দেখ সমক্ষে দীনকাণ্ডারী তাঁহার চরণতরী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া ভবসাগরের উপর দিয়া শান্তিধামে চলিয়া যাও। তোমরা আর পৃথিবীর লোক রহিলে না। তোমাদের হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্গরাজ্য আসিল, তোমাদের গলায় আজ অমূল্য দয়াল নামের মালা পড়িল। তোমরা আজ স্বর্গের সুখ-সাগরে ভাসিলে। আজ দয়াময় "মাভৈঃ" "মাভৈঃ" বলিয়া তোমাদিগকে আশ্বাস বাক্য বলিতেছেন। তোমাদের গত জীবন বিনাশ করিয়া তিনি আজ তোমাদিগকে নবজীবন দিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ভক্ত, যোগী, ঋষি, সচ্চরিত্র সাধু সেবক করিবেন। তোমরা সরল হৃদয়ে কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। আর তবে তোমাদের ভয় ভাবনা নাই। সকলে গান কর;—"চল ভাই সবে মিলে যাই সেই পিতার ভবনে——।"

পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে।

রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ২০শে এপ্রেল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যের প্রখর কিরণ বিস্তার করিবে। এক দিকে রাখ ক্ষুদ্র বীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে উৎপন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বীজ, ভবিষ্যতের ফল পুষ্পে সুশোভিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কি দশ সহস্র বৎসর পরে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে তাহার তুলনা হইতে পারে? এখনকার সত্য প্রস্ফুটিত সত্য নহে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌরভ ও লাবণ্যযুক্ত পুষ্প ভবিষ্যতে দেখিব। সেই পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে। প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের ন্যায় যখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিবে, যখন এই ধর্ম্ম সকলের ঘরে অমৃত আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখনকার বিষয় ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, তাহা কি ভক্তি? এখন যাহাকে আমরা যোগ বলি, তাহা কি যোগ? অবশ্যই ভূতকালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে? যাহার মধ্যে পাঁচ সাতটী সত্য আছে তাহাকে কি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এইজন্য ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি যে, এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

এই ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে এমন সকল গূঢ় সত্য উদ্ভাবন করিবে যে, তদ্দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র নিঃশ্বাস বাহির করিয়া লইবে।

এখন আমরা বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সকল ধর্ম্মের ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর দেখিতেছি। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম অন্য অন্য নামে পরিচিত হইতেছে, সে সমস্ত ধর্ম্মে আমাদেরই ধর্ম্মের সত্য রহিয়াছে। সে সকল ধর্ম্ম একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিবে, সকল ধর্ম্ম এক স্থানে আসিয়া একত্র হইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ভাবন করিবে। এক স্থানে সকল জাতি একত্র হইয়া দলবদ্ধ হইবে।

যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্তু যখন সূর্য্য দ্বিপ্রহরের পূর্ণ আলোক বিস্তার করে, তখন আর প্রাতঃকালের আদর কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন প্রাতঃকাল। এখনও ব্রাহ্মদিগের ভক্তি-প্রধান ভক্তদিগের প্রগল্‌ভ্য অবস্থা লাভ হয় নাই, এখনও ব্রাহ্মগণ যোগশ্রেষ্ঠ যোগীদিগের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র যথার্থ ব্রহ্মচারীদিগের নিকট নিকৃষ্ট। ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের তুলনা হয়? এখনকার ভক্তদিগের দুই পাঁচ ফোঁটা অশ্রু কি ভবিষ্যতের ভক্তদিগের নিকট ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে? পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যে সকল যোগী ভক্ত আসিবেন তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা দাঁড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম, তুমি লজ্জিত হও। তুমি যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তবে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা জান না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ভবিষ্যতে আসিবেন, ছোট ভ্রাতাদিগের পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছে। বিপরীত কথা! কিন্তু ইহাই সত্য কথা।

শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে আসিবেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধেরা আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ভবিষ্যতে আসিতেছেন। তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে, পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল গূঢ় তত্ত্ব সকল এখনও আমাদের নিকট আসে নাই। ভূতকালের দিকে তাকাইব না। ভবিষ্যতের পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে যাহাদের জ্যোতি পৃথিবীতে এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই। সেইরূপ স্বর্গে এমন সকল সত্য গোপনে রহিয়াছে, পৃথিবী এখনও পর্য্যন্ত যাহার আভাস পায় নাই। অতএব যোগের পথ, ভক্তির পথ, কর্ম্মের পথ শেষ হইয়াছে, কেহই এরূপ কথা বলিও না। ভবিষ্যতে মনুষ্যমণ্ডলী হইতে প্রকাণ্ড বৃহৎ ব্রতধারী যোগী সকল, ভক্ত সকল, কর্ম্মী সকল বাহির হইবেন। এক একজন সত্য-সাগরে মগ্ন হইয়া অমূল্য সত্যরত্ন সকল উদ্ভাবন করিবেন। কেহ যোগতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ নীতিতত্ত্ব, কেহ সেবাতত্ত্ব ইত্যাদি মন্থন করিয়া নূতন নূতন সত্যামৃত উদ্ধার করিবেন।

এ সকল সাধনের জন্য তোমাদের মধ্যে কয় জন লোক আপন আপন জীবন উৎসর্গ কর। সকলেই ত ধন, মান, সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতেছে। প্রচারকেরাও আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এমন সকল লোকের প্রয়োজন হইয়াছে যাঁহারা কি সংসার সাধন, কি প্রচার এই দুই পরিত্যাগ করিয়া কেবল

প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা আবিষ্কার করিবেন। এইরূপে যদি দুই একজন লোক যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আগমন সম্বন্ধে সহস্র বৎসরের ব্যবধান হ্রাস হইবে। গৌণ হইবে না। এ কেবল সাধকদিগের দ্বারা হইতে পারে। কয়েক জন গভীররূপে রত্নাকরে প্রবেশ না করিলে রত্ন লাভ হইবে না। এস, আমরা সাধক হইয়া সে সকল রত্ন তুলিয়া লই। কতকগুলি লোক যোগ ভক্তি ও সচ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা, জগতের অভাব। দিবা নিশি তোমরা সাধন কর, সাধনে তোমাদের জীবন শেষ হউক। যাঁহারা জগতের কল্যাণের জন্য সাধন করিবেন, পৃথিবী তাঁহাদের পরিবারের ভার লইবে। এক এক সাধক বহুমূল্য রত্নের ন্যায় আদৃত হইবেন। সাধকেরা দেশে দেশে যাইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকলে আসিবে। তাঁহারা ঘুরিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের চারিদিকে ধর্ম্মপিপাসু লোকেরা ঘুরিবে। তাঁহাদের জীবন ভাল হইবে, জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে বড় বড় যোগী, ভগবদ্ভক্ত প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। যতই এ সকল বিচিত্র প্রকৃতির ব্রাহ্মেরা জন্মগ্রহণ করিবেন, ততই ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীকে শুদ্ধ করিবে; আমরাও শুদ্ধ এবং সুখী হইব।

বিচিত্রতা।

রবিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক; ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বিশ্বরাজ্যে কেবলই বিচিত্রতা। বিচিত্রতা, ভিন্নতা, জগতের সৌন্দর্য্য। যেখানে বিচিত্রতা নাই সেখানে ঈশ্বরের হস্ত নাই। ভূলোকে দ্যুলোকে সর্ব্বত্র কেবলই বিচিত্রতা। এক ঈশ্বরের হস্ত হইতে কিরূপে এমন বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইল? মনুষ্য এই বিচিত্রতার মধ্যে স্রষ্টার কৌশল দেখিয়া স্তব্ধ হয়। যদি ভৌতিক জগতে বিচিত্রতা সৌন্দর্য্যের হেতু হইল, তবে ধর্ম্মজগতে বিচিত্রতা কেন না থাকিবে? সকলের মুখ বিভিন্ন প্রকার, তবে সকলের আত্মা কেন বিভিন্ন না হইবে? কি ধর্ম্মজগতে কি ভৌতিক জগতে বিভিন্নতা অনিবার্য্য। চেষ্টা কর সকল নক্ষত্রকে এক প্রকার করিতে পারিবে না, চেষ্টা কর সকল মনকে এক প্রকার ভাবে গঠন করিতে পারিবে না। দশ জন মনুষ্যকে খুব যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার শাসনের অধীন রাখ না কেন, সেই দশ জন মনুষ্য দশ প্রকার চরিত্র লাভ করিবে। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে তাহাদিগের সংস্কার, ভাব, গতি, রুচি বিভিন্ন। ঈশ্বর বলিয়াছেন ধর্ম্মরাজ্য এক হইও না, বিভিন্ন হও। আমরাও ধর্ম্মরাজ্যে বিচিত্রতা দেখিতে অভিলাষ করি; বিভক্ত দলকে অভ্যর্থনা করি। যেমন যদি বীজ অবিভক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে শস্য বৃক্ষ জন্মে না, সেইরূপ ধর্ম্ম যদি ভিন্ন ভিন্ন দলে না ভাঙ্গে, তাহা হইতে নূতন নূতন সহস্র প্রকার ভাব উৎপন্ন হয় না। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারাই ধর্ম্মকে সিন্দুকের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া বলে, সাবধান, সাবধান, ধর্ম্মকে বিভক্ত হইতে

দিও না। তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না। যথার্থ ধীর ব্যক্তিরা বলিবেন, স্বর্গ হইতে সুধার কলস আসিয়াছে, ইহা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে যে রত্ন আছে তাহা বিভাগ কর। না ভাঙ্গিলে রত্ন পাইবে কিরূপে? সুধাপাত্র ভাঙ্গিয়া লোকে তাহা হইতে সুধা লইয়া নানারূপে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে!

শস্যক্ষেত্রে বপন করিলে ভাঙ্গিয়া সহস্র লোকের আহারের আয়োজন হয়। এক জল কত স্থানে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া জীবদিগের অভাব মোচন করিতেছে। যাঁহারা জল বিভাগ করিতে জানেন তাঁহারা জানেন জলের ভিতরে কি কি বস্তু আছে। যদি পৃথিবীতে এক দল সাধক থাকে, আমার ইচ্ছা, ব্রাহ্মবন্ধু, তোমারও ইচ্ছা যে সেই সাধকদল সহস্র প্রকারে সাধন করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে সকলেই এক প্রণালী অনুসারে সাধন করে। অন্ধেরা যেমন সৃষ্টির বিচিত্র বস্তু সকল দেখিতে পায় না, কেবল এক প্রকার অন্ধকার দেখে, ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে সেইরূপ অন্ধতার একতা স্থাপন করিতে চাহেন না। আমরা অন্ধতা এবং মৃত্যুর ঐক্য চাহি না। জীবন্ত ব্যক্তি যাহারা, তাহারা বিচিত্রতাকে অভ্যর্থনা করে। যাহাদের চক্ষু আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ দেখিবে এই বস্তু, কেহ দেখিবে ঐ বস্তু। জীবন্ত মনুষ্যদিগের কার্য্যপ্রণালী, চিন্তাপ্রণালী, আশার প্রণালী, এ সমস্ত বিভিন্ন হইবে। ঈশ্বরের হস্ত রচিত স্বভাব বিচিত্রতা চায়। সেই স্বভাবের উপর একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর চাপাইয়া দিও না। সূর্য্য চন্দ্র হইবে না, ভক্ত যোগী হইবে না, অতএব আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সাধনের বিচিত্র পথ যেন অবরুদ্ধ না করি। যাহারা বলে আমাদের যে মত তোমাদিগকেও

ঠিক সেই মত অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারা ধর্ম্মের গূঢ় উদার তত্ত্ব জানে না। যাহারা পরস্পরের অনুকরণ করে তাহারা অন্ধ, তাহারা মৃত। যদি আমাদের অধোগতি হয়, যদি আমরা মৃৎপিণ্ড হই, তাহা হইলেই আমরা বিচিত্রতা বিহীন হইব। যদি জীবন থাকে, যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে আমরা বিচিত্র পথে ধাবিত হইব, এই ঈশ্বরের আজ্ঞা। তোমার রুচি আমার রুচির সঙ্গে মিলিবে না, তোমার সাধনপ্রণালী আমার সাধনপ্রণালীর সঙ্গে মিলিবে না। তুমি জ্ঞানী ব্রাহ্ম, আমি মূর্খ। তুমি এক দেশীয় আমি এক দেশীয়। আমি যদি তোমাকে বলি তুমি আমার মত লও, তবে আমি ভয়ানক অত্যাচারী মনুষ্য। আমি যদি ঠিক ঈশ্বরের অনুগত দাস হই, তাহা হইলে আমি কখনও কাহার স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া তাহাকে আমার পথে আনিতে চেষ্টা করিব না। সকলকে সত্য দিব, সকল হইতে সত্য গ্রহণ করিব, কিন্তু কাহারও স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিব না। আমার ইচ্ছা, বোধ করি তোমাদেরও ইচ্ছা, আমরা এই বিচিত্র সাধন গ্রহণ করি।

প্রতিজনের পক্ষে তাহার রুচি এবং ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমরা মনে করিয়া থাক সকল সাধকেরাই এক প্রকার হইবে, এই পৃথিবীতে কোন একটী ব্রহ্মমন্দির থাকিবে, আর মন্দির হইবে না, এই মন্দির অদ্বিতীয় থাকিবে, তবে তোমরা মনুষ্য-প্রকৃতি জান না। ঈশ্বর বিচিত্রতা-প্রিয়। তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে নূতন নূতন সাধনপ্রণালী সকল প্রকাশিত হইবে; নূতন শ্রেণীর লোক সকল আসিবে। তোমাদের পুত্র পৌত্রেরা তোমাদের মতে থাকিবে না। যাহারা মনে করে বংশ-

পরম্পরায় এক রকম চলিবে, তাহারা মনুষ্যকে পশুর ন্যায় মনে করে, তাহারা নূতন ভাব উদ্ভাবন করিতে পারে না, এবং নূতন ভাবের সম্ভাবনা দেখিতে পায় না। কিন্তু মনুষ্য-প্রকৃতির সহস্র পন্থা আছে। আজ পর্য্যন্ত শক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ ভাঙ্গিল না। আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয়টা ব্যতীত দল হইল না। যদি এক শত দল হইত তবে বুঝিতাম ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ ভাঙ্গিয়াছে। চারি সহস্র বৎসর পরে আবার কি ঋষি-ভাব দেখিতে পাইব না? আবার কি শত শত ভক্তদল একত্র হইয়া ভক্তি সাধন করিবেন না? আবার কি শাস্ত্র-কারেরা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে সত্য সকল সংগ্রহ করিবেন না? আবার কি কর্ম্মীদল প্রাণপণে পারিবারিক সামাজিক প্রভৃতি কর্ত্তব্য সকল সাধন করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না? আমরা কি দেখিব না যে, আর এক স্থানে বৈরাগীদল ধন মান সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া গালে হাত দিয়া হাসিতেছেন "আমি আর আমি রহিলাম না, আমি ব্রহ্ম-হস্তগত হইয়াছি।" এ সকল সম্প্রদায় আমরা দেখিব। সাধকদল এরূপ বিভাগে বিভক্ত হওয়া আবশ্যক। আবার সেই একটী একটী দলের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম মত আবিষ্কৃত হইবে। আবার এমন কতকগুলি লোক বাহির হইবে যাহারা দুই দলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। সকলে যোগী বৈরাগী হইবে না, সকলে জ্ঞানী হইবে না, সকলে ভক্ত হইবে না।

ব্রাহ্মগণ, সাধনের তত্ত্ব তোমরা এখনও প্রকাশ কর নাই। বিচিত্রতা বিনাশ করিতে চেষ্টা করিও না। যাঁহাদের দক্ষিণ বাহু পরাক্রমশালী তাঁহাদিগকে বাহুবল প্রকাশ করিতে দাও। যাঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর তাঁহাদিগকে বিবিধ শাস্ত্র হইতে

লাবণ্যময় সত্য সকল সংগ্রহ করিতে দাও। যাঁহারা জন্মিয়াছেন যোগী হইবার জন্য তাঁহাদিগকে যোগী হইতে দাও, যাঁহারা জন্মিয়াছেন ভক্ত হইতে তাঁহাদিগকে হরিনাম করিতে এবং চৈতন্য প্রভৃতি সাধুদিগকে ডাকিতে দাও। তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে। এক রকম হইব কেন? এক পথে চলিব কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা মনুষ্যের স্বভাব বিচিত্র হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য, তুমি কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একতা স্থাপন করিতে চাও? ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধকগণ বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে সাধন করুন। এইজন্য ব্রহ্মমন্দির বেদী হইতে এই ভবিষ্যৎ বাণী বলিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ হইতে শত সহস্র সাধক দল প্রস্তুত হইবেন। চারি পাঁচটী দল হইলে ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব। এক সূর্য্য সহস্র সহস্র রশ্মি বিস্তার করিতেছে, সেইরূপ এক ধর্ম্ম সহস্র সহস্র প্রণালীতে মনুষ্য জাতির অভাব সকল দূর করিবে। এক সঙ্গীত-শাস্ত্রই কত প্রকার আকার ধারণ করিবে। এক সমুদ্রের জল পাত্রের বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে সাদা, কাল, সবুজ হয়। সেই সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা পৃথিবীতে থাকিতে দিব না— যাহার ভিতরে বিদ্বেষ ঘৃণা আছে। বিদ্বেষ, ঘৃণা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। সুতরাং তাহাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। যে দলভুক্ত হব সেখানে অন্য সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা দূরে থাকুক বরং অধিক শ্রদ্ধা করিতে শিখিব। দশ সহস্র ভাই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহার পরের পরিধিতে দশ কোটী ভাই বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া গান করিতেছেন; কিন্তু সেই যে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে গান করিতেছিল, শেষে হইল এক সঙ্গীত! এক হইতে উৎপত্তি একে লীন, কেবল সাধন বিভিন্ন।

ঋণ পরিশোধ।

রবিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮০১ শক; ৪ঠা মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যে ব্যক্তি ঋণী সে যদি একটী দুইটী টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য দান করে, তাহা হইলে তাহার তত সুখ হয় না। ঋণের অত্যন্ত গুরু ভার যদি মস্তকে থাকে, তবে দুই পাঁচ টাকা শোধ করিলাম ভাবিয়া কিরূপে শান্তি হইবে? সমুদ্রের সমান ঋণ, পাঁচ টাকা দেওয়া আর পাঁচ ফোঁটা জল তুলিয়া ফেলা একই। ইহা আলোচনা করিয়া কি মন স্থির হইতে পারে? অনেক দূরের পথ চলিতে হইবে, দুই হাত পথ চলা হইল, ইহা ভাবিয়া কি আর সে পথিকের আনন্দ হয়? ঋণের গুরু ভার মস্তকে রহিয়াছে, বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাতে মন কিছুতেই লঘু হয় না, হৃদয় আনন্দ অনুভব করে না, এ কথা সকলেই জানেন। ব্রহ্মের প্রেমের ভারে আমরা সকলেই ঋণী, তাহাতে যদি প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করি, দুই একটী প্রিয় কার্য্য করি, দুইবার চারিবার সত্যতত্ত্ব প্রচার করিতে যত্ন করি, তাহা হইলে কি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয়, না কিছু করিতে পারিলাম না বলিয়া অনুতাপ উপস্থিত হয়? ঋণ যে কিছু শোধ হইল ইহা ত কিছুতেই মনে হয় না। সামান্য কাজ করিয়া, কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কিছু হইল, ইহা ত বুঝিতে পারি না।

আর কিছু ধারি না, এ কথা বলিবার উপায় নাই। যে ঋণী সেই ঋণী রহিলাম, কিছু আদায় দিতে পারিলাম না। দশ বৎসর পর যেমন ঋণ তেমনই রহিল। ব্রহ্ম হয় ত কিছুই পাইলেন না। বোধ হয় কিছু দেওয়া হয় নাই, ঋণ সমানই আছে। ঋণ করিয়া

কিছু পরিশোধ না করা—আমাদের সেই অবস্থা। হাজার উপাসনা করি, উৎসবে যোগ দিই, সাধু কার্য্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, জ্ঞান লাভ করি, হাজার পরোপকার করি, অপরের দুঃখ দূর করি, শেষে গণনা করিয়া বুঝি কত অল্প ঋণ শোধ হইল। এইজন্য ভক্তেরা অনুগত হইয়া একেবারে কিছু থোক টাকা আদায় দিতে চেষ্টা করেন। এত বড় ঋণ, একদিন কিছু বিশেষ আদায় দিতে পারিলে সন্ধ্যার সময় ভাবিয়া কিছু সুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যদি কিছু বিশেষ আদায় দিতে পারি, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন ভক্ত ভক্তিতে অশ্রুপূর্ণ হন, শেষে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য উন্মাদ হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। লোকে যে প্রচারক হয়, ঈশ্বরের নামগুণকীর্ত্তনে জীবন কাটায়, তাহার মূলে এই ভাব নিহিত আছে। কত কাল ঋণ করিতে করিতে শেষে আর ঋণের দায় সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্ত বাহির হইয়া পড়েন। ঋণীর ন্যায় কে দুঃখ ভোগ করে? সেই ভক্ত যদি কিছু আদায় দিতে পারেন, এই ভাবিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হন।

কোটী অগণ্য বিধাতার মঙ্গল ভাব। আমাদিগকে তিনি কত প্রকারে সুখী করিলেন। আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্ম দিলেন, পরিবারে সংসারে সুখ সান্ত্বনা দিলেন, বিঘ্ন বিপদ দূর করিলেন, মোহের বন্ধন মোচন করিলেন। এত ঋণ-ভারাক্রান্ত যাহারা তাহারা আর সে ভার কত কাল সহ্য করিবে? এই ভাবিয়াই তাহারা পাগলের ন্যায় ঋণ শোধ করিতে বাহির হয়। ঋণে অত্যন্ত কষ্ট হয়। কি! লক্ষ বৎসরে এক পয়সা পরিশোধ করিব, ইহা ভাবিতেও পারা যায় না।

দেখি একবার ঋণ শোধের জন্য চেষ্টা উদ্যোগ প্রকাশ করি। প্রাণের ভিতর যত যত্ন অনুরাগ আছে, একত্র করিয়া সাধক ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন, প্রদক্ষিণ করিলেন, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন ঈশ্বর ক্ষমতা না দিলে কিছুই করিতে পারেন না, কিছুতেই ঋণ পরিশোধ হইবে না ; ক্ষুদ্র মন কিছুই করিতে পারিবে না। এক টাকার স্থলে দশ টাকা দিতে পারিলে মনে আনন্দ হইবে এই ভাবিয়া লোকে প্রচারক হয় ; পথে পথে হরিনাম করিয়া বেড়ায়, হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়। যিনি সন্তানবৎসল তাঁহার সন্তান সকল হরিনাম বিনা কষ্ট পায় দুঃখ পায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়ে অধীর হয়, ইহা হইবে না। এই বলিয়া পৃথিবীর সুখ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বাহির হয় ; ধার শোধ করিবার জন্য প্রাণ অর্পণ করে। যশ মান ধন সুখ্যাতি লাভের জন্য নহে, কেবল এইজন্য লোকে প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। ঋণের কথা ভাবিলেই কাহার না মনে এরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ?

হে ব্রাহ্মগণ ! তোমাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি ঈশ্বরের নিকটে ঋণী নাই ? সংসারে যদি ঋণ থাকে, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য আমরা কত যত্ন করি, কতবার ভাবিয়া আকুল হই। ব্রহ্মের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য কেন ব্রাহ্মের প্রাণ আকুল হয় না ? এমন আকুলতা প্রচারকের ব্রতে যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদিগের মধ্যেও দেখিতে পাই না। পৃথিবীর জন্য যাহাদের চক্ষে জল পড়ে না, ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য পথে পথে বেড়ায় না, হরিনাম দেয় না, হরিনাম কাহাকেও শুনায় না, আজও যাহাদিগের ঋণ পরিশোধের ভাব হইল

না, আজও যাহারা দু পাঁচ শত লোককে ডাকিয়া আনিতে পারিল না, তাহারা প্রচারব্রত পালন করিবে কি প্রকারে? বল ঋণ পরিশোধ করিতে কাহার মন ব্যাকুল হয়? ব্রাহ্ম, তুমি কি প্রচারকের হস্তে ভার দিয়া নিজে অপবিত্র ভাবে সংসার করিবে? ব্রাহ্ম! তুমিই প্রচারক। তুমি যদি ঋণী নও মনে কর, তোমার প্রেম-নয়ন নাই, তুমি অন্ধ। তুমি কি জান না, তুমি যে অন্ন খাও সে অন্ন ধার করা, তোমার যে বাহুবল সে বল ব্রহ্মের বল ধার করা, তোমার যে টাকা পয়সা এ সমুদয় ঋণ করা টাকা পয়সা। ধার করিয়া তুমি অন্ন খাও, ধার করিয়া তুমি দুগ্ধ পান কর, ধার করিয়া তৃষ্ণার জল পান কর, ধার করিয়া বন্ধুতার সুখ সম্ভোগ কর, ধার করা শয্যায় রজনীতে শয়ন কর। ধারে তোমার জীবন আরম্ভ, ধারে তোমার জীবন শেষ। বৎসর তোমার ঋণে আরম্ভ, বৎসর তোমার ঋণে শেষ। তুমি ঋণে ঋণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছ। যথন এত ঋণ তথন তোমাদের প্রাণ ব্রহ্মেতে একেবারে সমর্পণ কর, মন্দিরের বেদীর এ কথা বলিবার অধিকার আছে। তোমরা ঋণ পরিশোধের কি উপায় করিলে বলিতে হইবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋণ ভারি হইতেছে পরিশোধের কি উপায় হইল? উপাসনা করিলাম, বই পড়িলাম, নির্জনে হরিনাম সঙ্কল্প করিয়া উচ্চারণ করিলাম, ঋণ পরিশোধ এইটুকু চেষ্টাতে হইতে পারে না। লক্ষ টাকা যেথানে ধার, সেথানে মহাজনকে দু পয়সা পরিশোধ দিয়া কি কোন ব্যক্তি সুখী হইতে পারে? তুমি কি প্রকারে সুখী হইতে চাও, কেবল নাম করিয়া স্মরণ করিয়া শান্তি হইল তাহাতে কি হইল? তুমি সুখী হইতে পার না, সুখী হওয়া সম্ভব নহে। চিন্তা কর না তাই

সুখী। তুমি ধারে বিক্রয় হইয়া গেলে, ঋণে ডুবিয়া গেলে উহার পরিশোধের উপায় কর। প্রচারব্রতে যোগ দাও। নর নারী সকলকে বলিতেছি, তোমরা ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও। নারীগণ তোমরা যে সকল অলঙ্কার পাইয়াছ, পুরুষগণ তোমরা যে সকল গুণ পাইয়াছ, তাহা এইজন্য যে সমুদয় সঞ্চিত ধন ব্রহ্মের পাদপদ্মে দিয়া সুখী হইবে। দুখানি অলঙ্কার দু পাঁচটী টাকা যাহা দিতে পার দাও, ইহাতে এ বলিয়াও ত সুখী হইতে পারিবে অন্ততঃ দুটী টাকা পরিশোধ দিয়াছি। ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিলে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবে। অতএব ব্রাহ্ম! উৎসাহ-অগ্নিতে প্রজ্বলিত হও উত্থান কর, ঋণের কষ্ট আর যাহাতে না থাকে তজ্জন্য যত্নশীল হও।

এমন সময় আসিতেছে যে সময় পুরুষ কেন সকল নারী না হয় অত্যল্প সংখ্যক নারীও প্রচারের জন্য ব্যাকুল হইবে। এক অংশ যখন জীবন উৎসর্গ করিল, তখন অন্য অংশ কেন জীবন উৎসর্গ করিবে না? চারিদিক দগ্ধ হইল। এই ঘোর কলিকালে ঘরে ঘরে কত পাপ কত অধর্ম্ম! ঈশ্বর! তোমার অন্ন খাইয়া চুপ করিয়া নিদ্রা যাই, আর এরূপ থাকিতে পারি না। উৎসাহী হইয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা দাও। এমন ভক্তি সঞ্চয় করিতে যত্ন করি যাহাতে নিয়ত অশ্রুপাত হয়, ব্যাকুলতা হয়, প্রেম সম্ভোগ হয়। কিছুদিন এরূপ না করিলে কিছুতেই অন্ন খাইতে পারি না। অলঙ্কার পরিধান স্ত্রীর সম্বন্ধে অত্যন্ত পাপ। অন্ন পান বস্ত্র অলঙ্কার আমাদের কিছুতেই অধিকার নাই। এ সকল আমরা কিসের জন্য পাই? শুদ্ধ নিজের কল্যাণের জন্য না কোটী কোটী লোকের কল্যাণের জন্য? আমরা ক্রমে কত খাইলাম পরিলাম,

কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কি কিছু দিতে পারিলাম? দু একটা গান করিয়া তুষ্ট হইলে কি হইবে? সমুদয় দিনের মধ্যে একটু উপাসনা করিয়াই বা কি হয়? এত দিন গেল কই নামে মত্ত হইতে পারিলাম? কই সমুদয় প্রাণ প্রেমে প্লাবিত হইল? কই সকলকে ত সরল ভালবাসা দিতে পারিলাম না? আমাদের হিসাবী বুদ্ধি, আমরা সাবধান হইয়া একটু একটু ধর্ম্ম সাধন করি। পাছে ক্ষতি হয় এই ভয়ে আমরা অগ্রসর হইতে চাই না। এই কি আমাদের ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ ভাব? যাঁহার প্রেমে প্রতি দিন প্রতিপালিত হইতেছি, যিনি এমন সুন্দর সুন্দর সত্য দিলেন, যাঁহার করুণায় আমাদিগের কত সৌভাগ্য, সেই ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারি না। তিনি অসীম উপকার করিয়া আমাদিগকে ভয়ানক ঋণ-জালে আবদ্ধ করিতেছেন। এত সত্যরত্ন দিলেন, এত ভাল ভাল বন্ধুতে পরিবেষ্টিত করিলেন, এত সাধু সঙ্গ এত সকল সৌভাগ্য দিলেন, এমন কি আপনি দর্শন পর্য্যন্ত দিলেন, এখন কি বলিব, "হে হরি! আর দেখা দিও না, ধন দিও না, দয়াতে অভিষিক্ত করিও না।" তিনি বলেন, "দেখিবে আরও কি করি।" এত ধন রত্ন দিয়াছি আরও কত দিব। তাঁহার কৃপায় হস্ত পদ বদ্ধ, মন অবাক, হৃদয় আর্দ্র হয়। তিনি এত করিলেন, অথচ পৃথিবী মরিতেছে দেখিয়া তাহার দুঃখ মোচন করিব না? পৃথিবী যে আমাদিগকে অধার্ম্মিক সম্প্রদায় বলিবে। আমরা কি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সামান্য চেষ্টাও করিব না? আমরা এই ভাবেই অবস্থান করিব?

তোমরা দেরি করিতেছ, ইহাতে তোমাদের ঋণ বাড়িতেছে, শীঘ্র ঋণ যে ভারবহ হইবে। ঈশ্বরের নিকট সরল অন্তঃকরণে আপনার

অবস্থা জানাইয়া ঋণ পরিশোধের উপায় কর। নতুবা কি বিপদ ঘটিবে আজ জান না, যে দিন চক্ষে চক্ষে মিলন হইবে, সে দিন ঘরে থাকিতে পারিবে না, উন্মাদ হইয়া বাহির হইতে হইবে। সমুদয় ধন পরিশোধ করিতে গিয়া বুকের রক্ত দিতে হইবে, জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইবে। যদি হয় নাই হইবে, পাপীর শুভদিন আইসে নাই, আসিবে। এমন দিন আসিবে না মনে করিও না। কত উৎসব সম্ভোগ করিলাম, কত সত্য শিখিলাম, কত তাঁহার প্রেমলীলা দেখিলাম, প্রাণমন্দিরে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া কত সুখ শান্তি পাইলাম, বন্ধু বান্ধব কত আনন্দ দিলেন, এ সকল হিসাব পুস্তকে জমা হইতেছে, ঠিক দিলে কত ঋণ জমা হইয়া পড়িবে। এ সকল পরিশোধ করিবার জন্য একদিন আকুল হইতে হইবে, অস্থির হইয়া কাঁদিতে হইবে, বুকের রক্ত দিতে হইবে। ঋণদায় বড় দায়, পৃথিবীর টাকা ধার করিয়া কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। প্রেমের ঋণ মানুষকে একেবারে অস্থির করিয়া দেয়, কিছুতেই পরিশোধ হয় না। হাজার যত্ন করিয়াও, কিছু হইল না কিছু হইতে পারে না, এই বলিয়া কেবল রোদন করিতে হইবে। এ ঋণ পরিশোধ বুকের রক্ত না দিলে হয় না, উন্মাদ না হইলে হয়, না। প্রেমের ঋণ আদায় দিতে হইবে যে দিন মনে হয় সে দিন আর লোক ঘরে থাকিতে পারে না। মানুষ প্রচারক হয় কি জন্য, ভক্ত যোগী হয় কি জন্য, সর্ব্বত্যাগী হয় কি জন্য, প্রেমের ঋণে ব্রহ্মের ঋণে বাধ্য হইয়া সর্ব্বস্ব দেয়। তোমার আমার সকলকেই সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। নর নারী সকলকে নূতন ভাবে প্রচারকব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। মূঢ়েরাই প্রচারক নাম এক স্থানে আবদ্ধ রাখে।

প্রচারক আর কিছু নহে, দেশ বিদেশে সময় ও ক্ষমতানুসারে কেবল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ, ধর্ম্ম ও অমৃত বিতরণ। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি হয়। ঋণ পরিশোধের সেই কথা ভাবিয়া আমরা নিশ্চয়ই সুখ লাভ করিব। যাহার যে গুণ আছে ভাবুন, কত ঋণ আছে মনে করিয়া দেখুন, আর ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন তাহা করুন।

সপরিবারে ব্রহ্মসাধন। *

রবিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক; ১১ই মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দুধর্ম্ম রত্নাকর, ইহার ভিতরে কত রত্ন আছে কে জানে? প্রকাণ্ড সুবিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, লুক্কায়িত বহুমূল্য রত্ন। এই রত্ন চিনিলে বিস্ময় হইতে হয়, অধিকারী ধনী হন। এই রত্নাকর আমাদিগের সমক্ষে। যদিও হিন্দুস্থানে কুসংস্কার, উপধর্ম্ম, পাপ, ব্যভিচার, দুঃখ শোক, মন্দ ব্যাপার অনেক আছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দুস্থান একটী স্বর্গ, ইহাতে গভীর জ্ঞান আছে, চমৎকার ভক্তি আছে, আশ্চর্য্য সদনুষ্ঠান আছে, চরিত্রে নিষ্ঠা আছে, বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং প্রেমের আর্দ্র ভাব আছে, গভীর আনন্দের নদী আছে। হিন্দুস্থান মন্দ বল, আবার ইহা অত্যন্ত ভাল। হিন্দুধর্ম্মের কাল দিক আছে মানি, সুন্দর দিক আছে ইহাও মানিব। আধুনিক হিন্দুস্থানের বিষয় বলিলে অনেক বিষয়ে ক্ষোভ লজ্জা এবং দুঃখ উপস্থিত হয়, মনস্তাপ হয়, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুস্থানের এমন ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর নয়ন ফিরান যায় না। এখন বঙ্গদেশে

হিন্দুস্থানে অনেক জ্ঞান সভ্যতা দেখা যায়, কিন্তু প্রাচীন আর্য্যস্থানে আরও প্রগাঢ় ব্যাপার ছিল।

অনেকে বলিবেন, হিন্দুস্থানবাসিগণ সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ সংসারকে ঘৃণা করিয়া সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করেন, স্বার্থপর হইয়া সুখ অন্বেষণ করেন। হিন্দুস্থানের ত্যাগ-স্বীকার স্ত্রী পুত্রগণকে ভাসাইয়া দিয়া নিজে উৎকৃষ্ট রমণীয় স্থানে যাবজ্জীবন ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকা। পরকে কষ্ট দিয়া আপনি চিরবৈরাগ্য অবলম্বন করা—হিন্দুস্থানের মোক্ষ এই। যেখানে একজন তপস্যা করেন সেখানে স্ত্রী পুত্রের প্রবেশ নিষেধ; বিষয় কার্য্য পৃথিবীর লোক লৌকিকতা সেখানে ত প্রবেশ করিতেই পারে না। যেখানে বিষয় কর্ম্মের শব্দ শুনা যায়, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে স্থির চিত্তে তিনি ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বর সহবাস সম্ভোগ করেন। হিন্দুস্থানের মুক্তি সংসারের শৃঙ্খল ছেদন, হিন্দুস্থানের সুখ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ব্রহ্ম-সহবাসসুখ সম্ভোগ করা। এ এক শ্রেণীর ছবি বটে। হিন্দুস্থানে ধর্ম্মে বিবিধ ব্যাপার, ইহাতে মন্দও আছে ভালও আছে। যে ছবি দেখাইলে ইহার বিপরীত ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সন্ন্যাসী উদাসীন সেখানে জনক রাজাও বাস করেন। সংসারে পরিবার সহকারে সাধন পবিত্র সাধন। একাকী সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বর আরাধনা রীতি ভাল, কিন্তু বন্ধু পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া নাম কীর্ত্তন করিবার পদ্ধতি আরও ভাল। এক দিকে উৎকৃষ্ট চরিত্র সাধক ধর্ম্মে উন্মত্ত, সংসারে বিরাগ বৃদ্ধি হইয়া পরিবারের মুখ দর্শন করেন না; টাকা পয়সা কিছুরই প্রতি তাঁহার অনুরাগ নাই, বিষয়কে বিষবৎ ঘৃণা করেন, মায়ারজ্জু তাঁহার শিথিল হইয়াছে

তিনি নির্জনে গিয়া বাস করেন; আর এক দিকে হিন্দুগণের অতি পূজ্য মহাদেব স্ত্রী সন্তান সন্ততি সকলকে সঙ্গে লইয়া ধ্যানে মগ্ন, সংসারে থাকিয়া যোগিশ্রেষ্ঠ। এ দুই ছবি বিরুদ্ধ অথচ এ দুই পক্ষই আছে। গ্রাম নগর ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া ভস্ম মাখিয়া সন্ন্যাসী, সংসারের মধ্যে থাকিয়া উচ্চতত্ত্ব সাধন, দান ধ্যান সমস্তই আছে। স্ত্রী পরিত্যাগ স্ত্রী গ্রহণ, স্ত্রী পরিবার হইতে দূরে প্রস্থান, স্ত্রী পরিবারকে নিকটে রাখা—হিন্দুস্থান এ দুয়েরই পক্ষপাতী। কোন একটী রীতি এক দিকে যেমন আছে, অন্য দিকেও তেমনই আছে। সংসার ত্যাগের দৃষ্টান্ত যেমন আছে, জনক প্রভৃতিতে সংসার পরিত্যাগ না করার দৃষ্টান্তও তেমনই আছে। যথার্থ হিন্দু হইয়া জনকের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা যায়। এ দৃষ্টান্তের একান্ত প্রয়োজন। কেন না জনক পরিবার মধ্যে, রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া রাজ্য পালন করিয়া রাজর্ষি হইলেন। তবে সংসারে থাকিয়াও ঋষি হওয়া যায়, পরিবার মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করা যায়, হিন্দুস্থানে এ দৃষ্টান্ত আছে।

যে দৃষ্টান্ত বলা গেল ইহা অপেক্ষা এক উচ্চ দৃষ্টান্ত আছে। সংসারের ভিতরে নানা প্রলোভন, সেখানে যোগ ধ্যান ভাল চলে না, সুতরাং ঋষি অরণ্যবাসী হইলেন, পর্ব্বত নদী গিরিগুহা সুরম্য বন উপবন আশ্রয় করিলেন, কিন্তু সেখানেও ঋষিকন্যা ঋষিপুত্রগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঋষিপুত্র ঋষিকন্যাগণকে আশ্রমে স্থান দিতেন, আদর করিতেন, তাঁহারা তাহাদিগের মুখ দর্শন করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। এ কথা পুস্তকে লিখিত

আছে, অনুষ্ঠানে জীবনক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই সেই সময়ের আশ্রম স্মরণ পড়িলে কাহার না আহ্লাদ হয়? আশ্রমে দূষিত বিষয় প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে শোক মোহের বার্ত্তা নাই, সেখানে দুষ্ট লোক বসতি করে না, সেখানে পাপ প্রলোভনের প্রবেশাধিকার নাই—তাহা সুরম্য পর্ব্বতে নদীতীরে বনে অবস্থিত। ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে থাকিয়া উচ্চতম ধর্ম্ম সাধন করেন। পরিবারগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের অংশী হইতেছেন, পুত্রগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইতেছেন। আমরা ইহা ভাবিয়া কি উৎসাহিত হইব না? যখন এক সময়ে এরূপ হইয়াছিল, তখন বর্ত্তমানে তাহার পুনরুদ্দীপন হওয়া অসম্ভব নহে। যদি একবার উচ্চ সোপানে তাঁহারা আরোহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি হইয়া আমরা সেই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিব না কেন। অন্ধকার জঘন্য কপট আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা দেখিতেছি, ইহা আর্য্যস্থানের বলিব না। আর্য্যস্থানের গৌরব আর্য্যস্থানের সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। কাল নদীর উপর দিয়া তাঁহাদিগের নৌকা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও দশ বিশ শতাব্দী অতিবাহিত হইবে, তবে আমরা যেখানে তাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন সেখানে উপনীত হইতে সক্ষম হইব।

সপরিবারে ধর্ম্ম সাধন হিন্দুস্থানের সর্ব্বোচ্চ ভাব। ঈশ্বরের বিধি নহে, সংসার ত্যাগ করিয়া পরিবার বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম সাধনে ইহা আবশ্যকও নহে। ইহা কঠিন ব্যাপার, কেন না সংসারে থাকিয়া কেহ কোন মতে ধ্যান করিতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি সংসারে নিমগ্ন হয়, সংসার ছাড়িয়াও ধর্ম্ম সাধন

করিতে পারে না। জঙ্গলে অরণ্যে বাস করিয়াও সংসার স্মরণ হয়, সেখানেও স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা হয়। ফল মূল আহার করিয়া কি হইবে? প্রাচীন আর্য্যস্থানে আশ্রমের সুন্দর ছবির উপন্যাস আছে। ইহা যেন সুমিষ্ট পদ্য রচনা, অতি সুন্দর ভাষা শুনিতে আরম্ভ করিলে আর শেষ হয় না। সে দেশ সেখানকার বায়ু সকলই মনোহর। সেখানকার কথা শুনিলে হৃদয় সুখী হয়, সে বায়ু স্পর্শ করিলে অঙ্গ সুশীতল হয়। সুন্দর নদীর স্রোত চলিয়া যাইতেছে সেই নদীকূলে মনোরম আশ্রম। সে সুন্দর ছবি দেখিতে ভাল, সে গল্প শুনিতে ভাল। তেমন দ্রব্যটী পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এটী সুন্দর ছবি নহে, আশ্রম সম্ভব, আশ্রম ঘটিয়াছে। বনের ফল খাইয়া, কুটীরে বাস করিয়া, রিপুগণকে বশীভূত করিয়া ঋষিগণ পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন শুদ্ধ হৃদয় পবিত্র, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। সকলে সেই পথাবলম্বী হও। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যাহাতে বৈরাগ্যতত্ত্ব যোগতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব শিখা যায়, সেই দিকে চল। প্রাচীন আর্য্যসমাজে চল, সেখানে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া যোগপথে তাহাকে প্রবৃত্ত করিবার বিধান। সে পথে চলিলে তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হইবেন। ব্রাহ্ম! তোমার এই দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। যে দেশে জনকঋষি জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে, যে স্থান ঋষিগণের আশ্রমে পূর্ণ, সেই হিন্দুস্থান সেই ব্রহ্মের ক্রোড় তোমার জন্মভূমি। এমন উপায় কর, যাহাতে সপরিবারে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পার।

ব্রহ্মকন্যার স্বর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকন্যা দুজনেরই জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত আছে। একজন আর এক

জনকে ভাসাইয়া দিয়া জঙ্গলে প্রস্থান করিবে, ইহা ব্রহ্মের রাজ্যে হইতে পারে না। তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ডাক, যেখানে যিনি তোমার প্রিয় আছেন ডাকিয়া আন, সকলে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হও। তোমরা এখানে যে সংসার করিতেছ ইহা প্রকৃত সংসার নহে। যখন ধর্ম্মের সংসার হইবে, তখন স্বর্গের ব্যাপার হইবে। হে ব্রাহ্ম! তুমি তোমার স্ত্রীকে ডাকিয়া তোমার ধর্ম্মে দীক্ষিত কর, উভয়ে যোগপথে ভক্তির পথে চল, উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম বর্দ্ধন করিয়া পরস্পর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সমুদয় পাপের মূল, কলঙ্ক, অপরাধ সমুদয় বিদূরিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। কোন ব্রাহ্ম যদি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকেন, হৃদয়ের সহিত ডাকিতে পারেন, তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া বর্ত্তমান কলঙ্কিত হিন্দুস্থান স্বার্থপর হিন্দুস্থানে আবার জনকঋষির উচ্চ দৃষ্টান্ত স্থান হয়। হয় না, হয় না, হয় না, এ কথা মুখে আনিও না। একবার যদি ডাকিয়া আনিয়া যোগপথে ভক্তিপথে চলিবার উপায় করিতে পার, সংসার আর কণ্টকময় থাকিবে না, এই বঙ্গদেশ সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে একখানি ছবি হইবে। ইহার দিকে সকলের নয়ন স্থির হইয়া থাকিবে।

এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে এই বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। যাহাতে এই সময় শীঘ্র আসিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। স্বার্থপর হইয়া প্রিয় ভাই ভগিনীদিগকে ভাসাইয়া দিও না, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ কর তাঁহাদিগের ভিতরে যে সকল সদ্গুণ আছে, তাহা প্রস্ফুটিত করিবার উপায় কর। সকলের সহধর্ম্মিণী উপস্থিত হউন, যাহা কিছু পূর্ব্বের উচ্চ ভাব ছিল তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। ব্রাহ্মিকা স্ত্রী সংসারের জীব না হইয়া

বেশ ভূষাতে জলাঞ্জলি দিয়া মৈত্রেয়ী হউন, স্বামীর নিকটে বসুন, সে কি পদার্থ যাহাতে অমর হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করুন, স্ত্রী স্বামী সহবাসে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। ভারতভূমি মৈত্রেয়ী সদৃশ শত শত নারীতে পূর্ণ হইবে। এখন যেমন বিষয়ের আলোচনা করেন, তেমন আর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করুন। স্বামী সুখী হইবেন, সন্তানগণ ধর্ম্মপথে চলিবে, বংশপরম্পরা পুণ্য শান্তির নিকেতন হইবে। এই ভাবে, এই ব্রাহ্ম ভাবে সর্ব্বদা পরিবার নিকটে রাখ। আপনি গভীর যোগে নিমগ্ন হও, সহধর্ম্মিণী যোগে মগ্ন হউন, পরস্পর মগ্ন হইয়া কৃতার্থ হও। সন্তান সন্ততি প্রিয়জন সকলে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য কর। পরিবার সংসার সমুদয় ব্রহ্মযোগে জলে জল একাকার হইয়া যাইবে। আর সংসার সংসার থাকিবে না, সংসার ব্রহ্মধাম হইয়া উঠিবে। জনক যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ভাব পুনরুদ্দীপন হইতে পারে বিশ্বাস কর এবং সর্ব্বদা এই অভিলাষ পোষণ কর যে, সেই ভাব পুনরুদ্দীপন করিব, আপন আপন চক্ষে দর্শন করিব এবং দর্শন করিয়া সুখী হইব।

হাস্য ক্রন্দন। *

রবিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক; ১৮ই মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ভবনদীর কূলে দুইজন লোক বসিয়া আছে। দুজনেই বিলাপধ্বনি করিতেছে, দুজনেরই দুঃখের কথা আছে। একজনের বিলাপের মর্ম্ম এই, আমি কাঁদিতেও পারিলাম না, ভবসাগরও উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না। আর একজনের বিলাপের মর্ম্ম এই, আমি এত

কাঁদিলাম, তবু ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পরিলাম না। কাঁদিতে পারে না বলিয়া একজনের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল না, আর একজন অনেক কাঁদিয়াও স্বর্গে যাইতে পারিল না, এজন্য মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। এ কথা অনুমান বা কল্পনার কথা নহে, দুটাই নিশ্চিত ঘটনার কথা, যথার্থ ঘটনার ছবি, মনঃকল্পিত ছবি নহে। না কাঁদিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না, আবার কাঁদিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় তাহাও নহে। ভক্ত স্বর্গের দ্বারের নিকট গেলেন, দেখেন দ্বার অবরুদ্ধ, অনেক বলিলেন অনেক অশ্রুপাত করিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল না, দ্বার খুলিল না, যেমন অবরুদ্ধ ছিল, তেমনই অবরুদ্ধ রহিল।

কাঁদিলে হয় না, না কাঁদিলেও হয় না, দুইই তত্ত্বকথা, কেহ এ কথা অস্বীকার করিতে পারে না। কঠোর প্রাণ বিগলিত হয় না, অশ্রুপাত হয় না, ইহা ভয়ানক অবস্থা। ইহাতে প্রার্থনা ধ্যান স্তব স্তুতি হইল না, কেবল শব্দ উচ্চারণ হইল। সেই কঠোর অবস্থায় প্রাণ পাষাণ সে বুঝিল। আমার স্বর্গে যাওয়া হইল না ইহা আর সে কেন বলিবে না? দান ধ্যান স্তব স্তুতি অনেক চেষ্টা করিল, কিছুতেই চক্ষুর জল ফেলিতে পারিল না। যোগীর ধর্ম্মে ক্রন্দন আসিল না, সকলে মৃদঙ্গ লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল মত্ততা আসিল না, চক্ষে জল পড়িল না। প্রেমের কথা শুনিল, কিন্তু কাঁদিল না বলিয়া হৃদয় ভিজিল না। এ অবস্থায় শান্তি নাই, উন্নতি নাই। না কাঁদিয়া কিছু হয় না, ইহা প্রত্যেকে জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন ইহার প্রমাণে প্রয়োজন নাই। আবার কাঁদিয়া ভাসাইলাম, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কাঁদিলাম, তাহাতেও মনের দুঃখ গেল না। একাকী বা ভক্ত সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রন্দন করিলেই স্বর্গ

পাওয়া যায় তাহা নহে। উপাসনা করিতে করিতে ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে মন কঠোর হইয়া আসিল, জীবন শুদ্ধ এবং আনন্দ লাভ হইল না; অন্য দিকে কাঁদিয়া বীজ বপন করিল, সময়ে ক্রন্দন চলিয়া গেল, শস্য লাভ হইল না। পাপ স্মরণ করিয়া বৃষ্টি ধারার ন্যায় অশ্রু পড়িল, পাপ গেল না। তবে অনুতাপেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

কাঁদিলে অথবা না কাঁদিলে ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রন্দন করিয়াও স্বর্গ নাই, না ক্রন্দন করিয়াও স্বর্গ নাই, এই ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিতে হইবে। ক্রন্দন করিয়া রোপণ না করিলে শস্য সংগ্রহ হয় না, ইহার সঙ্গে এই কথা মনে করিতে হইবে যে, ক্রন্দন সামান্য পদার্থ নহে। ক্রন্দন হইলেই যে ক্রন্দন হয় তাহা নহে। কপট ক্রন্দনে কোন ফল নাই। ক্রন্দন দেখিলেই বুঝা যাইবে যথার্থ ক্রন্দন কি না? এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা উপদেশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকল লোকে কাঁদিল, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাঁচ ছয় জন কাঁদিয়াছে, আর কেহ কাঁদে নাই। না কাঁদিলে স্বর্গ পাওয়া যাইতে পারে না, সে ক্রন্দন সেই ক্রন্দন—যে ক্রন্দন সরল অন্তঃকরণ হইতে উপস্থিত হয়। সেই অনুতাপ মধ্যে স্বর্গের শোক দেখিতে পাই, ভিতরে যদি আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়। এ ক্রন্দনে ব্রহ্ম লাভ হয়।

পৃথিবী আহ্নিক গতি সমাধা করিতেছে, ইহাতে সূর্য্য উঠিতেছে অস্ত যাইতেছে, ক্রমে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে। সৌর জগতের গতিতে যে প্রকার দিবা রাত্রি বৎসর হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যজীবনে রাত্রি দিন—দুঃখ শোক, হাস্য ক্রন্দন—দৈনিক গতিতে ব্রহ্মসূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া অগ্রসর হইতেছে। যে ব্যক্তির

মুখে হাস্য ক্রন্দন নাই, তাহার জীবন অগ্রসর হইবে না। স্বাভাবিক দিবা রাত্রির ন্যায় মনুষ্যজীবনের দিবা রাত্রি আছে। সূর্য্যবিরহে যেমন রাত্রি উপস্থিত হয়, তেমনই ব্রহ্মবিরহে মনুষ্যজীবনে রাত্রি অনুভূত হয় এবং স্বভাবতঃ চক্ষু হইতে জল পড়ে। যতই ঘোর অন্ধকার হইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ততই আরও চক্ষুর জল পড়িতে থাকে। আজ অপরের সেবা করিতে পারিলাম না, অপরের দুঃখ বিমোচন করিলাম না, অপরের পাপ অধর্ম্ম শোক দূর করিলাম না, স্বীয় শক্তির উপযুক্তরূপ ব্যয় করিলাম না, স্বর্গের প্রভুকে স্মরণ করিলাম না, রাত্রি হইল। এখানে আর চেষ্টা করিতে হয় না, পাপ স্মরণ মাত্র আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িবে।

পাপ স্মরণ করিয়া হৃদয় ব্যথিত হয় না, সেখানে কোন দিন অনুতাপ হয় নাই; পাপ যে কি তাহা সে বুঝে নাই। ধর্ম্মের শাস্ত্র এই, অণুমাত্র পাপ দেখিবা মাত্র খুব কাঁদিয়া উঠিবে। একটু অদর্শন হইলেই "হে ঈশ্বর! তুমি কোথায় রহিলে" বলিয়া আকুল হইবে। হায়! এমন শুদ্ধ জীবনে দুর্ব্বলতা পরবশ হইয়া পাপকে ঘরে ডাকিয়া আনিলাম, মন দূষিত হইল, কলঙ্কিত হইল, এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিবে। রাত্রি দুপ্রহর, জীবনকে ঘোর অন্ধকারে ঘেরিল। কিছুতেই আর শান্তি হয় না, প্রগাঢ় ক্লেশ অনুভব হইতে লাগিল, দুঃখের শেষ সীমা উপস্থিত হইল, বিষাদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন সেই দুঃখের অবসান এবং প্রত্যূষের সমাগম সময়। দুপ্রহর রজনীর পর রাত্রি অবসান, প্রাতঃকালের আরম্ভ। বিষাদ যখন ঘনীভূত হইল, তখনই বিষাদের ক্ষয় আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে এই নিয়ম। অনুতাপের মধ্য দিয়া সুখ আইসে, পাপ চলিয়া

গিয়া ঈশ্বর-দর্শন হয়। ভক্ত ঈশ্বর-দর্শনে কাঁদিতে লাগিল, আনন্দ ধরে না।

পাপের জন্য জীবনে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত। তুমি সাধু সজ্জনের সেবা কর নাই, কিন্তু, ঋষিগণ দেবগণ দয়া করিয়া তোমার ঘরে আসিলেন। কেন, ইহাঁরা কেন প্রকাশিত হইলেন? ইহাঁরা ঘরে প্রবেশ করিলেন কেন? কাল রাত্রে এত পাপ করিলাম তবু ইহাঁরা আমার ঘরে আসিতে কুণ্ঠিত হইলেন না? প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ভক্ত সহায় হইলেন, একটা পুণ্যভাব একটা সৎকথা শ্রবণ করিয়া দুঃখ মোচন হইল, ভক্তের মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি তখন আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন এবং যত কৃতার্থ মনে করেন তত হাসিতে থাকেন। এ হাসি উন্মাদ ব্যক্তির হাস্যের ন্যায়। সহস্র ভদ্র লোকের সম্মুখে তিনি কাঁদেন, সহস্র ভদ্র লোকের সম্মুখে তিনি হাসেন। ভক্ত কাঁদিতেও কুণ্ঠিত হন না, হাসিতেও কুণ্ঠিত হন না। দুইই স্বাভাবিক। সভ্যতার অনুরোধে হাস্য ক্রন্দন সম্বরণ করিতে গিয়া অধোগতি উপস্থিত হয়। সে জীবনে দিবা রাত্রি হয় না। ব্রাহ্মের জীবন পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় ব্রহ্মসূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে না, পৃথিবীর বার্ষিক গতির ন্যায় হাস্য ক্রন্দনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় না। যে সমাজে হাস্য ক্রন্দন নাই, সে সমাজ মরণ স্বীকার করিয়াছে। প্রতিদিন উপাসনা করিয়া যে চক্ষু কাঁদিল না সে চক্ষু কঠোর হইল, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিল। ক্রমে অনুতাপ করিয়া ক্রন্দন করিয়া পাপ স্মরণ করিয়াও জীবনের গতি হইল না। চেষ্টা করিয়া কল্পনা করিয়া কাঁদিলে কি হইবে? ক্রন্দন প্রকৃতিস্থ চাই। প্রকৃতিস্থ হইয়া না কাঁদিলে সে ক্রন্দন ক্রন্দন নয়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে না দেখিলেই কাঁদে, কোথায় রহিলে বলিয়া আর্ত্তনাদ করে, তাহার বিচ্ছেদ থাকে না, কাঁদিবা মাত্র তিনি প্রকাশিত হন, এবং তৎক্ষণাৎ সে হাসিতে থাকে। যে ব্যক্তি না হাসিল সে ক্রমাগত অনুতাপ করিয়া পাষাণ সমান হইবে, দিবা রাত্র কাঁদিবে, কিন্তু কিছুই ফল হইবে না। যদি ফল চাও উত্তাপ মিশ্রিত কর, অনুতাপ-বারি সিঞ্চন কর, ধর্ম্মবীজ প্রস্ফুটিত কর, সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য ভাব প্রফুল্ল ভাব রক্ষা পায় এরূপ উপায় অবলম্বন কর। ক্রন্দনের সঙ্গে হাস্যের সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে সুখের সঙ্গে মিলন চাই। ভাল দিক দেখিয়া হাসিবে, কাল দিক দেখিয়া কাঁদিবে। ক্রমাগত কাল দিক দেখিয়া কাঁদিলে সদ্গতি হয় না। হাস্য ক্রন্দন দুয়ের মধ্য দিয়া চলিবে। কখনও হাসিবে কখনও কাঁদিবে। বিষাদে অবসন্ন হইলে সে ব্যক্তি আশীর্ব্বাদ লাভ করে। ক্রন্দন পবিত্রতার জন্য আবশ্যক।

মনুষ্যের পর্য্যায়ক্রমে বাল্য যৌবন বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, ইহার মধ্যে দিন আছে, রাত্রি আছে। রাত্রি না হইলে দিন আইসে না। সূর্য্য অস্ত গমন করে, পুনরায় প্রাতঃকালের সমাগম জন্য। দুঃখ অস্ত গমন করে, পুনরায় প্রাতঃকালের সমাগম জন্য। দুঃখ পাওয়াই সুখের কারণ। ব্রহ্ম তজ্জন্যই দূরে গমন করেন। ব্রহ্ম এতবার করুণা প্রকাশ করিলেন, এতবারেও জীবন ভাল হইল না বলিয়া সাধক কাঁদিতে থাকেন। ঈশ্বর আপনার পরিচয় দিতে ক্রটি করিলেন না, একবার নয় দুইবার নয় কোটীবারের কম তাঁহার করুণা দেখি নাই, ইহা স্মরণ করিবা মাত্র চক্ষে জল পড়িতে থাকে। যে মনে পাপ আছে, ক্রন্দন করা স্বাভাবিক, কিন্তু পাপ থাকিতে হাস্য,

মৃত ব্যক্তির হাস্য, রোগীর বিফল হাস্য। যে ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য সকলই বাকি, কেবলই পাপ করিতেছে, একটীও সাধু কার্য্য করিল না, সে যে কত কাঁদিবে, শত সহস্র বর্ষ কাঁদিবে, কে গণনা করিবে? ক্রমাগত পাপে বিষয়ে মনুষ্য না ডুবে এজন্য অনুতাপ। অনুতাপের অশ্রুর প্রয়োজন আছে। শুষ্ক ভূমিতে নৌকা বদ্ধ হইলে নীচে জলের প্রয়োজন। জলের স্রোত প্রবল হইলে নৌকা ভাসিয়া উঠে। জীবন-তরী বদ্ধ হইয়াছিল, অনুতাপ জলে তাহা ভাসিয়া উঠিল। জীবন শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হইয়াছিল বৃষ্টিধারা নাই, কৃষক বীজ ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, বীজ অঙ্কুরিত হইল না, কিন্তু যাই ক্রন্দনের বৃষ্টি হইল অমনই বীজ অঙ্কুরিত হইল। ক্রন্দনের যেমন আবশ্যক হাসিরও তেমনই আবশ্যক। বীজ অঙ্কুরিত হইল আর হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। এক দিকে যত দুঃখ শোক, প্রকৃতি আর এক দিকে তত সুখ উল্লাস চায়। যদি এক কোটী পাপ হইয়া থাকে তাহার পরিবর্ত্তে পাঁচ কোটী সাধুতা চাই, যদি একবার অনুতাপের অশ্রু পড়ে, দশবার সুখের অশ্রু পড়া চাই। নয়ন একবার রাত্রি দেখিল, দশবার দিবস দেখা চাই। ফলতঃ ক্রন্দন ও হাস্য দুইই চাই। ক্রন্দন ও হাস্য দুই অবলম্বন করিলে ব্রহ্মপদতলে গড়াইয়া পড়া যায়। এই অশ্রুপাতে ও আনন্দে ব্রাহ্মের পরিত্রাণ হইবে, জগতের মুক্তি হইবে।

নিরাকার সাধন। *

রবিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক ; ২৫শে মে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গদেশে নিরাকার পূজার পরীক্ষা হইতেছে। সমস্ত পৃথিবী অনুরাগ উৎসাহের সহিত পরীক্ষা স্থলে উপনীত হইয়াছে। সকলে পরীক্ষা দেখিতেছে, ফলের প্রতি আশা-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। নিরাকার পূজার জন্য বঙ্গদেশকে কেন মনোনীত করা হইল কে জানে? যে দেশে কত কুসংস্কার কত কুনীতি কুরীতি, সেই দেশকে ঈশ্বর নিরাকার সাধনের জন্য কেন মনোনীত করিলেন ঈশ্বর জানেন। ঘটনাটী যথার্থ ইহা আর কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষা মধ্যে উচ্চ প্রকৃতির লোক আসিয়া পড়িয়াছে, জ্ঞানহীন আসিয়াছে, সভ্যতা বিদ্যাতে ভূষিত উজ্জ্বল জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আসিয়াছে, জ্ঞানালোক বিহীন সামান্য লোক আসিয়াছে। কাহারও ভক্তি আছে, কাহারও জ্ঞান আছে, কাহারও কর্ম্মসাধনে ইচ্ছা বলবতী, সে সকল লোকও আসিয়াছে। কেহ পুস্তক পাঠ করেন, অনুরাগের সহিত বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করেন, কেহ পুস্তকাদি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল হৃদয় মধ্যে সত্য পাঠ করেন তাঁহারাও আসিয়াছেন। জ্ঞানীভক্ত তপস্যা-প্রিয় যোগপ্রিয় সকল শ্রেণীর লোক আসিয়াছেন। এক বৎসর দুই বৎসর নয় অর্দ্ধ শতাব্দী চলিয়া গেল, পরীক্ষার ফল কি হইবে ভবিষ্যৎ তাহা জানে। এখন কিছু কিছু তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে।

ঈশ্বর বঙ্গদেশকে সাকার অর্চ্চনার পরীক্ষা করিলেন না, অকৃত্রিম

নিরাকার উপাসনার স্থল কেন করিলেন, সকলে বঙ্গদেশকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহার মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিতেছে। যে যেরূপে পারে তাহাকে সেইরূপে মীমাংসা করিতে হইবে। কেহ যোগসাধন দ্বারা কেহ প্রেমের দ্বারা, কেহ জ্ঞানযোগ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবেন, কেহ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মীমাংসা করিবেন। এখানে সকল উপায়ে চেষ্টা হইবে। জ্ঞান দ্বারা ভক্তি দ্বারা ইচ্ছা দ্বারা কিরূপে নিরাকার সাধন হয়? এ সমুদয় চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশ পাইবে। আজ অনেক দিন হইল চেষ্টা হইল। যিনি যৌবনে আরম্ভ করিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইলেন, যিনি বৃদ্ধ হইয়া আরম্ভ করিলেন, তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিল, সত্যের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ দাঁড়াইল কি? সকল লোকে বলে ব্রাহ্মেরা কি করে? পঞ্চাশ বৎসর কি করিল, সাধনে কি ফল পাইল? সকল ব্রাহ্মকে পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছেন জীবন দ্বারা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাও।

নিরাকার সাধন করা অত্যন্ত কঠোর, পৃথিবী এইজন্য নিরাকারের উপাসনা ছাড়িল। চক্ষু নিমীলন করিয়া নিরাকার দর্শন করা শরীর বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ লোক সাকার পরিত্যাগ করিয়া নিরাকারে উপনীত হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, নির্গুণ নহেন, সদানন্দ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বোত্তম, অকৃত্রিম নিরাকার যথার্থ দেহ বিহীন এরূপ কজন দেখিয়াছেন? পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর দেখ অনেক উপধর্ম্ম আছে, উহাতে কোন না কোনরূপে সাকার ঈশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে বর্ত্তমান কালে জ্ঞানী মূর্খ সভ্য অসভ্য সকলে মিলিত হইয়া সাকার মূর্ত্তির পূজা করিয়াছে। কেন করে? নিরাকার

ধারণ করা যায় না। কল্পনা মিশ্রিত না হইলে ধ্যানে আয়ত্ত হয় না। এজন্য নিরাশ হইয়া ঘৃণা করিয়া বিরক্ত হইয়া নিরাকার সাধন সকলে পরিত্যাগ করে, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সভ্য অসভ্য জ্ঞানী মূর্খ সকলে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর নিরাকার সাধন করিয়াও অনেক লোক চলিয়া যাইবে। অত্যন্ত ভক্তি অত্যন্ত বিশ্বাস না থাকিলে নিরাকার সাধনে থাকা যায় না। বীজ রোপন করিলে কি হইবে, ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে কিছু হয় না ; চক্ষু মুদ্রিত করিলে কি হইবে, কিছুতেই নিরাকারকে ধরিতে পারিবে না। বাইশ ঘণ্টা আমোদে বিষয় সেবায় পাপ পথে দৌড়াইয়া অল্পক্ষণ পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কিছু ঘণ্টা উপাসনা করিয়া কি নিরাকারকে পাইবে ? এ কি বৃক্ষের ফল ? স্বর্গের চাঁদ বামন হইয়া কি প্রকারে পাড়িবে ? ইহা কথার কথা নয়, অনুমানের বিষয় নয়।

বল এত বৎসর পরীক্ষা করিয়া কিছু করিতে পারিয়াছ কি না ? হৃদয়কে পরীক্ষা করা চাই। চক্ষু খুলিয়া বা বন্ধ করিয়া জড় বস্তু যেমন ধরিতে পারা যায়, তেমনই নিশ্চয় বলিতে পার একজনকে ধরিয়াছি—এক ঈশ্বর, এক বিধি, এক লক্ষণ, চির-অপরিবর্ত্তনীয় সত্য ঈশ্বর ধরিয়াছি। বল এ কথা ঘোষণা করিতে পার কি না ? ইহার সাক্ষী হইয়া প্রাণ দিতে পার কি না ? সুমধুর সঙ্গীত গাইয়া উপাসনা করিলে কি হইবে ? পৃথিবী সামান্য সঙ্গীত শুনিয়া গৌরবের মুকুট দিবে না। কত লোক সামান্য উপকার করিতে গিয়া অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল, গভীর বিপদের সমুদ্রে নিপতিত হইল। তোমরা নিরাকারের পূজা সংস্থাপন করিবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলে, এখন

দর্পহারী তোমাদিগের দর্প চূর্ণ করিবেন। অবিশ্বাস লইয়া কপট প্রেম ভক্তি লইয়া আরম্ভ করিলে, পাঁচ দিনে লীলা ফুরাইল। এখন বিষয় পথে যাও, নয় উপধর্ম্ম লইয়া দিন যাপন কর।

বাস্তবিক তোমরা শক্ত পথ ধরিয়াছ। চিরদিন যাহা হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিয়াছ। পূর্ব্বকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস পাঠ কর দেখিবে কজন নিরাকার আশ্রয় করিয়াছে? আমরা নয়ন নিমীলন করিয়া ব্রহ্মের অরূপ রূপমাধুরী দেখিতে চাই। এক নিয়ম এক নীতি এক সংশয় রহিত পূর্ণ বিশ্বাস, অনুমানের নহে, কিন্তু এক নিশ্চিত নিরাকার ব্রহ্মের সাধন করিব। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হয়, আর দেখি এক এক করিয়া সকলে পলায়ন করে। তবে বুঝি যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মের সাধন হয় না। অন্য দেশে অন্য লোকের মধ্যেও ত ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ কেন হয় বলিতেছি। এ পথের অন্ত নাই, ক্রমাগত চলিতে থাক, কোন্ পথে চলিতে হইবে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এ অতি দুর্গম পথ নূতন পথ; কি প্রাচীন কালে কি বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে অতি অল্প লোক আছে, যাহাদিগকে এই ভাবের এই মতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক এই মত কোথাও প্রবেশ করে নাই। ঠিক নিরাকার উপাসনা কোথাও দেখা যায় না। সাকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ নিরাকারে একটুও অনুমান নাই, কল্পনা নাই এরূপ কোথাও নাই; ঠিক নিরাকারের শাস্ত্রও পাওয়া যায় না। আজ কাল যাহা শুনা যাইতেছে, উহা ঠিক সেরূপ নহে। অন্য ভাবে, কোথাও এ সত্যটী সম্যক প্রস্ফুটিত হয় নাই, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রকাশ পায় নাই। নিরাকার ঈশ্বরকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করা—এমত

ব্রাহ্মধর্ম্মে এখন দেখিতেছি। এই নিরাকার পূজা হয় কি না মীমাংসা করিতে হইবে। এখন যে পরিমাণে যে ভাবে উপাসনা হয়, তাহাতে কি হইবে? সমুদয় দিন বিষয় কর্ম্ম করিয়া দু ঘণ্টা আধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া কি মন পরিতৃপ্ত হয়? কত সময় গেল, ব্রহ্মপূজা কতক্ষণ করিলে? বল ঠিক ব্রহ্মপূজায় কত সময় লাগে। ঠিক উপাসনায় ব্রহ্মসমীপে উপনীত হইতে কত মিনিট লাগে? বল চক্ষু মুদ্রিত করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুঞ্জয় মূর্ত্তি প্রকাশ পায়?—কি প্রকাশ পাইতে সময় লাগে? সংসার সে সময়ে শক্রতা করিতে আসিলে তাহাকে দূর করিতে কতক্ষণ লাগে? দশ মিনিট, না অমনই বিদ্যুতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়? সূর্য্য উদয় হইলে ক্রমাগত একজন সমক্ষে দেখে। দশ মিনিটের সময় যে বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট এক জ্যোতি দেখিলে, দেখিতে দেখিতে তাহা বিদ্যুতের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল, এরূপ হইলে কি হইল? ক্রমাগত দশ মিনিট অর্দ্ধ ঘণ্টা সেই যে দেখা হইল, বাহিরে আসিয়া দেখি, আহা, তাহাতে পুণ্য আনন্দ শান্তি আসিয়াছে। ভগ্ন-হৃদয় আরও তাঁহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে।

বল ঈশ্বর কি তোমার সঙ্গে কথা বলিলেন? তোমায় কি বলিলেন? তোমার মুখ দিয়াই বা কি সকল কথা বাহির হইল, তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও আসিল না? ব্রাহ্ম! তুমি এত কথা বলিলে, ব্রহ্ম হাঁ না বলিলেন না। তুমি ব্রহ্ম সহবাসে উপাসনা করিলে, না তোমার উপাসনা সমুদয় আকাশ গ্রাস করিল? তুমি কি ব্রহ্মের উপাসনা করিলে, না আর কিছুর উপাসনা করিলে? তোমার উপাসনা যদি নির্জ্জন ব্যক্তির আত্ম-নিবেদন হয়, তবে তুমি

কি নিজেই নিজের প্রতি নিবেদন করিলে? আত্মাই কি আত্মার নিকট প্রার্থনা করিল? এ যে আমার প্রতি আমি, মনের প্রতি মন সকল কথা বলিল। 'এ যে তুমি আপনাকেই আপনি নৈবেদ্য দিতেছ। এইরূপই অনেক স্থলে হয়। অনেক স্থলে আকাশের পূজা আপনার পূজা হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম! তুমি যথার্থ ব্রহ্মের পূজা করিতেছ কি না ঠিক করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। এরূপ গোলমালের ব্যাপারে প্রকৃত ব্রহ্মের পূজা হয় না, কল্পনার পূজা হয়। কেবল অনুমান থাকিলে উন্নত ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। অনুমানে আরম্ভ করিলে অনুমানে শেষ হইবে। মৃত্যুশয্যায় কেবল কণ্টক বিদ্ধ হইবে। সুখের সময়ে যে কাঁটা দেখিতে না পায় সে দুঃখের সময়ে কাঁটা দেখিতে পাইবে। অতএব ঈশ্বরকে ঠিক দর্শন করিতেছ কি না, বারম্বার পরীক্ষা কর, ক্রন্দন কর, প্রার্থনা কর, ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর হইয়া প্রকাশিত হইবেন। সভ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, এ সকলের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের ঈশ্বর ঠিক হওয়া চাই, অনুমান ও কল্পনা-শূন্য ঈশ্বরের পাদস্পর্শ করা চাই। সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। আড়ম্বরে কোন গৌরব নাই। বাহ্যিক উপাসনা করিলে বা সহজ ভাষায় প্রার্থনা করিলে কিছু হয় না। চক্ষু নিমীলিত করিয়া, হে ব্রহ্ম! হে ব্রহ্ম! বলিয়া উদ্দেশে অন্ধকারে হস্ত প্রসারণ করিলে কি হইবে? দিব্য পুরুষ অতি সুন্দর পুরুষ, তাঁহাকে হৃদয়ে লাভ করিলে তবে নিরাকার উপাসনা ঠিক হয়। বহু বৎসর হইল উপাসনা আরম্ভ করিয়াছ, যুবা ছিলে বৃদ্ধ হইয়া গেলে, এখন কোন দিন চলিয়া যাইতে হইবে, এখন আর বিলম্ব করিও না! যাহাতে স্বর্গের দ্বার খুলিতে পার, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তি-বৃক্ষতলে

উপবেশন করিতে পার, অগ্নি খাইতে হইলে অগ্নি খাইতে পার, জলে ডুবিতে হইলে জলে ডুবিতে পার, এজন্য প্রাণকে নিয়ত প্রস্তুত রাখ। যথার্থ কঠোরতার সঙ্গে ভিতরে আহ্লাদ। আহা কি সুন্দর ব্রহ্ম! তাঁহাকে জীবনে ধারণ কর। যে কয়েকজন পার ব্রাহ্মসমাজের নাম রক্ষা কর। যথার্থ দেখিলে তাহাতে একটু ভুল নাই, যেটুকু দেখিলে সত্য। বেদে মহাভারতে তেমন কান্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেটুকু দেখিলে একেবারে প্রত্যক্ষ করিলে। ব্রহ্মের মুখ দেখিলে তাঁহার কথা শুনিলে, তাঁহার শাস্ত্র শিখিলে, পৃথিবী যদি ইহাতে খড়্গহস্ত হয় কর্ণপাত করিও না, নিরাকার বস্তু পাইয়া জলে যেমন জল মিশিয়া যায় জীবন তাঁহাতে মিশাইয়া গেল। নিজের জীবন ব্রহ্মে জীবিত কর। আহার বিহার, সংসার পাট, বিষয় কর্ম্ম সকলই ব্রহ্মজীবন হইয়া সাধন কর। ব্রাহ্ম হইয়া দিবা রাত্র ব্রহ্মের সত্তা সম্বন্ধে ভ্রমশূন্য হও। আমরা আছি, ইহা যেমন কখনও ভুলি না, ব্রহ্ম আছেন ইহাও তেমনই ভুলিও না। চিত্তে ব্রহ্ম, হৃদয়ে ব্রহ্ম, প্রাণে ব্রহ্ম, চুলের মত সূক্ষ্ম অবস্থায় ব্রহ্ম। তাঁহার নিকট হইতে স্পষ্ট উত্তর শুন, এক এক কথায় জীবন অগ্নিপূর্ণ হউক। এরূপ হইলে মানুষ মজিবে, পৃথিবী মজিবে, ব্রাহ্মসমাজ কৃতার্থ হইবে। এমন করিয়া ব্রহ্মকে বুকে বাঁধিবে যে আর সংশয় থাকিবে না। প্রাণের ভিতরে রক্ত দ্বারা লিখিত হইবে ব্রহ্ম সত্য, এই আদেশ এই উপাসনা, এই ব্রাহ্মের শাস্ত্র, এই ব্রাহ্মের নীতি।

পরলোকবাসী সাধু। *

রবিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক ; ১লা জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

স্থানে স্থানে এই কথার আলোচনা হইতেছে পরলোকবাসী সাধুদিগের সঙ্গে ইহলোকে মনুষ্যের দর্শন হয় কি না? পরলোক-বাসীরা মনুষ্যের দর্শনের বস্তু হইতে পারে কি না? ইহলোকবাসী পরলোকবাসী এ দুয়ের মধ্যে কি এক অনন্ত সাগর ব্যবধান নাই? ক্ষুদ্র মনুষ্য এই পৃথিবীতে বসিয়া ইহলোকের জীবের ন্যায় পরলোক-বাসিগণকে নিঃসংশয় দর্শন করিবে ইহা কি সম্ভব? স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে এ কথা কি পরলোকবাসী সম্বন্ধে সংলগ্ন হইতে পারে? দর্শন সম্ভব ইহার প্রমাণ কি? ইহা যে ভ্রম নয় কে বলিল? এক ঈশ্বরকে লইয়া জ্ঞান তৃপ্ত হয়, সাধু সজ্জনে প্রয়োজন কি? জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই না। চৈতন্য ঈশাকে কে দিলেন? এ কথা জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। সাধু যখন হৃদয়ের ধন, তখন সাধুশ্রেষ্ঠকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া কেবল ব্রহ্মকে লইয়া নির্জনে থাকিব সাধু সঙ্গে প্রয়োজন নাই, এরূপ কখন বলিতে পারি না। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন তাঁহার সাধুকে ভালবাসিতেই হইবে। ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে দেখিব এই স্পৃহায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্পৃহা ঈশ্বরকে আনয়ন করে, সেই স্পৃহাই আবার সাধুকে আনয়ন করে। ভক্তি ভক্ত-বৎসলকে আনয়ন করে, ভক্তি সাধু সজ্জনকে দেখাইয়া দেয়। এক ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই। যে ভক্তবৎসলের রূপ দেখে, সে ভক্তের

রূপ দেখে। এই দুই বিধি, দুই মন্ত্র এক। সাধু ছাড়া ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর ছাড়া সাধু নহেন।

যখন নয়ন হইতে প্রেমধারা বহে, তাহার ভিতরে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন, ব্রহ্মের সত্তা প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার আমার ইচ্ছাধীন এ কথা নহে। আমাদের ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে আশা করিতে পারি না। এ সব ভক্তির নিয়মে নিয়মিত হইবে। আজ সাধুর নাম উচ্চারণ করিতেছ না, এমন সময় আসিতেছে, এমন সময় আসিবে, যে সময়ে সমস্ত সাধুকে নিকটে দেখিতে হইবে, তাহাদের সকলের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহলোকেই জীবন শেষ হইল তাহা নহে। কত সাধু আছেন যাঁহাদিগকে দেখি নাই, নাম শুনি নাই, পরলোকে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির কথা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তির কথা শ্রবণ কর। ভক্তিপূর্ণ চক্ষু উজ্জ্বল হইবে, নদী পর্ব্বত সংসার যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে কেবল ভক্তি-নয়ন খুলিবে, আর দেখিতে পাইবে অমুক সাধু আসিয়াছেন। আর একটী ঈশ্বরপ্রেরিত মহাত্মা আসিলেন, ভক্তি-সাগরে টানিয়া লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যদি ভক্তি-নয়ন থাকে এখনই দেখিতে পাইবে, সুখ অনুভব করিবে। অনেক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইবে না, এ সব সত্য কথা, ভক্তি হইলে চেষ্টা না করিয়াও দেখিতে পাইবে। যত সাধু উদিত হইয়াছেন, ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিবে বিচিত্র নহে। যদি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর হৃদয় আপনি বলিয়া দিবে। সাধু সজ্জন যাঁহারা পরলোকে আছেন, যাঁহাদের নাম শুনিয়াছ, যাঁহাদিগের কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছ, অথবা বন্ধুমুখে শুনিয়াছ, সেই নাম সেই চরিত্র

সেই কথা একত্র করিয়া তুমি ভাব, তাঁহাদিগের মত ও তত্ত্ব চিন্তা কর, সেই মত ও তত্ত্বের ভিতর হইতে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ বাহির হইবেন, ভক্তি-চক্ষুর নিকট প্রকাশ হইবেন।

এ সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা বল। যাহা অনুভব করিয়াছ, যাহা পরীক্ষা করিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পার কি না? যখন চিন্তা কর কে সমক্ষে দাঁড়ান? কেবল কি যাহা শুনিয়াছ তাহারই অনুকরণ কর। হয় ত তিনি ছিলেন না, হয় ত কল্পনা। চৈতন্যের কথা যাহা শুনা যায়, হয় ত কল্পনায় কেহ গঠন করিয়াছে, এই পৃথিবীর নির্ম্মাতা হয় ত সেখানে স্থাপনা করিয়াছে। লোক পরম্পরায় চিত্রিত মূর্ত্তি জীবন্ত পুরুষরূপে দাঁড়াইল, ইহা যে কল্পনার প্রাদুর্ভাব। এই কি ঠিক? যদি সরল হও, তবে কি এই কথা বলিতে পার? এ কি অনুমানের কথা? সাধু ব্রহ্মভক্ত, ইহা কি বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছ? কেবল ছবি এই কি সিদ্ধান্ত হইল? ভক্তের পর ভক্ত সাধুর পর সাধু একটী একটী করিয়া কি বিদায় করিয়া দিতে পার? মনের যদি সে ক্ষমতা থাকে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া চেষ্টা কর। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত থাকিবে ইহা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিত্রাত্মাগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা তেমনই অসম্ভব।

যেখানে বসিয়া আছ সেইখানে ভক্ত বসিয়া আছেন। ভক্ত সর্ব্ব-ব্যাপী, ইহা মানিও না। ভক্ত সর্ব্বত্র-ব্যাপ্ত না মানিয়াও ইহা মানিবে যে, চক্ষুর দ্বারা ভক্ত দর্শন হয়, ইহা অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহলোক পরলোক এ দুয়ের মধ্যে এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে—চক্ষে দেখা যায় না অতএব অনুমান, ইহা বলিয়া

তাড়ান যায় না। তুমি বলিলে ভক্ত ত দেখা যায় না কোথাও তিনি নাই। তবে কি এ ছবি কল্পনা? এক একটী শুদ্ধ মত, এক একটী শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহা তাঁহার সম্বন্ধে লেখা আছে তাহাতে মনের সন্দেহ উপস্থিত হয়। অমুক সম্বন্ধে অলৌকিক ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, অমুককে ঈশ্বরবৎ লোকে পূজা করিয়াছে, অমুকের চরিত্রে অসীম পুণ্য আরোপ করা হইয়াছে, নানা অদ্ভুত ভাব অর্পণ করা হইয়াছে, সমাদর করা হইয়াছে, ভক্তি করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে আবার সেই সকল সাধুকে ঘৃণা করা হইয়াছে, প্রতারক বলিয়া পৃথিবী হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এ স্থলে সরল হৃদয় ভক্ত সময়ে সময়ে বলে, এমন ভয়ানক তুফানের মধ্যে তরী রক্ষা কঠিন। ভক্তি-তরী জলে মগ্ন হইবেই হইবে। এ পথে না চলিয়া কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্ত লইয়া জীবন গঠন করা উচিত। বলিলে বটে কিন্তু পারিবে না। তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্রহ্মসন্তানকে আনিবেন। তিনি তোমার মতে সায় দিবেন না। যে ভক্তির শাস্ত্র তিনি পড়াই-বেন, তাহাতে তাঁহার পদতলে তাঁহার সন্তানগণকে দেখিবে। যদি তাই হইল তবে এখন হইতেই দেখা কর্ত্তব্য। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া সাধুর সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ সংস্থাপন করা উচিত।

সাধু সম্বন্ধে যাহা শুনিব যাহা দেখিব তাহা জীবন্ত। যদি বল জীবন্ত না হইয়া সাধু সম্বন্ধে মত থাকিতে পারে তাহা হইলে মরণ। যদি সাধু সম্বন্ধে মতামত হয়, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতও মত হইতে পারে। সাধু সম্বন্ধে মত সত্য, উহাতে জীবন আছে কেবল মত নহে। সাধুগণকে পুরুষ বলিয়া ধারণ করিব। সত্যকে মত বলিয়া উপেক্ষা করিও না। ব্রহ্মকে মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সাধুকেও

মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। ঈশ্বরকে দেখা চাই। ঈশ্বরের পূর্ণ-মঙ্গল মতে থাকিলে চলে না। সেই মত পুরুষ হইয়া মঙ্গলমূর্ত্তি প্রকাশ পায়। যাই বলিলে সেই সাধু জগতের জন্য প্রাণ দিলেন, অমনই তৎসম্বন্ধের সে কথা মূর্ত্তিমতী হইল, শব্দ পুরুষ হইল। সাধু জীবন্ত হইয়া যদি মনকে অধিকার না করিলেন, তবে আলোচনা সার হইবে। যাই শব্দ উচ্চারণ করিলে, অমনই ঈশা চৈতন্য শব্দ জীবন্ত হইল। জীবন্ত পুরুষ আমাদিগকে জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, আমাদের মনে সুখ সঞ্চার করিয়াছেন। প্রাণ বিলম্ব করিও না সাধুকে অভ্যর্থনা কর; তাঁহার পদধূলিতে সমস্ত কণ্ঠ ভূষিত কর। ধন্য জগতের স্রষ্টা, তিনি সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত করিলেন! ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু আমাদিগের বন্ধু, আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু, মনোহর পদার্থ, সাধুকে হৃদয়ে স্থান দিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ভক্তির শাস্ত্রে অতি আশ্চর্য্য সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পক্ষণ মধ্যে কি সুন্দর মনোহর ব্যাপার উপাস্থত হয়। ঐ একটা ছাত্র কত পুস্তক পড়িল, কত সাধু জীবন পাঠ করিল, কিন্তু তাহার হৃদয় সন্দেহ-বাণে বিদ্ধ। অমুক বৎসরে অমুক ঘটনা হইয়াছিল, না সে বৎসরে নয়, অমুক মাসে, বোধ হয় সে মাসে নয়, এইরূপ করিয়া কিছুই নিশ্চয় হয় না। দশ বৎসর অধ্যয়ন করিল অথচ সংশয় ঘুচিল না, অমুক সাধু কি অমুক প্রকার ছিলেন? বিদ্বানের চক্ষে সাধু প্রকাশিত হইলেন না, কিন্তু সরলের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ইহা ঈশ্বরের নিজের কথা যে, পণ্ডিত দেখিতে পায় না; কিন্তু শিশু সন্তান দেখিতে পায়। এই পবিত্র বেদী হইতে বলিতেছি, সাধুকে তর্ক বিতর্ক করিয়া

জানা যায় না, ইহাতে কেবল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। বালক-স্বভাব ভক্তের নিকট ঈশ্বর সুলভ, ভক্তবৎসল আশুতোষ। তবে তাঁহার ভক্ত সাধুগণ দুর্ল্লভ হইবেন কেন? ঈশ্বর সুলভ, সাধুও সুলভ। ভক্তিশাস্ত্রে নির্ভর করিলে সহজে সাধু দেখা যায়। যদি সহজে সাধুকে না দেখিলে তবে আর তাঁহাকে দেখা যাইবে না। অনেক তপস্যা করিলে, অনেক পুস্তকের সামঞ্জস্য করিলে, ভক্ত-চরিত্র নিরূপিত হইবে এ আশা দুরাশা! পলকে ভক্তির পরিচয়। পলকে পরিচয় হইল ত হইল, নয় আর হইল না। ভক্ত সূর্য্যলোকে না চন্দ্রলোকে কোথায় জানি না। ভক্ত সর্ব্বব্যাপী নহেন, তিনি কোথায় থাকেন জানি না। ঈশ্বর যাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? হয় ত কোন সাধকের নামও জানি না, ধামও জানি না, তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ জানি না, তাঁহার জাতির পরিচয় নাই, তথাপি আমার বন্ধু। যদি বন্ধু হন তবে এতটুকু জানি যাহাতে উদ্ধার পাইতে পারি। বিদ্বান নই, আমি কাঙ্গাল। কাঙ্গাল হইয়াও যখন ভক্তিরত্ন পাইয়াছি তখন চেষ্টা করিব।

ভক্ত এক সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন, কেহ বলিবে তিনি এই স্থান দিয়া গিয়াছেন এখানে আজও আছেন; তাঁহার আত্মা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে; তাঁহার সেই ভাব আকাশময় রহিয়াছে। পৃথিবীর ধূলিতে তাঁহার পদধূলি আছে, সেই ধূলি ত স্পর্শ করিতেছি, পৃথিবীর কোন স্থান দিয়া একদিন তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এদেশের কি ওদেশের, তিনি ব্রাহ্মণ কি ম্লেচ্ছ ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই। এই যথেষ্ট যে তিনি মেদিনীর কোন স্থানে এক সময়ে ছিলেন। সেই ীর এক মুটো ধূলিও বিশুদ্ধ। এই বায়ু এক সময়ে তাঁহার

পবিত্র নিঃশ্বাসে প্রবাহিত হইয়াছে, এ বায়ু কেমন মনে হয়! তাঁহার চরিত্রে সত্যের জয় হইয়াছে, দয়া পরোপকারের গঠন হইয়াছে। ঈশ্বরের নির্ম্মল চরিত্র, স্বরূপ লইয়া ভক্তের ছোট দয়া ছোট ক্ষমা ছোট ভালবাসা গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত না হইয়া অধ্যয়ন কর, শুষ্ক চিন্তা করিও না, ভক্তকে বুকে রাখিয়া প্রাণের ভিতরে রাখিয়া দিন কাটাও। নাম ধরিয়া ডাকিতে চাও, নাম চলিয়া গিয়াছে, যে নামে তিনি বিখ্যাত ছিলেন, আর কি সে নাম আছে, না সে শরীর আছে? তাঁহাদের চৈতন্য আনন্দ জ্ঞান প্রাণরূপে ধরিব। কোথায় আছেন জানি না, এই জানি যে জ্যেষ্ঠ ভাই আছেন। আহ্বান করিব না, এই মন্দিরে দেখিব, শরীর-মন্দিরে দেখিব, ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া এই বসিয়া আছেন। হৃদয়ের ভিতরে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিব। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সমাদরের পাত্র, তিনি আমার জন্য রক্ত দিয়াছেন। তিনি অমূল্য নিধি, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ আদর হউক, ভক্তিতে চক্ষের জল পড়ুক। নির্দ্দোষ চরিত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-গণের নিকট সমস্ত ব্রাহ্মের মস্তক অবনত হউক। দশ লক্ষ মহাত্মা সাধুর মধ্যে অন্ততঃ একজনও পরলোকে আছেন, যাঁহার চরিত্রে জীবিত আছি। তাঁহার পিতা আমার পিতা, আমার রক্তের মধ্যে, শরীরের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, তিনি বাস করিতেছেন। তাঁহাতে আমাদের সমস্ত জীবন আলোকময় মধুময় হউক।

দুই মুখবিশিষ্ট ঘট। *

রবিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক ; ৮ই জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হৃদয় ঘট এ শব্দ তোমরা শুনিয়াছ। ঘটে ঘটে ব্রহ্ম বিরাজমান, ঘটে ঘটে ব্রহ্ম আবির্ভূত, এ কথা কে না শুনিয়াছেন? প্রত্যেক ঘটে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান। আমরা প্রত্যেকে ঘট—যে ঘটে পরমাত্মা স্থাপিত রহিয়াছেন। আমি আধার যাহাতে তাঁহার স্থিতি। এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। কে না ইহা অনুভব করিতে পারে, কে না ইহা বুঝিতে পারে? হৃদয়মন্দিরে ব্রহ্ম স্থিতি করিতেছেন। আমার ঘটে সকল নর নারীর হৃদয়ঘটে তিনি আছেন। এই পুরাতন কথার সঙ্গে নূতন কথার সংযোগ করি, দেখি খাটে কি না? ঘটে ঈশ্বর বাস করেন সত্য ; কিন্তু সেই ঘটের কতকগুলির তলা আছে ; কতকগুলির তলা নাই। কতকগুলির তলায় ছিদ্র আছে, কতকগুলির তলায় ছিদ্র নাই। লোকের সঙ্গে লোকের, জীবের সঙ্গে জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। তোমাতে আমাতে এদেশে ওদেশে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখা যায়। সাধুতে ব্রহ্মকে দেখা যায় অসাধুতে ব্রহ্মকে দেখা যায় না, তাহা নহে। ইংরেজে নহে বঙ্গদেশে, মুসলমানে নহে হিন্দুতে বাস করিতে ঈশ্বর পছন্দ করেন তাহা নহে। বৃদ্ধ যুবা শিশু স্ত্রী পুরুষ এখানে এ সকল ভেদ নাই। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সকল লোকের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু ইহা বলিলেও জীব ও জীবে প্রভেদ আছে। কি সম্বন্ধে? কোন কোন মনে ব্রহ্ম থাকেন না তাহা নহে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া এই বিষয়ে ভিন্নতা দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর ঘটের তলা নাই, নীচে কিছু নাই, আর এক শ্রেণীর ঘটের

তলা আছে, তাহার নীচে আর যাওয়া যায় না। কতকগুলি লোকের মনে ব্রহ্মরাজ্য হইতে আলোক জ্ঞান প্রেম আনন্দ ভক্তি শান্তিবারি প্রবিষ্ট হইয়া ঘট পূর্ণ করে। আমার ঘটের তলা হইতে উপর পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান—এই শ্রেণীর লোক বলিতে পারে। জ্ঞান প্রেম হৃদয়ে বাস করিতেছে, পুণ্য শান্তি উপার্জ্জন করিতেছি, এই ইহাঁদিগের বিশ্বাস। এখানে সকলেরই পরিমাণ আছে, অল্প জল, ডুব দিয়া তলা শীঘ্র পাওয়া যায়, তবে কাহারও দূরে কাহারও নিকটে। জ্ঞান ভক্তি শান্তি অগাধ হইলেও অনেক দূর গেলে অন্ত পাওয়া যায়। ইহা প্রশংসার বিষয়। কি চমৎকার ঘট! জ্ঞান চাই উহা হইতে আনিলাম, সাধু জীবনের সত্য চাই উহা হইতে আনিলাম, বল উৎসাহ উদ্যম প্রভৃতি সকলই তন্মধ্যে পাইলাম। জীবাত্মার যাহা কিছু প্রয়োজন সেই ঘটের মধ্যে। তৃষ্ণা পাইল সেই ঘটের জল পান করিয়া সুশীতল হইলাম। চমৎকার ঘট! আমার ঘটে জ্ঞান আছে, ধ্যান আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, পুণ্য আছে, উৎসাহ আছে, ভিতরে উদ্যম আছে। এই ঘট উপকারী বন্ধু। প্রত্যেক সাধু আমার ঘটে, ঘট লইয়া পরলোকে যাইব, ঘট পূর্ণ করিয়া আনিব, স্বর্গের সামগ্রী উহাতে সঞ্চয় করিব। পরিশ্রমের ফল, সাধনের পুরস্কার হইাতে লাভ হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, লোকে বলে ইহাঁরা অল্পসংখ্যক। ইহাঁরা ঘটের ভিতরে রস রাখিতে চেষ্টা করেন; রাখিয়া দেন আর বর্ণ অন্যরূপ হয়। আপনার ঘটে আপনি রাখিলেন, যাহা কিছু রাখিলেন, রঙের প্রকারান্তর হইয়া গেল। কি কারণ বুঝিতে পারেন না, রাখিয়া দেন পরে দেখেন, এ বস্তু আমার নয়; আমার নাম তাহাতে নাই। উপার্জ্জিত বস্তুর ভাব আর তাহাতে থাকে

না। ঘটের তলা নাই বলিয়া এরূপ হয়। সেই ঘট ব্রহ্মসাগরের ভিতরে ডুবিয়া আছে, গভীর অতলস্পর্শ উহার জল। জীব অতি ক্ষুদ্র, মধ্যে বসিয়া আছে, ঈশ্বরের অন্ত পাইতেছে না। উপরে অসীম আকাশ নীচে অনন্ত সাগর। দেখি আমার জ্ঞান আমার নয়, আমার শান্তি আমার নয়, আমার আনন্দ আমার নয়, ব্রহ্মের। উপর দিয়া এক বিন্দু ঢালিলাম, নীচ দিয়া নদী বহিতে লাগিল। পাঁচ বিন্দু সিন্ধুর মধ্যে ফেলিলে সে বিন্দু কোথায় যায় কে বলিতে পারে? নীচের দিক দিয়া সিন্ধু উপরের দিকে উঠে। এরূপ সৌভাগ্যশালী কয় জন আছে যাঁহাদিগের বিশ্বাস জ্ঞান শক্তি নীচ হইতে উপরে উঠে। সাধকের ঘটের উপর দিক উন্মুক্ত। সাধন দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভক্তি সেই ছোট হৃদয়ঘটে প্রবেশ করে। যে ঘটের তলা নাই, তাহার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ঘটটী ব্রহ্মসাগরের ভিতরে রহিয়াছে, উহার দুই মুখ; জীবন নাম উপাধি সকলই ব্রহ্মের ভিতরে নিমগ্ন। স্পর্শ করিয়া ঘটের তলা পাওয়া যায় না, ভাঙ্গা ঘট ব্রহ্মেতে স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে যাদুকরের ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। চিহ্নিত সাধকের জ্ঞান ভক্তি জীবন যাহা কিছু ভিতরের সমুদয় ব্রহ্মেতে, সেইটুকু ঘটে আর কি থাকিতে পারে? বাস্তবিক সে ঘট আর ছোট ঘট নাই। এমন স্থান আছে যেখানে মানুষ নাই। জ্ঞান প্রবিষ্ট হইতেছে, প্রেম প্রবিষ্ট হইতেছে, পুণ্য প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রেরিত সাধু মহাজন নিজের কথা বলেন না, নিজের কর্ম্ম করেন না। তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের কার্য্য মিশ্রিত হইয়া যায়। তাঁহার জীবন ব্রহ্মসাগর গ্রাস করিয়াছে। তিনি ব্রহ্মের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। যাহা কিছু তিনি বলিতে যান,

ভিতর হইতে বিনিঃসৃত হইতে গিয়া—সমুদ্র হইতে জল আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে বলিতে হয় ইহা আমার নহে, উহা ব্রহ্মের ভিতর হইতে আসিয়াছে। এ স্থলে এক স্থানে সন্ধি হইয়াছে, যোগ হইয়াছে। পৃথিবীর সাধুগণের জ্ঞান ফুরাইয়া যায়। হৃদয় আর নূতন জ্ঞান দিতে পারে না, নূতন উপায় আনিতে পারে না, হৃদয়ের বার্দ্ধক্য বাড়ে। হৃদয়ে অধিক ধারণ করিতে চেষ্টা করে, আর ধরে না ; হৃদয়ের যে সীমা আছে তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। ঘটের তলা আছে, মুখ পর্য্যন্ত ধরিল, আর ধারণ করিতে পারিল না পড়িয়া গেল। আপনার জ্ঞানের সীমা আছে, আশা চেষ্টা শান্তি আনন্দের সীমা আছে। বড় ঘটে অধিক ধরিবে ছোট ঘটে অল্প ধরিবে এই মাত্র।

যে হৃদয়ঘটের তলা নাই, দুই মুখ দিয়া ব্রহ্মসাগর হইতে পান করিতেছে, তাহার অভাব নাই। দুই সহস্র বৎসর পাঁচ সহস্র বৎসর হৃদয় হইতে ক্রমান্বয়ে বারি বাহির হইবে, চিরজীবন জীবনের উপাদান ফুরাইবে না। উহা উপাসনার মৃতভাব দূর করিয়া দেয়, অধিক জ্ঞান দেয়, পনের বৎসরে সহস্র বৎসরের জ্ঞানী করিয়া তুলে। যাঁহারা ব্রহ্মসাগরে মগ্ন, ব্রহ্ম যাঁহাদিগের চারিদিকে, তাঁহাদিগের অভাব কি? তাঁহারা আপনার প্রতি আপনারা আশ্চর্য্য হন। যখন কিছুই জানেন না, কিছুই জ্ঞান নাই, তখন চিত্ত যখন ব্রহ্মেতে অবস্থিত, তখন স্বর্গের সত্য সকল মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, উহা কত শুভ্র, কেমন কোমল সুন্দর মূর্ত্তি, জ্যোতি কত, আশ্চর্য্য কেন হইবেন না? আমরা আমাদিগকে আধার স্বরূপ বলি, কিন্তু কার্য্যে সেরূপ করি না। ব্রহ্মে ব্যাপ্ত হইয়া যাঁহারা আধাররূপে অবস্থিতি

করেন তাঁহাদিগের হৃদয় দুই মুখবিশিষ্ট কলস। উহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আপনি কথা বলিতে যান, আশ্চর্য্য কথা মুখ হইতে বাহির হয়। কোথা হইতে এই সকল কথা আসিল খুঁজিয়া বেড়ান। শেষে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাড়ী সন্ধান করিয়া বাহির করেন। আপনার ছবি দেখেন, দেখেন এ কে? এ যে কেবল শিখিবার ব্যাপার। আপনার জ্ঞানের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন আশ্চর্য্য, কে এ জ্ঞান শিখাইল? এই সেই মুখ, এই মুখ দিয়াই শিখিলাম। সে লোকের দুই মুখ, এ মুখ আপনার মুখ নহে, এই মুখের মধ্যে ব্রহ্ম যিনি—তিনি আপনার কথা বলেন। এখানে দুজনে মিলিত হইয়া একাকার হইয়াছেন। এমন লোক কোথায়? এরূপ হওয়া তোমার আমার পক্ষে কঠিন।

যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে সে প্রকার সৌভাগ্য আসিতে পারে না। ছোট ঘট, তলা আছে, শীঘ্র উন্নতির শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি আশ্চর্য্য হইতে চাও, তলা খসাইয়া ফেল। তলা খসাইয়া ফেলিলে দেখিবে জ্ঞানের অন্ত নাই। মূর্খতা এখানে জ্ঞান হইবে, যে মেষের ন্যায় সে সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী হইবে, পরে কি হইবে কে জানে? আমাদের জ্ঞান পরিমিত, কিন্তু এখানে জ্ঞান নিত্য নূতন। আমাদিগের জ্ঞান পাঁচ বৎসরে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু এখানে সত্যের পর সত্য নূতন সত্যের পর মহৎ সত্য, গভীর সত্য ক্রমে আবিষ্কৃত হয়, সমুদয় দেশ আহ্লাদে ভাসিয়া যায়। জীব আর কিছুই নয় ফাঁকি, দুই মুখবিশিষ্ট একটা আধার। নাম উপাধি মাত্র, জীব খোসা ব্রহ্ম বীজ, জ্ঞান শক্তি প্রেম তোমার কিছুই নয়। সমুদয় শক্তি জ্ঞান প্রেম ব্রহ্মের। হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইয়া

ক্রমে ভিতরের সমুদয় ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে ঘট ছিল, ঘট কলসে, কলস কূপে, কূপ তড়াগে, তড়াগ নদীতে, ক্রমে সমুদয় সীমা অতিক্রম করিয়া সিন্ধু হইয়া যায়। সাধন দ্বারা এতদূর উঠা যায় না। এক এক সময় আছে যে সময়ে এইরূপ অনুভব হয়। ধ্যানের সময়ে কোথায় নিমগ্ন হইতেছ, আপনার ভিতর দিয়া কোথায় যাইতেছ, জান না। বাহিরে এরূপ মগ্ন হওয়া যায় না, শরীর মন হৃদয় অন্ধকারে ক্রমে নিম্নগামী হইবে। এক ক্রোশ দুই ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ চলিলাম, দেখি রত্নাকর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছি, উপরে ব্রহ্ম নীচে ব্রহ্ম, উপরে সত্য নীচে সত্য, চারিদিকে ব্রহ্ম। সমুদ্রের মধ্যে একটী বাটী বা কলসী, যাহার দুই দিকে মুখ, জলে পূর্ণ, সমুদ্রে ডুবিয়া আছে, জীবাত্মাকে এইরূপ উপলব্ধি করা যায়, ব্রহ্মের ভিতরে অবস্থিতির এই উদাহরণ। যদি বিনয়ী হইতে চাও, বিশ্বাস কর সমুদয় ব্রহ্ম, ভিতরে ব্রহ্ম, বাহিরে ব্রহ্ম, তোমার হৃদয়-ঘটের তলা নাই।

গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলে এইরূপ অনুভব হয়। ইহাই ধ্যান, ইহাই সমাধি। ইহার অর্থ এই, তলা স্থানান্তর করা হইয়াছে, দুই মুখ দিয়া ভিতরে ব্রহ্ম প্রবেশ করিতেছেন। এখানে অন্য কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই, দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে। এই মূল সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে, দেখিবে আপনার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কিছুই নাই। দিন দিন আপনি আপনাতে বিস্মিত হইবে। তখন বলিবে, কে কথা বলিতেছে, এ ত আমি বলিতেছি না, এ যে ভিতর দিয়া উঠিতেছে। ব্রহ্ম আমাকে অধিকার করিয়াছেন তাই আশ্চর্য্য করিয়াছেন। জানিবে, এই যোগ শাস্ত্র এই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় অর্থ।

স্বর্গীয় কল্পনা। *

রবিবার, ২রা আষাঢ়, ১৮০১ শক ; ১৫ই জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যের মনে যে সকল বৃত্তি আছে তন্মধ্যে কল্পনা অতি আশ্চর্য্য বৃত্তি। ইহার কার্য্য কৌশল দর্শন করিয়া অবাক হইতে হয়। ইহাকে ভাল করিয়া না জানিলে পদে পদে ব্যাঘাত হয়। ইহাকে জানিলে উন্নতি এবং প্রলোভন ও অভিলাষের উপরে আত্মার জয় হয়। ইহাকে কিরূপে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হয়, কি নিয়মে নিয়মিত করিতে হয়, ইহার দ্বারা কিরূপে কার্য্য সাধন করা যায় জানা উচিত। চিত্তকে নির্ম্মল করিতে, মোক্ষধামে যাইতে কল্পনাকে সহায় করিতে হইবে। কল্পনাই শত্রু, কল্পনাই মিত্র, কল্পনা নরকে লইয়া যায়, কল্পনা স্বর্গে লইয়া যায়। দ্রুতগামী হইতেও দূরগামী কল্পনা। যদি কেহ মুহূর্ত্ত মধ্যে এক শত বৎসর অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে চায়—কল্পনা। অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড পৃথিবী নির্ম্মাণ করিতে হইবে—কল্পনা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারে মিলাইয়া ফেলিবে—কল্পনা। যেখানে কেহ নাই সেখানে কোটী লোক আনিতে হইবে—কল্পনা। যেখানে লোক আছে বিলোপ করিতে হইবে,—তাহাও কল্পনা। মনুষ্যের ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া আশা উদ্যম উপস্থিত করে, আবার উহাই বিঘ্ন বিপদ আনয়ন করে। কল্পনা বন্ধু হইলে নিমেষের মধ্যে সমুদয় বিঘ্ন বিপদ বিনাশ হয়, ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক হয়। কল্পনার সহস্র হস্তের অস্ত্রে সমস্ত অধর্ম্ম কাটিয়া যায়, আবার কল্পনাতে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক হয়। এমন চমৎকার বৃত্তি আর নাই। ইহার আকার ধূমের মত, কোন আকার নাই। ধূম পান করে,

ধূম আহার করে, ধূম-শয্যায় শয়ন করে, ধূমে পরিপুষ্ট হয়, ধূমের ভিতরে ইহার সমুদয় সম্পত্তি। অথচ ইহার ক্ষমতার সীমা নাই, ইহার রাজ্য অতি বিস্তৃত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার রাজ্য। লেখনী ইহার বিষয় লিখিয়া উঠিতে পারে না, মুখ ইহার বিষয় কিরূপে বলিবে? যদি তত্ত্ব জানিতে চাও এই কল্পনাশক্তিকে আবিষ্কার কর।

এই যে কল্পনা, ইহার দাস নহে এমন কেহ নাই। ইহা নরকের পথ পরিষ্কার করে, অনায়াসে নরকে লইয়া উপস্থিত করে। নরকের ভিতরে বাস করিতেছে, সেখানে স্বর্গ আনিয়া মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। কল্পনার আদেশ পালন করিতে গিয়া মানুষের মন দুর্ব্বল হয়, পাপে পড়ে। জগতে পাপ আছে, ইহা বলিতে পারা যায় না। পৃথিবীর ভূমি স্বর্গ, পৃথিবীর বস্তু নির্দ্দোষ, পৃথিবীর অণুমাত্র পাপ নাই, অপরাধ নাই। যে হস্ত স্বর্গ রচনা করিয়াছে সেই হস্ত পৃথিবী রচনা করিয়াছে, দুইই সমান পরিশুদ্ধ। একটাকে স্বর্গীয় বলা ভাল বলা, অপরটাকে তাহার বিপরীত স্থির করা, ইহা মিথ্যা। উভয়ই পবিত্রতা নির্ম্মিত সুতরাং এক, কোন তারতম্য নাই। কল্পনা পৃথিবী ও স্বর্গে তারতম্য করে। একটা উৎকৃষ্ট আর একটা নিকৃষ্ট ইহা কল্পনার জন্য। কল্পনা চক্ষুকে ধূলা পূর্ণ করিয়া অন্ধ করিয়া দেয়, পৃথিবীর কিছু দোষ নাই। মানুষ ভ্রম বশতঃ বলে, প্রলোভন পাপের দিকে টানে। প্রলোভন কিছুই নাই, প্রলোভন কল্পনা। কল্পনা তাড়াইয়া দিতে পারিলে ধন ধান্য অট্টালিকা উদ্যান, উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী, নর নারী, কিছুই আর প্রলোভন হয় না। সুখের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মন প্রলুব্ধ হয়, পাপে মন আকৃষ্ট হয়, চুরি

করিতে প্রবৃত্তি হয়। চুরির ইচ্ছা কাহার? যদি সত্য চক্ষে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, যে জিনিস চুরি হইল সে জিনিস চোর নহে, যে বাড়ীতে চুরি হইল সে বাড়ী চোর নহে, যাহার ধন চোরে লইয়া গেল সে চোর নহে। বস্তু যদি মন্দ হয়, আর দশ জন দেখিলেও সেই পথে চলিত। বস্তুতে প্রলোভন নাই, প্রলোভন মনে। বস্তুকে প্রলোভন করিয়া সৃজন করা, ঈশ্বর এ দোষ করিতে পারেন না। যত কিছু রং আমাদের কল্পনাতে, নতুবা সকলই সাদা। একজন সুন্দর একটী স্ত্রীলোককে দেখিল, দেখিয়া তাহার মন কাল হইল, আর একজন তাহাকেই দেখিয়া শুভ্র হইল, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইল। একজন একটী টাকা লইয়া তখনই মদ্য পান করিল, আর একজন তাহা তখনই কোন ভাল কার্য্যে ব্যয় করিল। একই টাকার মধ্যে একজন স্বর্গ দেখিল, আর একজন ভয়ানক ব্যভিচারে পড়িল, নরকে ডুবিল। টাকা সাদা, দেখিতে গোল, দোষশূন্য, কিন্তু সেই টাকা তুমি এক আকার, আমি আর এক আকারে দর্শন করি। তুমি উহা দ্বারা পাপ করিলে, আমি পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। এরূপ ভিন্নতা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? কল্পনা হইতে। একই বস্তুতে একজনের স্বর্গ আর একজনের সর্ব্বনাশ হইল। পৃথিবী সাদা, কিন্তু মানুষের কল্পনাতে উহা কাল হইতেছে।

পৃথিবী স্বর্গ হয় মহাদেবের এই ইচ্ছা। উহা কেবল মানুষের কল্পনার জন্য মন্দ হইতেছে। যে ফুল দেখিলে ঈশ্বরের শুদ্ধ মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ফুল লইয়া মনুষ্য জঘন্য হয় কেন? ফুল দেখিয়া একজন ভক্তিতে মগ্ন হইল আর একজন নরকে ডুবিল।

এ বিভিন্নতা কেন? এক কল্পনার বিভিন্ন বর্ণে এরূপ হইল। অন্তরে কল্পনা করিয়া করিয়া পাপের সুখ অনুভব করে, ভিতরে নরক প্রস্তুত করে, তৎপরে বাহিরে নরকের ছায়া পড়ে। কল্পনা বিকার আনিয়া চিত্তের এইরূপ অবস্থা করে, পাপে তখন আমোদ হয়, পাপ-শয্যায় শয়ন করিয়া সুখ পায়। যেখানে কোন পাপ নাই, সেখানে পাপ ভাবিতে ভাবিতে পাপ আসিয়া পড়ে। যেখানে স্বর্গের ব্যাপার সেই স্বর্গের ব্যাপারের মধ্যেও পাপ আইসে। আজ একটীও পাপ কর নাই, কুচিন্তা মনে আইসে নাই, দুবার বেশ উপাসনা করিয়াছ, কেবল আধ ঘণ্টা নির্জনে বসিয়াছ, অমনই সংসার আসিল, আসিয়া মায়ারজ্জু বাঁধিয়া দিল, পাপ হইল। কেহ বলিল না, কেহ পাপ করিতে অনুরোধ করিল না, ইচ্ছা হইল, পাপ বাসনা মনোমধ্যে আসিল। বাহিরে কিছুই নয়, বিকার ভিতরে। আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর সাধন করিলে কোথায় স্বর্গে যাইবে, না মনে মনে নরকে গিয়া বসিয়া আছ। স্বর্গে গেলে কি হইবে? যাহার মনে পাপ কল্পনা সে স্বর্গে গেলেও তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে না। মনে পাপ। বাহিরে চুরির বস্তু নাই, তুমি ভিতরে ভিতরে চুরি করিলে, যে টাকা চুরি করিলে তাহাও কল্পনা, যে হাতে টাকা ধরিলে সে হাতও কল্পনা। কল্পনাই টাকাকে ভয়ানক প্রলোভন নির্ম্মাণ করে। যে হাতে টাকা ধরিয়া সুখ হয় তাহাও কল্পনা। এখানে সত্য নাই, কেন না ভিতরে হাত নাই, বাহিরে লোভও কিছু নাই। ভয়ানক কল্পনা-শত্রু পাপ-রাজ্যে চোর হইল। বাহিরে সে সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে চোর, ঈশ্বরের নিকটে দণ্ড পাইবে।

কল্পনা পাপের কারণ। কারণ যেখানে পাপের কারণ নাই,

সেখানেও কল্পনা পাপ আনয়ন করে। স্বপ্নে কত নরহত্যা করিলাম। নিদ্রাবস্থায় যেমন মনুষ্য কল্পনার অধীন হয়, জাগ্রদবস্থায় তেমনই কল্পনার অধীন হইয়া মনুষ্য বড় বড় পাপ করে। কল্পনার ন্যায় এমন শত্রু আর জগতে নাই। কল্পনা করিও না, কল্পনায় পাপ চিন্তা করিবে অমনই বদ্ধ হইবে। এই কল্পনা অতি ভয়ানক, ইহা সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখিবে। এই কল্পনার বিপরীত কল্পনা বন্ধু। যাই কল্পনা নরক নির্ম্মাণ করিতে বসিবে, অমনই তৎক্ষণাৎ উহার বিপরীত দিকে গিয়া বিরোধী কল্পনাকে ডাকিয়া আনিবে। নীচ কল্পনা নরক নির্ম্মাণ করিতেছিল, স্বর্গীয় কল্পনা সে স্থানে স্বর্গ গাঁথিবে। একজন নীচ কল্পনার দাস হইয়া পাপ অন্ধকার আনিল, কুৎসিত জঘন্য পুস্তক কুদৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিল, স্বর্গীয় কল্পনা সাধুমণ্ডলীকে আনয়ন করিল। তাঁহাদের সমুদয় রীতি সুনীতি জ্যোতি আনিয়া উপস্থিত করিল। ক্রমান্বয়ে এই স্বর্গীয় কল্পনা-খড়্গ লইয়া পাপ কাটিতে থাক, পাঁচ দিন দশ দিন যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিতে পাইবে এই যুদ্ধে স্বর্গীয় কল্পনার জয় হইল। পৃথিবীর কল্পনা দৃষ্ট বস্তু লইয়া, সুতরাং পরিমিত, উহার ক্ষমতারও সীমা আছে। স্বর্গীয় কল্পনার ন্যায় পার্থিব কল্পনা অসীম নহে। ধর্ম্মের কল্পনা অনন্ত ঈশ্বরকে লইয়া, যে তাঁহাতে মগ্ন হইয়াছে সে চিরকালের বিষয় লাভ করিয়াছে। পাপের শক্তির অন্ত আছে, কেন না জীবন-তরী এক দিন ঠেকিবেই ঠেকিবে।

স্বর্গীয় কল্পনা দ্বারা পার্থিব কল্পনাকে জয় কর। সর্ব্বদা ধর্ম্মের কর্ম্ম কর। কর্ম্ম করিতে করিতে এক পার্শ্বে এক সাধুকে, আর এক পার্শ্বে শ্রীমদ্ভাগবত রাখ। মস্তকে সুধা বর্ষিত হইবে, হৃদয়ে

বারি ধারা পড়িবে, জীবনে প্রসন্নতা এবং অমৃত সুধা প্রদেশ করিবে, মধুর সঙ্গীত ক্রমান্বয়ে কাণে প্রবেশ করিতে থাকিবে। পুষ্প বুকে রাখিবে, আর পুষ্পের সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে স্বর্গ অনুভব করিবে। পৃথিবীতে এমন একটী বস্তু নাই, যাহা বিশুদ্ধ কল্পনা দ্বারা স্বর্গের বস্তু না হয়। বিশুদ্ধ কল্পনাযোগে দেখ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শত শত নর নারী ভিতরে দেখিতে পাইবে। এই স্বর্গীয় কল্পনাতে প্রেরিত মহাজন আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যান, তাঁহার রক্তে রক্ত, মাংসে মাংস, হৃদয়ে হৃদয় হইয়া আমার ভিতরে তিনি বাস করেন। সাধক বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, লোকে বলিল ইনি বড় ঋষি হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, সে সময়ে পাঁচ হাজার যোগী তাঁহার সঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন। প্রকাণ্ড ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। ভক্ত ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া নাচিলেন, শত শত ভক্ত তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ বলিল, এ সকল স্বপ্ন, ব্রাহ্ম স্বপ্ন দেখিতেছেন। সজোরে এ কথার প্রতিবাদ করিতেছি। বিশুদ্ধ কল্পনা কল্পনা নহে, উহা সাক্ষাৎ দর্শন। অবিশুদ্ধ কল্পনা মিথ্যা। অবিশুদ্ধ কল্পনায় মানুষ যাহা কিছু করিল সকলই মিথ্যা। উহার শাখা ফল মূল কিছুই সত্য নহে। পার্থিব কল্পনার যত কিছু ছবি সকলই অলীক। এখানে কল্পনা শব্দেরই অর্থ মিথ্যা। বিশুদ্ধ কল্পনার সকলই সত্য, পরম সত্য। পরলোক স্বর্গ যাহা কিছু আত্মা ভাবিবে, উহাতে কল্পনা নাই। এখানে কল্পনা দর্শন। পাপরাজ্যের কল্পনাই মিথ্যা। যাহাতে ধর্ম্মের সম্বল হয় তাহা কল্পনা নহে। তুমি যাহা কল্পনাযোগে ধারণ করিতে যাইতেছ, তাহা সত্যের এক অংশ মাত্র হইবে। তুমি স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলে, স্বর্গের যে বস্তু সম্ভোগ

করিবে তুমি তাহার লক্ষ অংশের একাংশ মাত্র অনুভব করিলে। তোমার চারিদিকে সাধু বসিয়া আছেন, নাম জান না যতটুকু পারিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিলে। তোমার সর্ব্বাঙ্গে সাধু তুমি হয় ত দু পাঁচ জনের নাম জান! আমাদের রক্তের ভিতরে হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গের ব্যাপার, আমরা কত কল্পনা করিব? কোটী বৎসর এইরূপে চলিয়া যাইবে কিন্তু তথাপি ইহার সীমা হইবে না। তুমি চিন্তা দ্বারা ইহার কিছু সৃজন করিতেছ না। যাহা বাস্তবিক আছে তাহার সামান্য দু একটার চিন্তা করিতেছ। ইহাকে আর কল্পনা বলিতে পারি না। ধূলির ন্যায় অল্প একটা সত্য গ্রহণ করিলে ক্রমে ইহা সমুদয় অধিকার করিয়া বসিবে। আজ যাহা কল্পনা, আর এক দিবস তাহাই দর্শন হইবে, স্বর্গের সৌন্দর্য্য শান্তি দেখাইয়া দিবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পৃথিবীকে উড়াইয়া দিলে, বাস্তবিক পৃথিবী নাই, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিলে। সাধু সজ্জন সকলে হৃদয় মধ্যে আছেন, ইহা সকলই বাস্তবিক। যদি অবিশুদ্ধ পার্থিব কল্পনাকে মারিতে চাও, স্বর্গীয় বিষয় চিন্তা কর, পরলোকে সাধুগণের মধ্যে বসিয়া থাক, সর্ব্বদা শাস্ত্র চিন্তা কর, অশরীরী আত্মার রাজ্যে গিয়া বাস কর, স্বর্গের বিষয় ভাব। এরূপ করিলে ঐ সকলই কেবল ভাল লাগিবে, অসার আর কোন বস্তুই ভাবনায় ভাল লাগিবে না। দিন দিন বিশুদ্ধ কল্পনার রাজ্য বাড়িতে থাকিবে, পৃথিবী হইতে উহা ঊর্দ্ধে উঠিবে। আকাশের পর আকাশে উঠিয়া সূর্য্যালোক চন্দ্রলোক ধ্রুবলোক অতিক্রম করিয়া যোগিগণের সঙ্গে আনন্দধামে সত্যধামে উহা বাস করিবে, পৃথিবী উহার নিকটে বিলুপ্ত হইবে।' যদি যোগী হইতে চাও, সুখ হইতে উচ্চতর সুখে আরোহণ করিতে

যদি অভিলাষ হয়, তবে বিশুদ্ধ কল্পনাকে আশ্রয় কর, সকলই সিদ্ধ হইবে।

নূতন দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ। *

রবিবার, ৯ই আষাঢ়, ১৮০১ শক; ২২শে জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দেশীয় শাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কথা তোমরা শ্রবণ করিয়াছ। আজ এক নূতন প্রকারের দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিতেছি। দুই কি এক, এক কি দুই, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। পৃথিবী সাদা কি কাল, কি সাদা কালতে মিশ্রিত? ইহা শুদ্ধ—না স্থানে স্থানে অশুদ্ধ, আলোকময়—না স্থানে স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন, কাল রঙ্গে আবৃত? এক মঙ্গল অভিপ্রায় হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমুদ্ভব হইয়াছে, না অন্য অভিপ্রায় হইতে? উহার মধ্যে সকলই সুখ না দুঃখও আছে? সকলই ভাল না মন্দও আছে? যদি দুঃখ থাকে মন্দ থাকে, তাহা হইলে উহা মনুষ্যের হাতের রচনা, না বিশ্বাধিপতি রচনা করিয়াছেন, এখানে ভাল মন্দ মিশ্রিত, না কেবলই অমিশ্রিত ভাল, মন্দ নাই? ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি ব্যাপার যতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারা সকলগুলি ভাল, সকল মঙ্গল, না কতকগুলি হইতে ভাল কতকগুলি হইতে মন্দ হইতেছে? কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা এই জগতে ভাল মন্দ দুইই দেখিয়া একজনকে মঙ্গলের স্রষ্টা, আর একজনকে অমঙ্গলের স্রষ্টা স্থির করেন। কোন দয়ালু ঈশ্বর মন্দের স্রষ্টা হইতে পারেন না, সুতরাং মন্দের আদি কারণ স্বতন্ত্র চাই। ভাল মন্দ দুইই মিশ্রিত হইয়া

বিশ্ব মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। একজন হইতে ভাল, একজন হইতে মন্দ,—দ্বৈতবাদ হইল। এক দিকে দেবতা, আর এক দিকে অসুর, এক দিকে সূর্য্য আর এক দিকে অন্ধকার, এক দিকে সাধু আর এক দিকে অসাধু, এক দিকে দয়া, আর দিকে নিষ্ঠুরতা। দুই আদি কারণ, দুয়েরই কার্য্য দেখিতেছি। এ দুই আদি কারণ স্বতন্ত্র, এক নহে, একটীকে কার্য্য অপরটীকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মন্দ কর্ম্ম মন্দ কারণ হইতে, ভাল সমুদয় ভাল হস্ত হইতে, এই কি তোমার মত? তুমি কি বল দুই কারণ, এক কারণ নয়? এত কষ্ট, বিপদ, সর্ব্বনাশ, রাজ্যবিপ্লব, রাজ্যবিনাশ, রোগ শোক, মহামারী, দুর্ভিক্ষ্য, ঝটিকা, উৎপাত এ সমুদয় ঈশ্বর হইতে নহে? নিশ্চয় ঈশ্বর ব্যতীত আর এক আদি কারণ, মন্দ আছে। এই অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর অর্দ্ধেক বিশ্বের স্রষ্টা, অপরার্দ্ধ অন্য হস্ত রচিত। তোমরা দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী? এক ঈশ্বর, এক কারণ, দ্বিতীয় নাই, সমুদয় মঙ্গল হইতেছে। তিনি ভিন্ন অন্য আর কারণ হইতে পারে না, আদি দেব একই। বিপরীত স্বভাব সেই আদি কারণ কখনই সম্ভবে না। মন্দ নাই, দুঃখ নাই, অসুখ নাই, রোগ নাই, তোমার চক্ষু যে সকল রোগ শোকের কষ্ট দেখিতেছে ইহার মধ্যে আনন্দ আছে। আপাততঃ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা ঈশ্বরের কার্য্য বলিতে পারি না, কিন্তু চরমে যাহা যাহা দেখিতে পাইবে, তাহাতে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হইবে।

যে সকল লোক কেবল অমঙ্গল দুঃখ শোক ভাবে তাহারা সন্দেহ করে, জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি মঙ্গল স্বরূপ কিরূপে? অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম অনুরাগবিহীন ব্যক্তি এরূপ না বলিবে ত আর কি

বলিবে? এ বিষয়ের মীমাংসা চাই। দুঃখ কেন হইল? যদি বিশ্বস্রষ্টার ক্ষমতা অসীম হইত, তবে তিনি পাপ দুঃখ অন্ধকার আনিতে দিলেন কেন? হয় তাঁহার ক্ষমতার অল্পতা আছে, না হয় তিনি দয়ায় পূর্ণ নহেন। যদি পূর্ণ দয়া হইবেন, তবে এমন নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল নিবারণ করিলেন না কেন? যদি তিনি পূর্ণজ্ঞান হয়েন, তবে এমন উপায় সংস্থাপন করিলেন না, যাহাতে পৃথিবীতে কেবল সুখই হইত দুঃখ অসম্ভব হইত? যদি তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র হইবেন তবে দোষের দ্বার খুলিয়া দিলেন কেন? দোষ ঘটিবার পথ রাখিয়াছেন কেন? ঈশ্বর এ সকল জানিতেছেন ও দেখিতেছেন, তবে কেন উপেক্ষা করিতেছেন, কেন নিবারণ করিতেছেন না, কেন ইহার উপায় করিতেছেন না? যদি এইরূপ হইল তবে কিরূপে বলিবে, তিনি সমুদয়ের কর্ত্তা। থাক, তুমি চিন্তা কর, তুমি দ্বৈতবাদী হইবে কি অদ্বৈতবাদী হইবে? দুই ঈশ্বর নাই, দুই আদি কারণ নাই, পৃথিবী সমুদয় মঙ্গলে পূর্ণ, এক কল্যাণ সকল হইতে হয়; এ কথা ক্ষুদ্র শিশুও বুঝিতে পারে, অজ্ঞানও দেখিতে পায়। অন্ধকার দেখিয়া যে ক্রন্দন করে সে ভ্রান্ত। এ অন্ধকার মন্দ নয়; লোকে কিরূপে নিদ্রা যাইত যদি সমস্ত রাত্রি, প্রতিদিন অন্ধকার না থাকিত? অন্ধকার না থাকিলে ঘর বাড়ী দুর্গ স্থাপিত হইত না লোকে আপনাকে অসহায় মনে করিয়া সাহসী হইত না। অন্ধকার হইতে ভয় না হইলে কে সাহসী হইতে পারে? শত্রুর আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা, জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা অন্ধকার হইতে হইল। সুতরাং অন্ধকার শত্রু না হইয়া মিত্র হইল। এই অন্ধকারের ভিতর গূঢ়তর রহস্য বুঝা গেল।

অন্ধকারের রহস্য যথার্থ জ্ঞানী বুঝেন, অজ্ঞানিগণ ইহাতে ভয় দর্শন করে।

জগতে কাল বস্তু নাই এবং কাল বস্তু আছে, ইহা লইয়া দুই পথ হইয়াছে। বাস্তবিক এমন ঘটনা আছে, যাহাতে কষ্ট পাইতে হইতেছে, বিষণ্ণ হইতে হইতেছে। পূর্ণবিশ্বাসীদিগকেও ঈশ্বর এত কষ্টে কেন ফেলিলেন, জগতে অন্ধকার জ্যোতি কেন মিশ্রিত করিলেন, বিপদ সম্পদ বারবার কেন সুখ দুঃখের চক্রে ঘুরিতেছে বুঝিতে পারা যায় না। এ সকল কেন করিলেন সন্দেহযুক্ত মন এ কথা জিজ্ঞাসা করে অথচ ভাল উত্তর দিতে পারে না। রোগ আছে শোক আছে, মৃত্যু আছে ইহার উত্তর কি? সময়ের যত ঘটনা আছে সমস্ত ঘটনা পরস্পর সংযুক্ত। অকস্মাৎ কিছু হয়, ভক্তির অভিধানে এরূপ কথা নাই। সংসারের সাদা কাল যাহা কিছু দেখা যায়, ইহা বিচিত্র ঘটনা। একখানি চিত্রে যেমন বিবিধ রঙের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড সেই প্রকার নানা রঙের একখানি ছবি। কোথাও রোগ, কোথাও সুস্থতা, কোথাও পূর্ণতা, কোথাও জ্ঞান, কোথাও সভ্যতা, কোথাও অসভ্যতা, কোথাও শান্তি, কোথাও বিপ্লব এ সকল কি কিছুই জান না? এক সময়ে মন খুব উৎসাহী হইতেছে, আবার এমন অবস্থা আছে যে, একটুও উৎসাহ হয় না। এই যে সমুদয় অবস্থার বিরুদ্ধ ভাব, ইহার মধ্যে কি বৈষম্য দেখিতেছ? অবিশ্বাসী ব্যক্তি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়, ঐ দেখ সাদা, ঐ দেখ কাল; সাদা মঙ্গল, কাল অমঙ্গলে ডুবিয়া রহিয়াছে। ভক্ত বলিলেন, ও সমুদয়ই সাদা। রোগ শোক মৃত্যু যাবতীয় ব্যাপার দেখিতেছ, সমুদয় একেই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা।

কাল কাল নহে, মুক্তি শাস্ত্রের উহা এক একটী পরিচ্ছেদ। এক শাস্ত্র; অনন্ত বেদ—ইহাতে এক একটী নূতন পরিচ্ছেদ সংযুক্ত হইতেছে। সমুদয় পাঠ কর তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে শাস্ত্র একখানি। উহাতে বিরুদ্ধ শব্দ নাই, পরিচ্ছেদ নাই, ঘটনা নাই, সর্ব্বত্র আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। একজন যদি সমুদয় শিখিতে পারে, সমুদয় পুস্তকে একই ভাব দেখিতে পাইবে। জীবন সাধন দ্বারা উন্নত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখ মঙ্গলের কারণ, অন্ধকার উন্নতির কারণ, বিপদ মৃত্যু সম্পদ। বিশ্বাসী নয়ন এ সকলের মধ্যে কাল কিছুই দেখিতে পায় না। উহা কোন অদ্ভুত চিহ্ন চাহিল না। যাহা ঘটিতেছে তাহার মধ্যে সকলই মঙ্গল দেখিবে।

যে সকল ঘটনা তোমাদিগের নিকটে অকল্যাণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, যদি পুস্তকের অপরার্দ্ধ পড়িতে পার, এই সকল ঘটনা হইতে জগতের কি কল্যাণ হইতেছে, সেই সকলে কি মঙ্গল হইতেছে, জানিতে পার। বিশ্বাস আর কিছু করে না, চুপ করিয়া পরলোকে গিয়া মর্ম্ম জানিয়া আইসে। তখন বিশ্বাস এক একটী ঘটনার মহিমা দর্শন করে, উহা কেমন কল্যাণকর। উহা হইতে কেমন পবিত্রতা সমুৎপন্ন হয় হৃদয়ঙ্গম করে। অসীম পবিত্রতার প্রবাহে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদি ক্রমে প্রবাহিত হইবে, অনেক ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটিবে, আজ যাহা ঘটিতেছে, পাঁচ সহস্র বৎসরের সঙ্গে ইহার যোগ আছে। আজ মানুষ জন্মিতেছে, অসাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছ, কিন্তু সেই দৃষ্টান্তই আমাদিগের পবিত্রতার হেতু হইতেছে। এই সমুদয়ের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যাহা ঘটিতেছে, ঘটনার সঙ্গে পবিত্রতা আসিতেছে। কার্য্য হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল ঘটনা হইতে মুক্তি

হইতেছে। এইজন্য সমুদয় ঘটনার পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে। এই ঘটনাগুলি না ঘটিলে কেহ ভাল হইতে পারে না। যত মন্দ ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রত্যেক ঘটনা হইতে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে। ভয়ানক ঘটনাও মুক্তিদাতার হস্তে ভ্রাতার মুক্তির কারণ হইয়াছে। যদি ঈশ্বরের রাজ্য হয় তাহা হইলে সমুদয় ঘটনা মঙ্গল এবং মুক্তির কারণ হইবেই হইবে। বিশ্বাস চক্ষে যে সকল দেখা যায়, সে সকল ঘটনার সমতা হয়। সমুদয় ঘটনা ঘটিয়া গেলে সমষ্টি যোগ করিলে যে একটী ফল হয়, সংসার তাহার চাকা। সেই চাকা ঘুরিতেছে এবং সাধক প্রার্থনা শিক্ষা ও প্রত্যাদেশ এবং পবিত্রতা লাভ করিতেছে। মুক্তিদাতা ঈশ্বর যখন কল্যাণের প্রেরয়িতা তখন একটী ঘটনা হইতে, বিপদ হইতে, মন্দ হইতে পারে না। যদি আজ লক্ষ লোক মরিয়া যায়, তথাপি বলিব, জয় বিশ্বেশ্বরের জয়, বিশ্বেশ্বরের জয়, জয় বিশ্বেশ্বরের জয়। দেখ বিশ্বাস-নয়নে দেখ, ঈশ্বর প্রকাণ্ড ঘটনা সকল হইতে জগতের পবিত্রতা সংঘঠন করিতেছেন। অমুক ঘটনা না হইলে হইত, অমুক ঘটনায় বিশ্বেশ্বরের নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইল, অবিশ্বাসীর মুখে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মৃত্যু কিছুই নয়, এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া। কোটী কোটী লোক মরিতেছে, তাহারা এখান হইতে ওখানে যাইতেছে। ইহলোক পরলোকের ব্যবধান কি কিছুই নয়? দশ বৎসর চল্লিশ বৎসর এখানে কষ্ট পাইলে তাহাতেই বা কি হইল?

সে সমুদয়ের যোগে কি হইল, সেই বিপদ হইতে শেষে কি সিদ্ধ হইল—ভক্ত হইলে, জানিতে পার। অধিক আর আলোচনা করিয়া দেখিতে হয় না, আপনার জীবনেই বিশেষ উন্নতি দেখিবে।

ভাল খাইয়া যত উন্নতি হয়, না ভাল না খাইয়া তত উন্নতি হয়? অসুখ অমঙ্গল হইতে মঙ্গল হইল। দৃষ্টান্ত উদাহরণ দেখিবার প্রয়োজন নিজের অল্প বিশ্বাস হইতে হয়। পূর্ণ বিশ্বাসী হইলে আর এরূপ যুক্তি ধরিতে হয় না। একেবারে বলিব, সমুদয় সাদা পাথর। কালের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাহা দেখিতেছি, সুখ দুঃখ তাহার নাম; কিন্তু এই সুখ দুঃখ, আলোক অন্ধকার, একই অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। আপনার জীবনে সমুদয় সংলগ্ন করিয়া ঠিক দিলে দেখিতে পাইবে, যতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে প্রত্যেক ঘটনা ভাল হইয়াছে। ধন হানি, মান হানি, আত্মীয় জনের মৃত্যু, ঘোর বিপদ দুষ্কর্ম্ম নাস্তিকতা, ঘোর অন্ধকারের অবস্থা মনে করিয়া দেখ, এই সকল মন্দ অবস্থা হইতে ব্রাহ্ম হইলে। ঈশ্বরের রাজ্যে ঘটনা সকল পরস্পর সংলগ্ন। মন্দ ঘটনা ঘটে আবার সেই ঘটনা হইতে অনেকে ব্রাহ্ম হয়। মন্দ ঘটনা হইতে ভাল আর কে আনিতে পারে? কেবল ঈশ্বরই আনিতে পারেন। মানুষ ভাল হইতে পারে, কিন্তু বিপদ ভিন্ন সে কখনও ভাল হইতে পারে না। জঘন্য লোকের ভিতরে স্বর্গ কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মই আনিতে পারেন। আপনি দুষ্কর্ম্ম করিলে, পাপ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে উহা কিছুতেই ছাড়িতে পার না। ভাল প্রতিজ্ঞা করিলে অমনই নরক ছাড়িয়া নিমেষের মধ্যে বিশুদ্ধ হইলে। মন্দ হয় ভাল হইবার জন্য, অসাধু হয় সাধু হইবার জন্য, বঙ্গদেশের যত মন্দ অবস্থা হইয়াছে, আরও মন্দ অবস্থা হউক ক্ষতি নাই, ইহাতে যত্ন বাড়িবে। বঙ্গদেশের মন্দ হওয়া উচিত তাহা নহে, কিন্তু এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মন্দ হইলেও সত্যের বিলোপ হইবে না, সত্যের জ্যোতি আরও প্রবলতর

হইবে। যত মন্দ হয়, তাহা হইতে ঈশ্বরের রাজ্যে আরও ভাল হইবে। যত ঘোর রাত্রি খুব অন্ধকার হয়, প্রত্যূষে তত আলোকযুক্ত হয়। যেখানে রাত্রি কম সেখানে প্রত্যূষও কম। ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে জ্যোতি বাহির হয়। ঈশ্বরের হাতে মস্তকচ্ছেদন হইলে তাহাতে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, মন্দ কেহ থাকিতে পারে না। মানুষ যে পাপ করে, তাহা হইতেও তিনি স্বর্গধাম দেবধাম প্রস্ফুটিত করেন। সমুদয় ঘটনা রক্ষা করেন, সাধনের পথে তিনিই টানিয়া আনেন, পরিবারের অবস্থা, আমার অবস্থা উন্নত করেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি, কেন না দুঃখ আসিয়াছে বলিয়াই তোমরাও এত ভাল হইলে সাধু হইলে।

প্রেম। *

রবিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৮০১ শক ; ২৯শে জুন, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল তাহা যদি কোন একটী কথায় সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তবে একটী কথা আছে সে কথা প্রেম। যাহা কিছু সাধু, যাহা কিছু ভাল সমুদয় এই এক শব্দে নিহিত আছে। এই শব্দের ভিতর যে ভাব আছে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইলে সমুদয় ধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। প্রেমই পরিত্রাণ, ভালবাসাই স্বর্গ। যে ঋষি বলিয়াছেন, ভালবাসিলে মুক্তি, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বলিয়াছেন। হৃদয়ে প্রেমকে স্থান দেওয়াই ধর্ম্ম। হৃদয়ে প্রেমকে স্থান দিলে ঈশ্বরকে জানি মনুষ্যকে জানি। মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখিয়া ধর্ম্ম করিবে, তাঁহার পূজা করিবে। যাহার হৃদয় নাই,

সেই শঠ কঠোর মনুষ্য সকল প্রকার পাপ অধর্ম্ম করিতে পারে, সে মনুষ্য নহে, ব্যাঘ্র সিংহাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে গণ্য। যে লোক অন্তরের সহিত মানুষকে দেবতার ন্যায় ভালবাসে, তাহার হৃদয়ে কুভাব আসিতে পারে না। ভালবাসিয়া তখনই স্বর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেম অধিক হইলে তখনই স্বর্গের সুখ অনুভব হয়। যথার্থ প্রেম সমুদয় শাস্ত্রের সার। সমস্ত ধর্ম্মব্রত সমুদয় পাপ খণ্ডন করিবার অস্ত্র ভালবাসা। যদি এই ভালবাসা না থাকে কঠোর তপস্যা বা দুই ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা ধ্যান করিলে কি হইবে? সমুদয় জগৎ ধার্ম্মিক বলিয়া প্রশংসা করুক, বহু শাস্ত্র পাঠ করিয়া, বহু উপধর্ম্ম সাধন করিয়া, যোগী তপস্বী ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা হউক, উপাসক বলিয়া সুখ্যাতি হউক, ভিতরে যদি দয়া না থাকে তবে জলশূন্য নদীর ন্যায় সকলই বিফল। মনুষ্য নাম, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব দয়াতে, সেই দয়া তোমার ভিতরে আছে। এই দয়া ছাড়িয়া সহস্র সহস্র লোক ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হইতে পারে, কিন্তু হে ব্রাহ্ম, তুমি এ মতে প্রবিষ্ট হইতে পার না, এ শ্মশানবাসীর ভয়ঙ্কর মত। ইহাতে জীবন নাই মৃত্যু, সমুদয় জীবন শ্মশান, কোন সুখ নাই। যাহার দয়া নাই—তাহার জিহ্বা কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? গান কর, কিন্তু প্রকৃতি ঠিক না থাকিলে পুণ্য স্থান পায় না। দয়া নাই, জনসমাজে বাস করিয়া সুখী বলিয়া অহঙ্কার করিবে সাধ্য কি? সুখী হইবে কি প্রকারে প্রকৃত হৃদয় যে নাই। সুখ দয়া হইতে, পরিত্রাণ দয়া হইতে। দয়া একটী সামগ্রী, উহা সুখ ও পুণ্য দুইই উপলব্ধি করিবে। ঈশ্বরের সন্তান আমাদিগের ভাই ভগ্নীর দুঃখ দূর করিলে, সুখ বর্দ্ধন করিলে কত সুখোদয় হয়।

ভাবিয়া দেখ আমরা বিদেশে নাই, বিদেশের লোকের সঙ্গে আমাদিগের বাস নহে, স্বদেশে স্বজাতি মধ্যে বাস করিতেছি, নিজের ঘরে পরিবার মধ্যে আছি।

সকলে আমাদিগের ভাই ভগ্নী। এ সকল রাস্তার লোক নয়, বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইবার লোক নয়। আমি তাহাদিগকে প্রেমচক্ষে কেন দেখিব না? এ ভাই ভগিনীর সংসার, ইহাদের অভাব মোচন করিব না কেন? আমার ঘরে আমি আছি, বিদেশের রাজ্য সম্বন্ধে কিছু করিতে হইতেছে না, আমার রাজ্যের কার্য্য করিতেছি। যিনি বিদেশের কার্য্য করেন, তাঁহার তাহাতে মনের ব্যগ্রতা না থাকিতে পারে, আমি আমার মঙ্গল করিতেছি, আমার উপকার করিতেছি, আমার সংসারের কার্য্য করিতেছি, ইহাতে আমার উৎসাহ কেন কম হইবে? নিজের বলিয়া কার্য্য না করিলে কখনও ভালবাসা ধাবিত হয় না। যাহাদের সুখে সুখ, যাহাদের দুঃখে দুঃখ, তাহাদেরই যথার্থ কল্যাণ করা যায়। এই প্রকার প্রেমে সকলকে প্রেম করিতে হইবে। আত্মপর প্রভেদ থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে না। আপনার লোক ঘরের লোক বলিয়া সকলকে দেখিতে হইবে। বাড়ীতে থাকার কত সুখ, তুমি তখন জানিতে পার, যখন অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আইস। বিদেশ হইতে লোক স্বদেশে আসিলে মন কেমন সতৃষ্ণনয়নে দেশের সকল বস্তু দর্শন করে। যত লোকে দেশের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই আপনার লোক দেখিতে পায়, কত সুখী হয়। দেশে ঘরে বসিলে বিদেশের সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়। পিতা মাতা ভাই ভগ্নীকে দেখিয়া তোমার মন পুলকে পূর্ণ হয়।

ঘরে বসিয়া স্বজনবেষ্টিত হইয়া পূর্ণ সুখ লাভ হয়। পৃথিবী আমাদিগের ঘর, উহার মধ্যস্থলে বসিলে তৎক্ষণাৎ হৃদয় আহ্লাদে পূর্ণ হয়, সমুদয় যন্ত্রণা চলিয়া যায়। ঘরে বসিলে ভাই ভগ্নী নিকটে আসিলে আহ্লাদ আর ধরে না। ভালবাসার চক্ষে তখন সকলকে দেখিতে পারিবে, অনুরাগ বাড়িবে, সকলের প্রিয় হইবে। এইরূপে ভাল-বাসিতে গিয়া হৃদয়ে শান্তি আসিবে, সুখ হইবে। সেই সুখে পুণ্যের সুখ অনুভব করিবে। সমুদয় মানুষকে ভালবাসিলে হৃদয় তাহাদিগকে সেবা করিতে ধাবিত হইবে, কিসে পরের উপকার হয় কিসে পরকে সুখী করিতে পার এজন্য চেষ্টা হইবে। দুঃখীদিগকে ধর্ম্ম দিয়া সুখী করিবে, ভ্রান্ত জীবগণ কিসে সাধু হয় সুখী হয় সর্ব্বদা এই চেষ্টা হইবে। এই সকল করিতে গিয়া সমুদয় চব্বিশ ঘণ্টা এক ঘণ্টার ন্যায় বোধ হইবে। সমুদয় দিন সকলের মঙ্গল সাধন করিবে, ঘরে ঘরে গিয়া দুঃখ মোচন করিবে, ভাই ভগিনিগণকে জ্ঞানের আলোক দিয়া ধর্ম্মপথে আনিবে, তোমার শরীর মন বল বুদ্ধি সময় সমুদয় এই স্বর্গীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্বদা তোমার এক চিন্তা এক ভাব এক ব্রত এক উদ্দেশ্য থাকিবে, জগতের সেবা ভিন্ন অন্য কার্য্য অন্য ব্যবসায় থাকিবে না। সকলকে আপনার দেখিবে এবং ধনী হও, মানী হও, বিদ্বান্ হও, জগতের পদতলে আপনার সকল রাখিয়া দিবে।

ব্রাহ্ম, তুমি তোমার জ্ঞান, ধন, ধর্ম্মের আর কি ব্যবহার করিতে পার, কেবল ভাই ভগিনিগণের সেবাতে উহাদিগকে নিযুক্ত কর। তোমার মন পবিত্র হইবে, জীবন ধন্য হইবে। যদি দুটী দুঃখীর মুখে অন্ন দিতে পার, দুঃখ দুর করিতে পার, বস্ত্র উপহার দিয়া সেবা করিতে

পার, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের পথে আনিতে পার, তবে যত উহা স্মরণ করিবে, তত প্রেমে উন্মত্ত হইবে। দুঃখী দীনের প্রতি দয়া করিবে, শরীর মনকে দয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, কার্য্য করিয়া দয়া সাধন করিবে, এজন্য দয়াব্রতে মগ্ন হইতে হইবে। যখন পৃথিবীর সকল লোকের সঙ্গে যোগ হইবে, তখন তাহাদিগের দুঃখে তুমি দুঃখী হইবে, জগতের কষ্টে তোমার কষ্ট হইবে। যত দয়ালু হইবে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। তুমি ভাই হইয়া ভাইয়ের বিরোধী হইতে পারিবে না, যদি ভাইকে প্রতিহিংসা করিতে যাই আমি নরকে ডুবিব—এই বলিয়া ক্ষান্ত হইবে। অন্যে আক্রমণ করিলে, শত্রুতা করিলে, দয়ার কাছে সকলে পরাস্ত হইবে। যার চক্ষে প্রেম অধিক, সে আপনি সকলকে টানিয়া আনিবে। সে আপনি ক্ষমা করিবে, আপনি পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবে। সকলেই আপনার, সকলেই আমার, যাহা কিছু করিব আমারই প্রতি করা হইবে। যদি আমার বিদ্যা থাকে অপরের মূর্খতা দূর করিব, মূর্খকে জ্ঞানী করিব, আমার সংসারের সামগ্রী দিয়া অপরের উপকার করিব। লোভী হইব না, মন লোভী হইবে কি প্রকারে? তোমার দ্রব্য আমার দ্রব্য, তোমার বস্ত্র আমার বস্ত্র, সুতরাং মন নির্লোভী হইবে। যাহারা আপনার লোক তাহাদিগের বিরুদ্ধে কি প্রকারে অন্যায় করিব? এক ভালবাসাতে কাম ক্রোধ দ্বেষ অহঙ্কার সমুদয় রিপু হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিব। যথার্থ দৃষ্টিতে স্ত্রীজাতিকে ঈশ্বরের কন্যা জানিয়া তাঁহাকে ভগিনীরূপে দেখিব, মনে অপবিত্র ভাব অশুদ্ধ ভাব কি প্রকারে হইবে। ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া, আপনার ঘরের বলিয়া, ভগিনী বলিয়া, আর মন্দ ভাব কখনও আসিবে না;

পৃথিবীর মন্দ ভাব হইতে যে সকল পাপ উপস্থিত হয় তাহা আর থাকিবে না।

হে ব্রাহ্ম, তুমি দয়ালু না হইলে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হইয়া থাকিতে পার না। ঈশ্বরের প্রেম না থাকিলে ধর্ম্মের আরম্ভ হয় না। অতি উচ্চ প্রার্থনাও দয়ার কাছে কিছু নয়, দয়া ভিন্ন কে ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইতে পারে? ঈশ্বর যদি দয়ার চন্দ্র না হইতেন, পাপী কি তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত? ঈশ্বর দয়াময়, এজন্য দয়া স্বর্গে সর্ব্বোপরি বড় হইল। স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর বড়। দয়া ঈশ্বরের আদরের বস্তু, ঈশ্বর ক্ষমা ও প্রেমের আধার। সুতরাং দয়ার নিশান সর্ব্বত্র উড়িবে। দয়াই সকলের আশা, সমস্ত ধর্ম্মসাধন এক দয়াতে। যে দয়া করে না, সে দয়াময়ের দয়া চায় না। যে দয়া করে তাহার প্রতি দয়া হয়। লোকে বলে একজন দয়ালু হইয়াও অধার্ম্মিক হইতে পারে, অবিশ্বাসী হইতে পারে, কিন্তু সে দয়া কখনও ঠিক নয়। আবার উপাসনা কর, যোগী হও, ভক্ত হও, যদি অপরের দুঃখ বিমোচন না কর সে উপাসনাদিও ঠিক নয়। পৃথিবীতে কত লোক উপাসনা করিল অথচ সুখী হইল না। খুব ধ্যান কর, খুব নামরস পান কর, খুব নিমগ্ন হও, কিন্তু দয়ার উচ্চব্রত গ্রহণ না করিলে, পৃথিবীর পাপ শোধন না করিলে, সংসারের ভ্রম কুসংস্কার চূর্ণ না করিলে, অধর্ম্ম দুঃখ দূর না করিলে, ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন না করিলে, ভাই ভগিনীর শোক সন্তাপ দূর না করিলে, কখনও সুখ হইবে না। যত প্রেমিক হইবে, তত জগতের দুঃখে ব্যাকুল হইবে। উপাসনা এবং দয়া এক শাস্ত্রের কথা। দয়া পূর্ণ হইলে তিনি যথার্থ হৃদয়ে উপাসনা করেন।

প্রেমময় প্রেমমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার দয়ার কথা শুনিলাম, তাই সে দিন উপাসনা ভাল লাগে। উপাসনা কর, দয়া উত্তেজিত হইল। পিতা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহার দয়া স্মরণ করিলে, তাঁহার স্নেহ দেখিলে, তাঁহার দয়া ভালবাসা অনুভব করিলে, তুমি নির্দ্দয় থাকিবে কি প্রকারে? উপাসনায় যে দয়া অনুভব হয়, জগতের প্রতি সেই দয়া উত্তেজিত হইবে। খুব আজ উপাসনা প্রার্থনা করিলে, স্বর্গের সুধা পান করিলে প্রেমানন্দ লাভ করিলে, ঈশ্বরের হস্তের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে, কি জন্য না সেই সুধা লইয়া তুমি দুঃখীর দুঃখ দূর করিবে, শোকীর শোক হরণ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে এই সকল অর্পণ করিয়া ঋণী করিলেন।

হে ব্রাহ্ম, তুমি নিষ্ঠুর নির্দ্দয় থাকিতে পার না। দুঃখী অনাথ শিশুর দুঃখে তোমাকে কাঁদিতেই হইবে। যে তোমার দয়ার প্রার্থী, তাহাকে তুমি শূন্য হস্তে ফিরাইয়া দিতে পার না। ঈশ্বর কি কোন দিন তোমাকে শূন্য হাতে ফিরাইয়া দেন? তুমি তাঁহার নিকটে দয়ার প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের নিকটে দুঃখে পড়িয়া ক্রন্দন কর। তুমি কি প্রকারে বিধবা অনাথ শিশু দীন দুঃখীকে দয়া করিবে না? যদি তুমি দয়া চাও তবে সকলকে দয়া দাও, সকলের নিকট ব্রহ্মনাম বিতরণ কর; এক একজন ব্রহ্মের দূত হইয়া ঘরে ঘরে গিয়া দয়া বর্ষণ কর। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবে, ব্রহ্ম তোমাদিগের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিবেন। দয়া আর কিছুই নয়, প্রাণকে প্রেমে মগ্ন করা। ভালবাসাই সহজ অবস্থা। ভাইকে ভালবাসা স্বর্গীয়। ভাইয়ের কল্যাণ সাধন করা, ভাইয়ের বিরুদ্ধে চিন্তা আসিলে অনুতপ্ত হওয়া, চক্ষে জল পড়া স্বাভাবিক। আর যদি তাহার সঙ্গে অভদ্র

ব্যবহার কর, পর জ্ঞান কর, তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া বিদায় করিয়া দাও, তবে তুমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইলে। কখনও এরূপ করিও না। দেখ ব্রহ্ম খুব দয়ালু। যে দয়ালু হয় সে আপনা আপনি ধার্ম্মিক হয়, ভালবাসিতে বাসিতে স্বর্গের দিকে চলিয়া যায়। অতএব অঙ্গীকার কর, আমার যত ধন আছে, বিদ্যা আছে, বল আছে, সময় আছে, উহা যথার্থ পরিমাণে দুঃখী দীনদিগকে দান করিব, পিতার নাম মহীয়ান্ করিব। পৃথিবীর নিকটে কখনও নিষ্ঠুর মনে যাইব না, কখনও হিংসা দ্বেষে প্রবৃত্ত হইব না। ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন সকলই পরের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করিয়া সমুদয় জীবন সার্থক করিবে।

ঈশ্বরপ্রেরিত।

রবিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৮০১ শক; ৬ই জুলাই, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কোন গুরুতর বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে, সেই বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি কিছু অধিক বিশ্বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আমি বলি ব্রাহ্মসমাজ দেবতার খেলা। উহা যে দেবতার খেলা তাহার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মলীলার নাম ব্রাহ্মসমাজ। বর্ত্তমান কালে বর্ষে বর্ষে মাসে মাসে পক্ষে পক্ষে সপ্তাহে সপ্তাহে দিবসে দিবসে, আরও বলি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মরাজ্যে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিতেছে, তৎসমুদয় ব্রহ্মলীলা। কেন না ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নহেন, জগৎক্রিয়া ধর্ম্মজগতের বিশেষ ক্রিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের লীলার মধ্যে মানুষ

আছেন, যাঁহারা ব্রহ্মের পক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অল্পসংখ্যক যাঁহারা ধর্ম্ম বিতরণ করিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, গভীর উচ্চতর তত্ত্ব নিজ জীবনে সাধন করিতেছেন। এই সকল সাধক আচার্য্য বা প্রচারককে আমি বলি "ঈশ্বরপ্রেরিত।"

আমি "ঈশ্বরপ্রেরিত" বলি, নির্ভয় হইয়া বলি, বলিব মনে করিয়াই বলিতেছি। এই সকল লোক ঈশ্বরপ্রেরিত, ব্রাহ্মসমাজ এই ভাব গ্রহণ করিবেন, বরণ করিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে এ কথা লইয়া বিবাদ হইয়াছে, হয় ত চারিদিকে লোকেও বলিতেছে, আমরা উহা স্বীকার করি না। লোকে বলিতেছে, যাঁহাদিগকে প্রেরিত বলিতেছি তাঁহারাও বিরুদ্ধে বলিতেছেন। উভয় দিকেই মত বৈপরীত্য, বিবাদ বিসম্বাদ। যাঁহাদিগেরই হস্ত স্পর্শ করিয়া বলি তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহারাই অস্বীকার করেন, "আমি নই আমি নই" বলেন। যিনি আপনাকে অস্বীকার করেন, জগৎ তাঁহাকে কেন স্বীকার করিবে? তথাপি আমি স্বীকার করিব। সময়ে স্বীকার হয়, অসময়ে হয় না। ফল পরিপক্ব না হইলে কি তাহাকে ফল বলিতে পারা যায় না? তবে স্বীকার বিলম্বে কেন হইবে? যাঁহারা প্রেরিত তাঁহারা কেন আপনাদিগকে সমাদর করেন না? এ স্থলে সমাদর না করা পাপ ও অবিশ্বাস।

তোমরা বলিবে ইহাতে অবিনয় হয়। তবে অসত্য কি বিনয়? হস্তী যদি আপনাকে কীট বলে তাহা কি বিনয়? তাহা বিনয় নয়, কিন্তু অসত্য এবং কলঙ্ক। তোমরা বলিবে হউক, আমরা ইহাতে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াও মনুষ্যসমাজে বিনয়ী বলিয়া সমাদৃত হইব। আমি তোমাদের এ চরিত্র ভাল বলি না। পরিত্রাণের

সংবাদ তোমাদের হাতে আসিল, মিথ্যাবাদী হইয়া তোমরা বলিলে কি না হাতে কিছু নাই। এ মিথ্যা কথায় কেবল তোমাদের নহে, ইহাতে তোমরা অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইতে দেখিবে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে সংস্থাপক ও তৎসঙ্গিগণ ব্রহ্মলীলাতে বিশেষরূপে সংযুক্ত। সাধারণ ভাবে সকলেই নিযুক্ত, কিন্তু সেই সাধারণ শ্রেণীর উপরে দেখিতে পাইবে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত আছে, ব্রহ্মপ্রেরিত আছে। এই প্রেরিত একজন নয়, দুইজন নয়, পাঁচজন নয়, দশজন নয়, অনেক। কত জন আমি বলিতে চাই না, সময় তাহা বলিবে।

ইঙ্গিতে জানিয়া বলিতেছি, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই ঘোর কলিযুগে প্রত্যাদেশ হয় না, অন্ধকারের ভিতরে আলোক দেখা যায় না, এ কথা থাকিবে না। জাগ্রত ঈশ্বর-প্রেম মনুষ্য মধ্যে বাস করিলে নিঃশ্বাসে তাহা জানা যায়। কার্য্য দর্শন করিলেই জানিতে পারা যায় ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত কি না? ঈশ্বর প্রেরণ করেন, ইহা বলিয়া কি হইল? ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণ না করেন? কীট, পতঙ্গ, চাষা, রাজা, কে না প্রেরিত? সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত সত্য, কিন্তু বিশেষরূপে প্রেরিত আছে। বর্ত্তমান বিধানে যাঁহারা বিশেষ সাধন করিবেন, তাঁহারা বিশেষ কীর্ত্তিস্বরূপ হইবেন। ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রদীপ সদৃশ ভারতের অন্ধকারের ভিতরে তাঁহারা মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছেন; সূর্য্য না হন, চন্দ্র না হন, তারা না হন, অন্ততঃ এক একটী দীপ হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ পাইবেন। ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের অন্তর্গত।

এই যে তোমরা দুই শত পাঁচ শত লোক একত্র হইয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছ, সত্যের জ্যোতির্ময়

উপরে সকলের দৃষ্টি পড়ে ইহার উপায় করিতেছ, ইহা সামান্য ব্যাপার নহে। পুনরায় বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বরপ্রেরিত। কেন না তোমরা সাধন করিতেছ, সংসারে সাধক হইয়াছ, অসার কার্য্য ধন, বিত্ত, নীচ, কামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। কি কার্য্যে? জগতের কার্য্যে; সাধক বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য জীবন পবিত্র করিবার কার্য্যে; একজন হইতে দশ জন, দশ জন হইতে দশ সহস্র, দশ সহস্র হইতে দশ লক্ষ জন হইবে, এই কার্য্যে; অর্থ কামনা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের উৎসবে, ধ্যানে, সৎপ্রসঙ্গে, সচ্চিন্তায় আপন জীবন উন্নত করিবার কার্য্যে; পবিত্র স্থান, পুস্তক নির্জন চিন্তা হইতে জ্ঞান লাভ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, পল্লব, নদীস্রোত, নির্ম্মল শীতল বায়ু হইতে শুদ্ধি লাভ করিয়া, ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার কার্য্যে। যাঁহারা এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত তাঁহারাই সাধক। পাপ, অধর্ম্ম, ভীরুতা, এখন পর্য্যন্ত থাকিলেও তথাপি সাধক। অমুক নগর বা পল্লীতে অমুক লোক সংসারে ডুবিয়াছিল, সংসার হইতে একটু উঠিয়াছে, সেই বিপদের ঘোর সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সাধন করিতেছে, বাঁচিবার উপায় পাঠ করিতেছে, ইহা ঈশ্বরের কীর্ত্তি, ঈশ্বরের লীলা। ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের লীলা, আর সকলই ভ্রম।

অমুক স্থানে অমুক লোক ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। সংসারে বদ্ধ ছিল, রাশি রাশি ধন পরিবর্জ্জন করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; ঈশ্বরের হস্ত হইতে বিশেষ উপায়, বিশেষ সাধন লাভ করিতেছে। এ সকল ব্রহ্মলীলা। যে সকল লোকের দ্বারা এই ব্রহ্মলীলা সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহারা

সামান্য নন। তাঁহারা ঈশ্বর লীলার সাক্ষী। ব্রহ্মলীলা যেখানে যেরূপ হইতেছে একত্রিত করিয়া ঈশ্বরপ্রেরিতগণকে গৌরব দিতে হইবে। সে সমুদয় লোক প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তাঁহারা বৃক্ষতলে বসিয়া সাধন করুন অথবা সংসারে বসিয়া ধর্ম্মসাধন করুন, যেখানে যে অবস্থাপন্ন কেন না হউন, ধনী হইয়া অট্টালিকায় থাকুন, বা দরিদ্র ভিখারী হইয়া বেড়ান, যিনি যে প্রকার অবস্থাপন্ন কেন হউন না, সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত, সমাদরের পাত্র। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের জীবন দেখিয়া সাধক বলিব, সহায় বলিব, সামান্য বলিয়া মনে করিব না। যাহা তাঁহারা প্রকাশ করিতেছেন, জীবনে তাহা সত্য করিব, হৃদয়ে তাহা আলোচনা করিব। এই সকল লোককে ডাকিয়া বলিব, তোমরা সাধক ঈশ্বরের প্রেরিত। তাঁহারা স্বীকার না করিলেও সাধু বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিব।

কে ব্রহ্মপ্রেরিত? ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম কি কাহাকেও প্রেরণ করেন না? এক সময়ে তিনি করিতেন, এখন তিনি করেন না, যাহা কিছু হইতেছে নিয়মানুসারে হইতেছে, এ কথা বলিলে কি করা যায়? এ বিবাদ নিষ্পত্তি কঠিন। শীঘ্র যদি অন্যূন পঞ্চাশ জন অন্য সমুদয় কাজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের আজ্ঞা প্রচার করেন, ব্রহ্মের দূত হইয়া আসিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞায় জগতের হিতসাধন করেন, সেই সকল লোককে অনাদর করিয়া কেন বলিব, তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত নহেন? তাঁহারা সত্যের সমাচার গোপন করিবেন কি প্রকারে? যদি কোন সত্য শিক্ষা দিতে, কোন বেদশাস্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিয়া থাকেন, তিনি বলুন না বলুন, আমি সেই

লোককে প্রেরিত বলিব, নিশ্চয় বুঝিব তিনি সামান্য সাংসারিক লোক নহেন।

যিনি আমাদিগের মধ্যে অতি হীন, তিনিও যে ঈশ্বরপ্রেরিত ইহার প্রমাণ আছে। আমি একজন কল্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর যে যে বিষয় আমার দ্বারা সাধন করিয়া লইয়াছেন, সে সকল বিষয় আমা দ্বারা হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার অবহেলা থাকিতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট তদ্বিষয়ে আমার উপেক্ষা নাই। আমার মন দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত সেই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে। বলুন, সাক্ষাৎ দেবতা ঈশ্বর হইতে এ সকল হইয়াছে, ঈশ্বরের বক্ষ হইতে মেদিনীতে আমি আসিয়াছি, অন্যথা আমি আসিতাম না। যাহা করিতে আসিয়াছি যদি তাহা না করি জন্ম বিফল। ব্রাহ্মেরা ইহাই সুসিদ্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান। তাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর উন্নতি হইবে। কতকগুলি লোক সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উন্নতি বিস্তৃত করিবেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের গন্ধ অল্প। এ ব্রাহ্মসমাজের আদর কি প্রকারে হইবে? হরিবিহীন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইবে কি প্রকারে? হরির হাত ধরিয়া উঠিবে, হরির হাত ধরিয়া বসিবে, হরির কথা ঘোষণা করিবে। হরির আদেশ স্বীকার করাতে নিন্দা অপমান কি? হরির কথা স্বীকার করিতে নিন্দা অপমানের ভয়—লজ্জার বিষয়। ঈশ্বর সৃজন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, বঙ্গদেশে আদেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিবে। উপদেশ সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকেই উন্মত্ত করিতে হইবে, আদেশবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে, এ কথা বলিতে লজ্জা

কি? বিশ বৎসর সাধন করিলে, এখনও বলিতে পার না সংসার বন্ধন শিথিল হইয়াছে, জীবন্মুক্তি হইয়াছে, বড় লজ্জার বিষয়! দশটী পরিবারের ভার লইয়া আজও ব্রাহ্মপরিবার সংগঠনের চেষ্টা হইল না। যথার্থ কথা প্রচ্ছন্ন রাখিলে কি হইবে? লোকে খড়্গহস্ত হইবে বলিয়া কি সত্য বিলোপ করিতে হইবে? সত্য বলিতে লোকভয় কি? ভীরু হইয়া প্রবল সত্য সঙ্কোচ করিবে? সত্য প্রকাশে লোকলজ্জার বিষয় কি?

ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন এ কথা বলিলে লোকে উচ্চ পদস্থ বলিবে এই তোমার বুদ্ধি? সত্য বলিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে, অসত্য বলিয়া বিনয়ী হইতে চাও? তুমি ব্রাহ্ম হইয়া নিজের বুদ্ধিমতে চলিতে চাও, ঈশ্বরের উপর কি তোমার সমুদয় ভার নহে? ঈশ্বর তোমাকে সত্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে তোমরা প্রত্যেকে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাঁহার নিকটে ব্রত গ্রহণ করিয়া ব্রতী হইয়াছ, এ সকল পরিষ্কার কথা কিরূপে অস্বীকার করিবে? তোমরা কি ব্রহ্মের সঙ্গে বাদ করিবে? তোমরা যাহাই কর ব্রহ্মমন্দিরের বেদী তোমাদিগকে স্বীকার করিবে। যাও অন্ধকার নিবারণ করিয়া জ্যোতি বিস্তার কর। যাও ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তোমরা যে প্রেরিত, প্রমাণ কর। মূর্খ বলিয়া ছল করিলে কি হইবে? যদি তোমরা হীন লোক বলিয়া স্বীকার কর, তথাপি ব্রহ্মমন্দিরের বেদী ঈশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আর কিছু বলিবে না। চন্দ্র সূর্য্য যদি বিলুপ্ত হয়, তথাপি তোমাদিগের এ পরিচয় জগতের নিকট থাকিবে। তোমরা সত্যের সাক্ষী, যতই তোমরা সত্যের সাক্ষ্য দান করিবে ততই তোমাদিগের দীপ্তি প্রকাশ পাইবে।

ব্রহ্মের প্রেরিত মানুষের সংখ্যা বৎসর বৎসর বাড়িবে। যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত তাঁহাদিগের এক কথায় সমুদয় অবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহারা ব্রহ্মের নিকট কি কথা শুনিলেন, কি মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, কি কি নূতন সত্য অঙ্গীকার করিলেন, কি কি নূতন রত্ন লাভ করিলেন, একবার জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে বেদ পুরাণ যেমন, ব্রহ্মপ্রেরিত লোকদিগের জীবন তেমনই। হরির তত্ত্ব যাঁহারা শুনিতে পান, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য! জীবনে যাঁহারা জাগ্রত সত্য দর্শন করিয়াছেন, ব্রহ্মলীলা যাঁহাদিগের জীবনে চলিতেছে, সেই সকল সাধককে ডাকিয়া এক স্থানে করিলে মহদ্ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সাধক একত্র হইয়া হরিতত্ত্ব কথা বলিবেন, ইহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। হরিনামের তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার যশোগান করিব, তাঁহার সুমধুর নামের পরিচয় দিব, তাঁহার নামে চমৎকৃত হইব, বিস্মিত হইব, হরিকথায় প্রমত্ত হইব, এ এক নূতন দৃশ্য। যাঁহারা যেখানে আছেন সকলে মিলিত হইয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করুন, সকলে দলবদ্ধ হউন, তাঁহাদিগের মুখে হরিকথা শুনিয়া জীবন কৃতার্থ হউক।

নীচ আমি ও উচ্চ আমি। *

রবিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৮০১ শক; ১৩ই জুলাই, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আমি কি আমরা, ইহা গুরুতর প্রশ্ন। আমি কি আমরা এ প্রশ্ন গুরুতর হইলেও ইহার মীমাংসা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এক ঘরে এক বস্তু, কি এক ঘরে দুই বস্তু? এক ঘরে এক বস্তু এই

আত্মতত্ত্ব। ঐ এক বস্তুই আত্মতত্ত্বের মূল, তাহা আমরা বিলক্ষণ দেখিতেছি। আকাশে আমার স্বদেশ, তবে আর একখানি বাড়ী যাহা আছে তাহা এই দেশ। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে ঘর এই দেশে। আমি নামে পুরুষ বাস করে এই দেশের মধ্যে। এই যে দেহের মধ্যে বাস করে আমি, সে কয় জন? ইহার অধিকারী আমি, কি আর কাহারও অধিকার? হস্তের মধ্যে, চক্ষুর মধ্যে, কর্ণের মধ্যে, মনের মধ্যে এক কি দুই? ইহার মধ্যে একজন বাস করিল, না দুইজন বাস করিল? আমি ত এক জন দেখিতে পাই, কিন্তু দুইজন উপলব্ধি করি। আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমি একজন কি দুই জন? গলার মধ্যে যে শব্দ হয় তাহা একজনের কি দুই জনের? যাহারা পোষাক পরে, আহার করে, দর্শন করে, সুখ ভোগ করে, আবার ধর্ম্ম করে, তপস্যা করে, তাহারা ভিতরে একজন নয়, কিন্তু দুইজন। এই শরীরের মধ্যে যে দুইজন বাস করে, তাহারা কি কি করে? তাহারা দুই ব্যক্তি কি স্বতন্ত্র? একজনের ভাবান্তর মনান্তর ও অবস্থান্তরে এত হয়? কি একজন এত নীচ আর একজন এত উচ্চ! একজন যোগ ধ্যান তপস্যায় আসক্ত হইয়া এত উচ্চ যে সে স্বর্গের নিকটবর্ত্তী বলিলে হয়। আর একজন এত নীচ যে সে আহার বিহার কামাদি রিপুর দাস হইয়া নরকের আলয়ে নিয়ত বাস করে। অতএব আমি বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করিতেছি সে আমি একজন নহে। সে আমির কত প্রকার প্রকাশ। একজন আকাশে থাকে আর একজন সংসারে বাস করে, একজন স্বর্গের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে, আর একজন

পৃথিবীর দুর্গন্ধ বায়ু আঘ্রাণ করে। একজন বায়ু ও আকাশ ভক্ষণ করেন, আর একজন সংসারের পঙ্কিল জল মৃত্তিকা খাইয়া থাকে।

আমি যখন বলি আমার মন, আমার গুণ, আমার শরীর, আমার স্ত্রী পুত্র, আমার ধন সম্পত্তি, আমার গৃহ অট্টালিকা, তখন সে কোন্ আমি? আবার আমি যখন আমার বলিতেছি, আমায় শাসন করিতেছি, আমায় উপদেশ দিতেছি, আমায় ধার্ম্মিক করিতেছি, তখন যে এক আমি নই তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি যদি এক হইতাম, তাহা হইলে স্বর্গে থাকিতাম। আমি বলিতাম, ওরে মন, মন্দ পথে যাস্‌নে, মন্দ কর্ম্ম করিস্‌নে, মন্দ কথা বলিস্‌ন, কিন্তু মন কথা শোনে কই? আমি যদি একজন হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আমাকে যাহা বলিতাম তাহাই হইত। যাহারা সেই নীচের আমিকে সর্ব্বদা ভালবাসিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় মরিয়াছে। কিন্তু যাহারা তাহার সঙ্গে সংগ্রাম করে, রিপুদিগকে প্রশ্রয় না দেয় তাহাদের বল ও আক্রমণ পরাস্ত করিয়া দেয়, তাহারা ধর্ম্মপথে চলিতে থাকে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুর অধীন যে আমি, তাহা মন্দ আমি, সয়তান আমি। মন্দ আমি আমি নহি, ভাল আমিই আমি। মন্দ আমি পর, সে আমি আমার নহে। এই যে শরীরের আমি—ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাপের হাতে সর্ব্বদা সেবা গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তুমি কি জান না, সে মহাপুরুষ কে? যিনি প্রার্থনা করেন, ধ্যান করেন, সাধন করেন, তপস্যা করেন, সেই ভাল আমি। আর কাম ক্রোধাদির অধীন নীচ আমি, পশু আমি, সে পর। সে আমিও কথা কয়, চিন্তা করে, যুক্তি করে, আপনার অধিকার প্রকাশ

করিয়া উচ্চ আমির উপর জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। সে ভাব যথার্থ ভাব নহে। তুমি যদি বল, তাহা কেবল আমার মনে উদয় হয়, জীবনকে অধিকার করিতে পারে না, নীচ ভাব আমার নিকট কেবল নীচ ভাব মাত্র হইয়া আসে। সে মলিন রক্তে হাড়ে জড়িত, বিশ বৎসর অভ্যাসের ফল, এ কথা ঠিক নহে।

বাস্তবিক পাপ পাপ নহে, এখন সে সয়তান। সে ব্যক্তি হইল। কেবল যদি পাপ হয়, পাপ যদি রক্ত হয়, পাপের শরীর থাকে, নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে, সে পাপকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু এই পাপ আমি হইয়াছি। যেমন সাধু আমি প্রবল, তেমনই পাপ আমি প্রবল। যেমন সাধু আমি কার্য্যের মধ্যে, জীবনের ভিতর, জনসমাজের অভ্যন্তরে বাস করে—সেইরূপ অসাধু আমি রক্তের ভিতরে প্রবিষ্ট, হাড়ের ভিতর মাংসের ভিতর সমুদয় শরীর মধ্যে ব্যাপ্ত। ধর্ম্ম কেবল ভাব নহে, তাহার দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই হস্ত, অস্থি মাংস সকলই বিদ্যমান। অধর্ম্মেরও ঐরূপ আছে। এই দুয়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। যে ঘরে সাধু আমি, সেখানে আনন্দ শান্তি, পবিত্রতা প্রেম নিয়ত বিরাজ করিতেছে, আর যে ঘরে নীচ আমি, সেখানে নিরানন্দ অশান্তি পাপ, মোহ, অপবিত্রতার দুর্গন্ধ। এই যে সাধু আমি তাহাকেই সর্ব্বদা প্রবল রাখিতে হইবে। সাধু আমিই মুক্ত, সাধু আমিই দেবতা। সে আমি সর্ব্বদা দেবলোকে বাস করে। নীচ-ভাব-পরতন্ত্র লোকেরা পশু আমিকেই আমি বলিতে চাহে। সে সুখ চায়, ধন চায়, পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ চায়, সেই পশু আমিই অনেকে মনে করে শরীরের অধিকারী। সেই নীচ আমির অধীন হইয়াই লোকে মরিতেছে। খাইব পরিব বেড়াইব

সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব—এই নীচ আমির বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র হইয়াছে। ব্রাহ্ম, তুমি এই নীচ আমির অধীন হইয়া পাপে লিপ্ত হইয়াছ। তুমি উচ্চ আমিকে ভালবাস। নীচ আমি সাময়িক অপবিত্রতা, ইহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র ও পর। সে সময়ে সময়ে উচ্চ আমিকে আক্রমণ করে। দিবসে যে আমি, রজনীতে সে আমি নাই; প্রাতে যে আমি, দ্বিপ্রহরে সে আমি নহি; গৃহে যে আমি, বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট সে আমি নহি; উপাসনায় যে আমি, কর্ম্মক্ষেত্রে সে আমি নহি। যে আমি যোগ ধ্যান করে, তাহাকে যখন আমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন সেই নীচ আমিকে আর কোনরূপে প্রশ্রয় দিও না।

যে দেশে যোগ ধ্যান, সে দেশে শরীর আমার লোক নহে। তবে যদিও সে কখনও কখনও আমায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, কিন্তু সে দেশের লোক নহে, সম্পর্কের লোক নহে, সে ঘরের লোক নহে; এইরূপ ভাবিলে বাঁচিতে পার। যখন নীচ আমি বল বিক্রম প্রকাশ করে, তখনই জানিবে কোন দস্যু আসিয়াছে। চোর আসিয়াছে শরীর মধ্যে দেখিবা মাত্র তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। এই বল আমি, বিক্রম আমি। অতএব নীচ আমির সহিত বন্ধুতা রাখিও না। যদি বাঁচিতে চাও তবে যখন সে আক্রমণ করিতে আসিবে ও প্রবল হইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। যে আমি যোগেতে যোগী হইবার চেষ্টা করে, যে আমি ধ্যানেতে মগ্ন হয়, যে ব্রহ্মানন্দরস পান করিতে চায়, সেই আমিই আমি। আমার কি বাসস্থান নরকে? এই বাড়ী, এই শরীর, এই সুখের সামগ্রী, এ সকল আমার নহে। এখন আমি পিঞ্জরবদ্ধ

হইয়াছি। এই উচ্চ আমিকে অনেক বিপদ আসিয়া আক্রমণ করিবে। তাহাতে উচ্চ আমি ভীত হইবার নহে, কারণ আমার শরীর মন, আমার অধীন; আমি কখনও তাহাদের অধীন নহি। সাধুতার সন্তান আমি, আকাশের পক্ষী আমি। আমার বাড়ী এখানে নহে, আমার দেশ এখানে নহে। আমি নীচ নহি, আমি পবিত্র। আমি যেখানে থাকি সে স্থান অতি পবিত্র। আমাকে যদিও বিপদ দুঃখ পাপ আক্রমণ করে, তথাপি তাহাদিগকে কোন বিষয় অর্পণ করি নাই, জীবনের অংশ দিই নাই, আপনার অধিকার দিই নাই। সে আমি সন্ন্যাসী উৎকৃষ্ট যোগী, তাহার কার্য্য শত্রুগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা নহে, কিন্তু চোরদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করা। যাহারা আপনার স্থানে বসে, তাহারা বন্ধু নহে তাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, প্রত্যেক ব্রাহ্মের হত্যা সাধন করা কর্ত্তব্য। ঐ যে নীচ আমি আসিতেছে উহা আমি নহি। সে আমায় ভয় দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছে, বড় আমিকে বিরক্ত করিতেছে। অতএব নীচ আমি ধনী আমিকে কখনও বড় হইতে দিও না, সাধু আমিকে প্রবল কর। সেই সুন্দর পুরুষকে দর্শন করিয়া যোগে নিমগ্ন হও। ইহার মধ্যে যথার্থ অধিকারী যে, সেই আমিকে রক্ষা কর। অতএব যাহাকে দেখিয়া ভয় করিতেছ তাহাকে ব্যক্তি বলিয়া জান, ব্যক্তি জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ কর। ভাল আমিকে বলীয়ান্ করিতে হইবে, আদর করিতে হইবে। তোমার আমার নীচ আমি তাড়াইয়া দিও। ইহার মধ্যে থাকিবে ব্রহ্মসন্তান আমি, দ্বিজ আমি থাকিবে। তাহারই জয় স্থাপিত হইবে।

ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণে প্রমাণ।

রবিবার, ১৯শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক ; ৩রা আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা অন্যায় যে একজন ব্যক্তির স্কন্ধে সমুদয় দায়িত্ব স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাসের কথা সকলেরই বলা কর্ত্তব্য। যদি আমরা সকলে একত্র দলবদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকি, তবে কেন তোমরা একজন বা পাঁচ জনকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, সকলের বিশ্বাসকে অল্পসংখ্যাকের বিশ্বাস বলিয়া প্রতিবাদ কর। ইহা ভাল দেখায় না। সত্যের অনুরোধ হইতে মনুষ্যসমাজের অনুরোধ অধিক মনে করা ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন সকলে একত্র যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি, এক মত, এক ঈশ্বর, এক বিশ্বাসে, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তখন চলিতে চলিতে জন কয়েককে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, তোমরা তাহাদিগকে নির্যাতন করিতেছ ; মিথ্যাবাদী, কুসংস্কারী, মূর্খ, অবিশ্বাসী, সাধনবিহীন বলিতেছ। পূর্ব্বের মত, বিশ্বাস, মন্ত্র, গুরু, দীক্ষা সকল অস্বীকার করিতেছ; পূর্ব্বে যাহাদিগের সহযাত্রী ছিলে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছ, নিন্দা করিতেছ, ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের কীর্ত্তি, অনেক ভাব, অনেক সত্য রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর এক গুরুতর বিষয়ে উহা সাক্ষী আছে। কোন্ সময়ে কোন্ মত ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছে ব্রহ্মসঙ্গীত ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকটে, বিশেষতঃ মনুষ্যের নিকটে সাক্ষ্য দিতেছে। ভাবী ইতিহাস লেখকের নিকট সঙ্গীত পুস্তক সাক্ষ্য দান করিবে, অমুক সময়ে অমুক মত প্রচলিত ছিল। সমস্ত ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা বলিবে অমুক সময়ে অমুক ভাব, অমুক সময়ে

যোগ, অমুক সময়ে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল ছিল। এই ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মশ্রবণের কথা, যোগ ধ্যানের কথা, ব্রহ্মসহ নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপনের কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত এই সকল ব্যাপারে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মসঙ্গীত গুরু হইয়া সমস্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা ব্রহ্মের নিকটে যে মন্ত্র শিখিলাম তাহার প্রমাণ সঙ্গীত। সকলে উহা গান করিয়াছেন, ঈশ্বর সমক্ষে, বন্ধুগণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, এখন অস্বীকার করিলে সঙ্গীতপুস্তক দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হয়। ব্রহ্মদর্শন কেহ অস্বীকার করিতে পার না, সঙ্গীতে উহা বদ্ধ হইয়াছে। হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব সঙ্গীত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি ব্যক্তি বিশেষে এই মত বদ্ধ থাকিত, যদি কোন সাধক কোন ব্রাহ্মযোগীর নিকটে ঈশ্বরের পরিচয় হইত, তাহা হইলে সাধারণের মত বলিয়া বিচারিত হইত না। এই সকল গান যদি সাধারণের হয়, ইহা কেবল নির্জনে বদ্ধ থাকিতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের হইতে পারে না। শত শত লোক উচ্চারণ করিয়া জগতের সমক্ষে ক্রমাগত এই মত প্রকাশ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকেরা এই সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকটে এ সকল সহজ কথা নহে। তাঁহারা যখন দেখিবেন, বড় বড় যোগী নহে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণ নিরাকার ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন লিপিবদ্ধ আছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ব্রাহ্মসমাজ ঋষি যোগী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগধর্ম্ম ঋষিধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তোমাদিগকেও এখন এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের কথা শুনা যায়, কেবল তোমরা

মুখে বল নাই, গান দ্বারা এ মত স্বীকার করিয়াছ। এখন যদি এই কথা বল—ইহা অধিকাংশের মত নহে, দু পাঁচ জনের মত। অধিকাংশের পুস্তকে যে মত, তাহা খণ্ডন করিবে কি প্রকারে? এখন কি আর অল্প বিশ্বাসীগণের মধ্যে গণিত হইতে চাও? ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, এখন বলিতেছ, ভবিষ্যতেও বলিবে এই প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। এক সময়ে ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, কঠোর হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, এখন যদি না হয়, তবে অবিশ্বাসের পথে গিয়াছ বলিতে হইবে। ঈশ্বর কথা কন, দিবা রাত্র তাঁহার কথা শুনিতেছ, ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলি বিশ্বাসের রাজ্য সুদৃঢ় হইতেছে। ঈশ্বর দেখা দেন, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় স্বীকার করিয়াছ, সঙ্গীত উহার সাক্ষ্য দিতেছে। এখন যদি বল তিনি কেবল যোগীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তিনি কি সকলের নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, মানুষের ন্যায় কথোপকথন করেন, তবে তাহা মানিব না। পূর্ব্বে এ সকল স্বীকার করিয়াছ—ব্রহ্মসঙ্গীত পৃথিবীর নিকট বলিবে। এখন এরূপ বলিলে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি হইবে। একবার যাহা বলিয়াছ সত্যের অনুরোধে তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যদি বীজ মন্ত্রের প্রতিবাদ কর, তবে যে অবিশ্বাসী হইলে। যদি পূর্ব্বের কথা সকল অস্বীকার কর, ব্রহ্মসঙ্গীত মিথ্যা বলিয়া উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল, ব্রহ্মবীজমন্ত্র গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দাও। একবার সত্য স্বীকার করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পার না। যাহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহা উৎপাটন করিলে আপনি উৎসন্ন হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যাহা এতদিন মানিত, তাহা কি এখন অল্প কয়েক ব্যক্তিতে বদ্ধ হইবে? কেহ কেহ যোগ করেন, অধিক হয় ত

পঞ্চাশ জন হইবে, তাঁহারাই কি এখন দর্শন শ্রবণের কথা বলিবেন? ব্রহ্মযোগী স্বতন্ত্র বিধি, স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মদর্শন করেন, অল্লাধিক ব্রহ্মকে বুঝিতে পারেন, নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মের কথা শ্রবণ করেন, যদি এইরূপ হইল তবে এতদিনে উন্নতি কি হইল? এখন আন্দোলনে পড়িয়া, বিপাকে পড়িয়া কি সকলে বলিবেন, এ মতে দুই পাঁচ জন বিশ্বাস করে। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের পক্ষে ইহা সাজে না। পরীক্ষার সময়ে দুই একটী প্রহার বা নিন্দায় বলিবে, কই আমরা বলি নাই নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করা যায় বা তাঁহার কথা শুনা যায়, আমরা এ কথা শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া থাকি। কয়েকজন অহঙ্কারী হইয়া নিরাকার ঈশ্বরকে স্পর্শ করে, দেখে ও শুনে। দর্শন, আদেশ শ্রবণ ইহাতে আমাদের হস্ত নির্লিপ্ত, ও মন্ত্র তন্ত্রে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কখনও আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। মনে হইতেছে এই বলিয়া অধিকাংশ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সত্যকে ফেলিয়া দিয়া সরিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহার আশু প্রতিফল অবিশ্বাস নাস্তিকতা। নিরাকারের বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিলে আর কি থাকিল? যে মত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভূষণ তাহাই পরিত্যাগ করিতে চলিলে। ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা শিরোভূষণ ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা নিজস্ব ধন তাহা পরিহার করিলে আর আর মত লইয়া কি হইবে? আর আর মত কি অন্যান্য ধর্ম্মে নাই? যোগের শাস্ত্রও অন্যত্র আছে। কিন্তু নিরাকার পুরুষকে অন্তরের সহিত ভালবাসা কোথাও নাই। আর সব প্রাচীন বলিতে পারা যায়, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা, ভালবাসা, তাঁহার কথা শ্রবণ করা, তাঁহাকে দেখা আর কোথাও নাই।

তোমরা জগতের নিকট নিরাকার ঈশ্বর দর্শন, তাঁহার কথা শ্রবণ, তাঁহাকে অনুরাগ করার কথা বলিবে, পৃথিবীকে এই শুভ সংবাদ দিবে, ইহার মর্য্যাদা পরে লোকে বুঝিয়া সাধুবাদ প্রদান করিবে, ধন্যবাদ দিবে। ব্রাহ্মগণ যে অমৃত রাখিয়া যাইবেন, উহা দশ শতাব্দী পরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যেমন সাকারকে দেখা যায়, তেমনই নিরাকারকে হৃদয়ে ধারণ, তাঁহার নিরাকার মুখ হইতে কথা শ্রবণ, ইহাতে একান্ত সুখী হইবে। এ কিছু সামান্য কথা নয়। তোমরা যে সত্য উদ্ভাবন করিলে তোমাদের নিকট তাহার আদর যদি না হয়, অন্য দেশের নিকট তাহা সমাদৃত হইবে। তোমরা যে গান করিয়াছ সে গান শেষ হইল, কিন্তু সেই সুন্দর সঙ্গীত পৃথিবীতে পুস্তকে নিবদ্ধ থাকিল, তোমাদের এই হৃদয়ের গান ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আদর করিবে; পৃথিবীর ধর্ম্মপথে অনুসন্ধান করিয়া এই ফুলের মালা লাভ করিবে; তাহারা এই মালা গলায় পরিয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের পূজা করিবে।

আমার আজ বেদী হইতে এই বক্তব্য যে, তোমাদের দেওয়া সত্য শত সহস্র বৎসর পরে কেমন আদৃত হইবে। এই মন্দির যেখানে এই সত্য তোমরা প্রকাশ করিয়াছ, যদি সে সময়ে তোমরা আসিতে পারিতে, দেখিতে কত লোক তাহার কিরূপ আদর করিতেছে। তাহাদের চক্ষু হইতে কেমন প্রেমের ধারা পড়িতেছে, নিরাকারকে দেখিয়া কেমন প্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে। সকল মনুষ্য সহজে তখন তাঁহার নিরাকার প্রেমমুখ দর্শন করিতেছে। কোন যুক্তি তর্ক নাই, সমস্ত পৃথিবী এই সত্য সহজে সাধন করিতেছে। আজ ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কি করিবে বলা হইল, কিন্তু

আমরা যে সত্য লাভ করিলাম আমরা নিজে কেন তাহা হইতে বঞ্চিত হই ? সকলে মিলিয়া সরল ভাবে যে সঙ্গীত করিয়াছি, এখন সেই সঙ্গীত অনুসারে কেন বলিব না, নিরাকারের তন্ত্র মন্ত্র দুজনের মত নয়, ইহা সকলের মত। জগতের উৎপীড়নের ভয়ে নিরাকার দর্শন শ্রবণের মত মিথ্যা—এ কথা যেন মুখ হইতে বাহির না হয়।

ব্রাহ্মসমাজ ইহার সাক্ষী আছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা শুনা যায়। যাহা মানিয়াছ তাহা স্থাপন করিতে হইবে। মিথ্যা কথা কখনও বলিতে পার না, ইহা যে আমাদিগের প্রাচীন তন্ত্র। এজন্য দশ জন কেন রক্ত দিবে, আমরা সকলে মিলিয়া ইহার জন্য রক্ত দিব। পাঁচ জন এজন্য উৎপীড়ন সহ্য করিবে, আর তোমরা উপহাস করিবে, উৎপীড়ন করিবে, সংসারের সহায়তা করিবে, ইহা কখনও ন্যায়সঙ্গত নহে। যখন দর্শন শ্রবণের সঙ্গীত মুখে আনিয়াছ তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও। নিরাকারকে দেখা যায় না, তাঁহার কথা শুনা যায় না, পৃথিবীর এই অবিশ্বাসের কথার প্রতিবাদ কর। সেই গান মনে কর, সেই সঙ্গীত করিতে থাক, প্রাচীন ভাব পুনরুদ্দীপন কর, তখন দেখিবে নিরাকারে জ্বলন্ত বিশ্বাসে কিরূপ সুখী হও।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মমন্দির হইতে দর্শন শ্রবণ বিষয়ে উচ্চ উচ্চ কথা অনেক সময়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দক্ষিণে বামে রাখিয়া মধুর সঙ্গীত করা হইয়াছে। সেই সকল কথা অমৃত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার রূপ দর্শন চক্ষের ভূষণ; তাঁহার কথা শ্রবণ কর্ণের ভূষণ হইয়াছে। ইহা কতদূর হইয়াছে জীবন ও চরিত্র

প্রকাশ করিবে। নিরাকার ঈশ্বর কেমন সুখপ্রদ ইহা শিখাইবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যেক উপাসককে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদিগের প্রতিজনের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিয়াছে। যাঁহারা এই সকল সঙ্গীতে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এ বিষয়ে দায়ী। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস গ্রহণ করিলে জীবন কিরূপ হয়।

পৃথিবী বলিবে তোমরা নিরাকার বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিয়াছ তাহার উৎকৃষ্ট ফল দেখিতে চাই। কে বলিতে পারে যে এরূপ হইবে না, দশ বৎসরের পরে এই রাজপথ দিয়া যাহারা চলিবে, তাহারা আমাদিগকে বলিবে তোমরা নিরাকারের কথা কও শুনিব। যদি তোমরা তাহাদের কথার উত্তর না দাও তোমাদিগকে অবিশ্বাস করিবে, অশ্রদ্ধা করিবে। তাঁহার রূপের মধুরতার কথা গান করিলে, বল তাঁহার রূপ কেমন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর কি? চক্ষু যাঁহাকে দেখে নাই, কর্ণ যাঁহার কথা শুনে নাই, তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ শুনিয়াছ সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে। হাঁ, আমরা দেখিয়াছি, আমরা তাঁহার কথা শুনিয়াছি, সহজ ভাবে তাঁহাকে দেখা যায়, সহজ ভাবে তাঁহার কথা শুনা যায়, ইহা তোমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করিয়া সাকার ঈশ্বর অনাবশ্যক জগদ্বাসীর নিকট সপ্রমাণ করিতে হইবে। নিরাকারকে দেখ, স্পর্শ কর, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। সকলে উদ্যোগী হও, তোমাদিগকে এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যথোচিত পুরস্কৃত হইবে।

মাসিক সমাজ।

সামাজিক উপাসনা। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক ;
১০ই আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মনের মধ্যে বিকার উপস্থিত না হইলে, ধর্ম্মোৎসাহের শৈথিল্য উপস্থিত না হইলে, সজন উপাসনার প্রতি অনুরাগের অল্পতা সম্ভব নহে। একাকী ঈশ্বরোপাসনা করিলে মনে সুখ হয়, সেই সুখভোগে যিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সামাজিক উপাসনায় যোগ দেন না, তিনি পৃথিবীর নিষ্ঠুর লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত। যাঁহার শরীরে দয়া আছে তিনি সজন উপাসনাকে অবহেলা করিতে পারেন না। পাষাণে যাহার হৃদয় নির্ম্মিত সে ব্রহ্মমন্দিরে আসে না। যাহার দয়া ধর্ম্ম আছে সে দেবালয়ে আসিবেই আসিবে। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদ হউক, সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিতেই হইবে। বাহিরে চারিদিক সুবিধা হইলে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিব, আর যখন বাহিরে একটু দুঃখের সম্ভাবনা তখন একাকী ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিব, ইহা নিতান্ত স্বার্থপর নিষ্ঠুর ব্যক্তির কথা। অনেকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে ঘরে বসিয়া ব্রহ্মকে ডাকিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না? ইহার উত্তর—অল্প পাওয়া যায়, অনেক পাওয়া যায় না। সামাজিক উপাসনা কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা যদি সকলে জানেন তাঁহা হইলে ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত উপাসকমণ্ডলী

এক বাক্য হইয়া বলিবেন ঘরে বসিয়া পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হয় না। যদি হইত তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম কোন প্রবঞ্চক এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঈশ্বর ইহা নির্ম্মাণ করেন নাই এবং যত স্থানে যত ব্রাহ্মসমাজ আছে কোনটী ঈশ্বর স্থাপন করেন নাই, ব্রহ্ম নিজে ব্রহ্মমন্দির ও সামাজিক উপাসনার প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু একাকী ঘরে বসিয়া যথার্থ ধর্ম্ম সাধন হয় না, এইজন্য ঈশ্বর স্থানে স্থানে এক একটী মন্দির অথবা উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দয়া এবং ধর্ম্ম এক হইয়াছে সামাজিক উপাসনাতে। যদি দয়া ধর্ম্ম উভয়ই সাধন করিতে চাও তবে নিয়মিতরূপে প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা করিতেই হইবে।

যে স্বার্থপর হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, যাহার হৃদয় নিষ্ঠুর সে ধার্ম্মিক হইবে কিরূপে? যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, জগতের সেবা করিবার জন্য যাহার প্রগাঢ় ইচ্ছা, সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না। সে সবান্ধবে উপাসনা না করিয়া সুস্থির থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, এরূপ সুমধুর রীতি অবলম্বন না করিলে সে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সে স্বভাবতঃ এমন সকল উপায় অবলম্বন করে যদ্দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার হয়। এ সকল মন্দির দুঃখী পাপীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য। এ সকল মন্দিরে না আসিয়া যাহারা চুরি করিয়া ঈশ্বরের অমৃত পান করে, তাহাদিগকে স্বার্থপর নিষ্ঠুর বলিতে হইবে। ঘরে বসিয়া এক প্রকার নির্জন ধর্ম্মসাধন হয়; কিন্তু এ সকল প্রকাশ্য স্থানে, দয়া এবং ধর্ম্ম এই দুই রত্নই পাই। স্বাভাবিক সাধনস্রোতে জীবনকে ভাসাইয়া দিলে সামাজিক উপাসনায় যোগ

দিতেই হইবে। ঘরে বসিয়া নির্জনে উপাসনা করিলে ঈশ্বর অল্প পরিমাণে সুধা ঢালিয়া দেন; কিন্তু সাগর সমান যাঁহার হৃদয়, যাহা হইতে সুধা উথলিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তিনি আর কিরূপে ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকিবেন? তাঁহার সেই হৃদয়ের বেগ হইতেই সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের উন্নতি সাধন করিবার জন্য সকলের সঙ্গে সমস্বরে তিনি ব্রহ্মগুণ গান করেন। সামাজিক উপাসনার অন্য কোন অর্থ নাই। যাহারা বলে যখন আমরা নির্জনে উপাসনা করিয়া সুখী হই, তখন সামাজিক উপাসনার প্রয়োজন কি, তাহারা দয়া ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। যাঁহারা প্রেমিক দয়াবান্ এবং স্বভাবের অধীন তাঁহাদিগের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না। তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রেমের প্রবল বেগে মনুষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিয়া আর দশ জনের সঙ্গে একত্র হইয়া হরিপ্রেমসুধা পান করেন। পরের প্রতি প্রেম শুষ্ক হইলেই এই প্রশ্ন স্থান পায়।

পরকে অর্থ, জ্ঞান দেওয়া যদি উচিত হয়, তবে সর্ব্বাপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম দান করা কি শ্রেয় নহে? ধর্ম্ম দান করার ন্যায় শ্রেষ্ঠ দয়া আর নাই। আমাদের পূর্ব্ব-জীবনের দুরবস্থা এবং মনুষ্যের পাপ যতই স্মরণ হইবে ততই এই দয়া সহস্রধারে ধাবিত হইবে। যে সাধক স্বভাবের অধীন হইয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করেন, তিনি সামাজিক উপাসনায় যোগ দিয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করেন। ধর্ম্ম ছাড়া দয়া নাই, দয়া ছাড়া ধর্ম্ম নাই। প্রকৃত সাধক সামাজিক উপাসনার ইতিকর্ত্তব্যতা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাতে যোগ দেন না। তিনি স্বভাবতঃ মন্দিরে

আসেন। বাহিরের অবস্থা ভয়ানক প্রতিকূল হইলেও ঘোরতর ঝড় বৃষ্টি হইলেও, ভক্ত ঘরে বসিয়া থাকিতে পারেন না। বিঘ্ন বাধার দিন বরং তিনি আরও গভীরতর উৎসাহের সহিত সামাজিক উপাসনালয়ে আসিয়া ঘনতর উপাসনার সুখ ভোগ করেন। বাহিরে যত বিঘ্ন বিপদ এবং পরীক্ষা ভক্তের দয়া তত পরিমাণে অধিক বেগবতী। যাঁহারা পঁচিশ বৎসর একত্র উপাসনা করিয়াছেন, তাঁহারা কি একাকী উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন? ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহাদিগের হৃদয়ের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না। যাঁহাদিগের হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট তাঁহারা পরস্পরকে ছাড়িয়া মাতার ক্রোড়ে বসিতে পারেন না। সামাজিক উপাসনা জগদ্ধাত্রী পূজা। ভক্তেরা একত্র জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীর পূজা করিতে ভালবাসেন। কখন্ সকলে একত্র হইয়া সেই মাতার ক্রোড়ে বসিব, ভক্ত সর্ব্বদা সেই শুভক্ষণ প্রতীক্ষা করেন। একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করিলে যে রসাস্বাদন হয় ভক্ত কোন মতেই সেই রস হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না।

যাঁহারা বলেন একত্র উপাসনা না করিলেও হয় তাঁহারা বিকারের কথা বলেন, প্রকৃতির কথা ইহা নহে। উপাসনা ক্রমশঃ ঘনতর হয়। সবান্ধবে উপাসনা করিবার স্পৃহা ক্রমশঃ বলবতী হয়। সেই স্বভাব পরিহার করিতে পারা যায় না। স্থানান্তরে কিম্বা পরলোকে গমন করিলেও এই স্পৃহা নির্ব্বাণ হয় না। কেহ ঢাকা, কেহ বম্বে, অথবা কেহ পরলোকে চলিয়া যাউন না কেন, সেই যে তিনি একত্র উপাসনা করিয়াছেন তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিবেন না। ইহাতেই আমরা পরলোকে যে, একত্র হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে বসিব তাহার আভাস পাইতেছি। এই সামাজিক উপাসনা হইতেই আমরা আশা

করিতেছি যে পরলোকে গিয়াও আবার আমরা ব্রহ্মক্রোড়ে বসিব। অনেকে মনে করেন একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করা সমান্য ব্যাপার; কিন্তু বাস্তবিক সামাজিক উপাসনাতত্ত্ব অতি গুরুতর। সামাজিক উপাসনা স্বর্গের সোপান, সামাজিক উপাসনা প্রত্যেক সাধকের প্রাণধন; নিষ্ঠুরতা যদি তোমরা ছাড়িয়া থাক, যদি যথার্থই সত্যরাজ্য হইবে ইহা তোমরা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে দেখিবে যেখানে তোমরা থাক না কেন, সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিবার জন্য তোমাদের মন ব্যাকুল হইবে। আমরা যে অনুগ্রহ করিয়া সামাজিক উপাসনাস্থলে আসি তাহা নহে, অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ শুনিবার জন্য, কিম্বা কাহারও অনুরোধে সৌজন্য রক্ষার জন্য এখানে আসি তাহাও নহে। এখানে আসিয়া সকলে একত্র হইয়া উপাসনা না করিলে, আমরা বাঁচি না এইজন্য আমরা মন্দিরে আসি।

যদ্দ্বারা সকল ভাই ভগ্নী, ঈশ্বরের চরণতলে আশ্রয় পাইতে পারেন, যাহাতে সকলের মনে হরিনাম-রসের সঞ্চার হয় ভক্ত সেই সামাজিক উপাসনা ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সর্ব্বস্ব দিয়া এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভক্ত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে সামাজিক উপাসনা একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বর যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, ব্রাহ্মসাধক, জগতের জন্য তুমি কি করিলে? তখন তাঁহাকে কি বলিবে? অতএব বৃদ্ধ এবং যুবা ব্রাহ্মগণ, তোমরা সকলেই ঈশ্বরের নিকট একত্র বসিয়া দয়া চরিতার্থ কর। পয়সা একটীও দিতে হইল না, বিনা মূল্যে ভবসাগর পার হইতেছ। তোমরা একটু সদয় হইয়া একত্র উপাসনা করিলে দুই শত লোক বাঁচিয়া যাইতে পারে। তবে আর কেন তোমরা এমত স্বর্গীয় কার্য্যে

বিরত থাকিবে? আর কিছুই করিতে হয় না, কেবল তোমরা একত্র হইয়া এক একবার ভক্তিভরে হরিনাম গান করিবে, আর তোমাদের মুখনিঃসৃত সেই সুধামাখা নাম শুনিয়া কত পাপী তরিয়া যাইবে। যাহাতে ঈশ্বরের নামরসে অনুরাগী হইয়া দশ পাঁচটী লোক ব্রহ্মের ঘরে আসিতে পারে এমন উত্তম কার্য্যে কেন তোমরা শিথিল এবং উৎসাহ-বিহীন থাকিবে? শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে ব্রহ্মরাজ্য বিস্তৃত হয় তজ্জন্য তোমরা প্রাণ মন সমর্পণ কর। তোমরা সকলে প্রেমে মত্ত হইয়া এমনই ভাবে সামাজিক উপাসনা কর যাহাতে সমস্ত পৃথিবী আমাদের প্রাণের হরিকে ডাকিয়া কৃতার্থ হয় ও মুক্তি লাভ করে।

ব্রহ্মদর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক।

সায়ংকাল, রবিবার, ২৬শে শ্রাবণ, ১৮০১ শক;
১০ই আগষ্ট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

রোগ প্রতীকারের জন্য চিকিৎসা করা, ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক রোগীর সেবা করিবার জন্য কত নিগূঢ় বিষয় জানিতে হয়, কত উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, কত পরিশ্রম ও পুস্তক পাঠ করিতে হয়। এত পরিশ্রম, এত যত্ন, এত বিদ্যা বুদ্ধি এ সকলের শেষ ফল কি হইল,—রোগের প্রতীকার, রোগীর আরোগ্য। আরোগ্য শব্দের অর্থ কি? রোগ হইতে মুক্তি। রোগ হইতে মুক্তি আরোগ্য, ইহার সহজ ভাষা, শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন; যে বিকৃতি হইয়াছিল তাহা ঘুচাইয়া প্রকৃতিকে পুনঃপ্রকাশ। আরোগ্যে

অস্বাভাবিক স্বাভাবিক হইল। এত যত্ন পরিশ্রমের ফল হইল শরীরের স্বভাব। শরীরের যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহাই হইল। এ দিকে আত্মা সম্বন্ধেও অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকা পাপ, মোহ, অবিশ্বাস, আসক্তি; স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা উন্নতি, ধর্ম্ম শান্তি। চিত্তবিকারের নাম নরক, প্রকৃতিতে অবস্থিতির নাম স্বর্গ। ধর্ম্মসাধন প্রণালীর অর্থ কি, অভিপ্রায় কি? বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ করা। পৃথিবীর যত লোক অস্বাভাবিক বিকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, প্রকৃতি ঘুচাইয়া বিকৃতি আনয়ন করিতেছে, বিকারের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছে, উপাসনা যোগ ধ্যান সাধুসঙ্গ প্রভৃতি তাহাদিগকে সেই বিকৃতি হইতে প্রকৃতির পথে আনয়ন করিবার জন্য।

ধর্ম্মের দ্বারা কি হয়? মনুষ্যেরা সত্যের পথে ঈশ্বরের পথে আগমন করে। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, আমরা স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করি। এখানে কঠোর ভাষা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই, সহজে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলে রোগ। ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইলে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সহজ হইল। ঈশ্বরদর্শন শক্ত, আদেশ শ্রবণ শক্ত লোকে মনে করে, ফলে শক্ত নহে। দর্শন শ্রবণ স্বাভাবিক। কাণা ও বধির দেখিতে শুনিতে পায় না, কিন্তু তদ্ভিন্ন কে দর্শন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে? শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সহজে দেখে সহজে শুনে। দেখা শুনা ভয়ানক ব্যাপার নহে। বল, কে দেখা শুনা সহজে সম্পন্ন করিতে পারে না? শরীর এমনই গঠিত, মনুষ্য চক্ষু খোলে আর অমনই দেখিতে পায়। অন্ধ হইলে লোকে দয়া করে, চক্ষু আছে বলিয়া কেহ প্রশংসা করে না। দর্শন জন্য

গৌরব দেয় কে? চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য দেখে তাহাতে তাহার পুরস্কার কি, গৌরব কি? চক্ষুর যেমন সেখানে গৌরব নাই, তেমনই শব্দ শুনিতেও কর্ণের গৌরব নাই। কর্ণের শব্দ শ্রবণ প্রশংসার বিষয় নহে। যাহা স্বাভাবিক সহজ, কে তাহাতে গৌরব দিতে চায়? শরীর সম্বন্ধে দর্শন শ্রবণ যেমন সহজ, আত্মা সম্বন্ধে তদ্রূপ হওয়া উচিত। শারীরিক চক্ষু যদি দেখিতে না পায়, যাহাতে দেখিতে পাই তজ্জন্য চিকিৎসকের শরণাগত হই। চিকিৎসা প্রণালী আর কিছু নহে চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করা। অনেক ঔষধ অনেক পরিশ্রম, শেষে এই ফল হয় যে, রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন। বিকার ঘুচিয়া গেলে চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরায় দেখিতে পায়। আত্মা ব্রহ্মদর্শন করিবে তাহাতে কঠোর উপায় অবলম্বন, শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি কি প্রয়োজন? আর কিছুর প্রয়োজন নাই কেবল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা চাই। আত্মাকে স্বাভাবিক পথে আন, দেখিবে সকলই সিদ্ধ হইবে। চেষ্টা কর, আয়োজন কর, অধ্যবসায় নিয়োগ কর, সাধন কর, কিন্তু এ সকল স্বাভাবিক প্রণালীতে নিযুক্ত কর।

হে ব্রাহ্ম কল্পিত পথে যাইও না। স্বাভাবিক সহজ প্রণালী অবলম্বন কর, চক্ষু খুলিবে আর তৎক্ষণাৎ দেখিবে। নিমেষ মধ্যে ব্রহ্মদর্শন না হইল ত হইল না। হৃদয় বিকারগ্রস্ত, যদি ব্রহ্মের গম্ভীর বাক্য শ্রবণ করিতে না পাও, নূতনবিধ শাস্ত্র বুঝিতে না পার, সহস্র উপদেশ শুনিয়া তোমার কি হইবে, তোমার শ্রবণশক্তি এখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তোমার কর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে কত উপদেশ শুনিতে পাইবে। ঈশ্বরের বাণী নিয়ত আসিতেছে, নিয়ত তিনি আদেশ করিতেছেন। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, গভীর নিশীথ, কোন্

সময়ে তিনি কি বলিবেন কে জানে? যাহাতে পরব্রহ্মের আদেশ ও উপদেশ সহজে বুঝিতে পার তজ্জন্য প্রস্তুত হও। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আমাদিগের ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইতে পারে না। যে পথ অস্বাভাবিক, ব্রাহ্ম কখনও সে পথে যান না। শরীর যদি শীতল বায়ু চায়, তাহা স্বাভাবিক প্রণালীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রেমের শীতল বায়ু লাভ করাও আত্মার পক্ষে তেমনই স্বাভাবিক। সমুদয় অভাবগুলির পূরণ স্বাভাবিক প্রণালীতে হইবে, ইহাতে বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত ধর্ম্ম আড়ম্বরশূন্য। ইহার সাধন সহজ, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই সহজ। বহু কষ্টে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয় না।

আমাদিগের মধ্যে এখনও ধর্ম্ম ঔষধ সেবনের ন্যায় হইয়া আছে। ফলতঃ এখনও আমাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। কঠিন উপধর্ম্ম এখনও রহিয়া গিয়াছে, যে বস্তু আমরা চাই এখনও তাহা প্রাপ্ত হই নাই। যথার্থ বস্তু না হইলে ধর্ম্মসাধন কঠিন থাকিবেই। নিরবলম্ব উপায়ে ধ্যান করিতে হইবে। এখনও ধ্যান অত্যন্ত কঠোর হইয়া আছে। এরূপে কখনও ধ্যান অভ্যাস হইবে না, ধ্যান করিতে গিয়া সংসারের চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। যথার্থ ধ্যান করিতে অনেক সময় লাগে, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান বহু আয়াসসাধ্য, সহজে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায় না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধ করিয়া যোগ করিতে হয়, যথার্থ ব্রহ্মযোগী এরূপ কখনও বলেন না। যথার্থ যোগী যখন যোগ সাধন করিতে থাকেন, তখন তিনি পৃথিবী হইতে দশ হাত ঊর্দ্ধে উঠেন। মন্দিরে আমরা একত্র হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলি, কিন্তু এক "সত্যং" উচ্চারণ

করিব' মাত্র তৎক্ষণাৎ যোগীর আত্মা এক শত ক্রোশ উপরে চলিয়া যায়।

তুমি যদি বল বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় সাধন করিতে হয়, তবে যোগে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, এ কথা ঠিক নয়। এ কথা অন্যান্য ধর্ম্মে সাজে। বহু আড়ম্বর, বহু উপায়, বহু সাধন, বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ফল কেবল কষ্ট। ব্রহ্মকে এরূপে লাভ করা যায় না, সুতরাং এরূপ পথ অবলম্বন অসঙ্গত। জলে নামিলেই যেমন তাহাতে মগ্ন হওয়া যায়, পক্ষী যেমন অনায়াসে উপরে উঠে, আত্মার ব্রহ্মে নিমগ্ন হওয়া, মানসপক্ষীর ঊর্দ্ধে উঠা তেমনই সহজ। উড়িতে ডুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। স্বভাবের ধর্ম্ম স্বীকার করিলে, অনায়াসে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কিছু অস্বাভাবিক নাই। যোগ ব্রহ্মদর্শন সহজ, অন্যথা দু বৎসর চিন্তা করিয়াও কেহ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না।

কঠোর চেষ্টাতে স্বভাবকে ছাড়িয়া যাওয়া হয়। কষ্টে সাধন, প্রকৃতির ফল নয়। সে ফল প্রকৃত ফল নয়, সে প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী নয়। অন্য ধর্ম্মে এ সকল অস্বাভাবিক প্রণালী অনুসরণ শোভা পায়, কিন্তু এই মন্দিরে যাঁহারা উপাসক, তাঁহাদিগের নিকট দর্শন, বস্তু স্পর্শ, প্রার্থনা এবং তাহার সদুত্তর শ্রবণ যদি সঙ্গে সঙ্গে না হয়, তবে সংশয় হয় এ সকল প্রকৃত নহে কল্পনা, কেবল টানিয়া মন হইতে বাহির করা। প্রকৃতিস্থ থাকিলে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ হয়। সর্ব্বদা সাবধান হও, অস্বাভাবিক বস্তুর জন্য কখনও প্রয়াস করিও না। স্বভাবতঃ ব্রহ্মকে দর্শন কর, সমুদয় বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সহজ পথে আসিতেছ কি না দেখ। শরীরকে প্রকৃতিস্থ কর মনের

পাপ, কুসংস্কার, মিথ্যা চিন্তা দ্বারা মন চঞ্চল না হয় এজন্য স্বভাব দ্বারা পাপকে জয় কর, দেখিবে অতি সহজে যোগী হইবে। এক মিনিট বসিয়া দেখ দর্শন হয় কি না? এক মিনিটে দর্শন হইল ত হইল, নতুবা দুই পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়াও বিকার না ঘুচিলে কিছু হইবে না। স্বভাবতঃ অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারা যায় অঙ্গ প্রকৃতিস্থ কি না? হৃদয় প্রকৃতিস্থ কি না স্বভাবের নিকটে তাহার মীমাংসা।

অনেক চিন্তা অনেক ক্রন্দন ইহাতে কিছু হয় না। যদি অর্দ্ধ ঘণ্টা সরল প্রার্থনা হয়, চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ হইল, ফল তৎক্ষণাৎ হইবে। ব্রহ্মদর্শন যখন হয়, তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়, অন্যথা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর আছেন, এই বক্ষে আছেন, প্রেরিত মহাজন-গণকে রক্তের ভিতরে দেখিতেছি, এরূপ সহজাবস্থা ভিন্ন সুখ হয় না। বহু আয়াস চেষ্টাতে শান্তি হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্ম আড়ম্বরশূন্য। স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে থাক, যাহা কঠোর তাহার অন্বেষণ করিও না। পিতার প্রতি সন্তানের, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা সহজ, অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আর তাহা আয়ত্ত করিতে হয় না। কর্ণ পাতিয়া শুন ঈশ্বর কি বলিতেছেন। এ কথায় যে ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া অস্বীকার করিল, তাহার কর্ণ আছে কে বলিতে পারে? যদি কর্ণ থাকে, যেমন শুনিবে অমনই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। চক্ষুকে স্বাভাবিক কর, দেখিবে কেমন তাঁহাকে বাহ্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়।

ব্রাহ্মের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, অথচ সে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, তাহার সমুদয় বৃত্তি স্বাভাবিক আছে অথচ ধর্ম্ম সঞ্চয়

করিতে পারে না, ইহা হইতে পারে না। তাহার সমুদয় বৃত্তি বিকৃত হইয়াছে, চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু বিকৃত প্রণালীতে চিকিৎসা করিও না। প্রকৃতিস্থ করিতে শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন দিন হইবে, যে দিন জল পান করার ন্যায়, ভাত খাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সহজ হইবে। কখনও সহজ ভাব ছাড়িব না। যদি সহজে শুনিতে না পাই, চিকিৎসার অধীন হইব, কিন্তু যোগ ধ্যান কঠিন বলিব না। ত্রিশ বৎসর কঠোর সাধন করিয়া ধ্যান করিবে ইহা কঠিন, ইহাকে বিফল যোগ বলি। প্রকৃত ধ্যান তাহাকে বলি, যাই চক্ষু বন্ধ অমনই প্রাণ ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল। যদি তোমাকে কতকক্ষণ চেষ্টা করিতে হয়, সংসারে চলিয়া যাও, তোমার ধ্যান হইল না। চেষ্টা কি জানি না। জলে নামিলাম আর ডুবিলাম। চেষ্টা করিব, যোগ করিব, প্রেম সঞ্চয় করিব, ইহা হয় না। চেষ্টা করা পাপ, কঠোর যোগ সাধন অপরাধ। সেই ব্রাহ্ম মূর্খ যে চেষ্টা করে, সেই ব্রাহ্ম অপরাধী যে কঠোর সাধন করে। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঁচ মিনিট চেষ্টা করিতে হয়, তখন সংশয় হইবে হৃদয় বিকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মযোগী বিলম্ব করেন না, পরিশ্রম করেন না, যোগানন্দ সম্ভোগ তাঁহার নিকটে জল পান করার ন্যায় সহজ। যেমন তিনি বসিলেন তৎক্ষণাৎ যোগ হইল, তাঁহাকে কষ্ট করিতে হইল না, চেষ্টা করিতে হইল না। সন্তরণ শিখিতে চাও, গা ছাড়িয়া দাও, সহজ অবস্থায় সন্তরণ শিখিতে পারিবে। যদি সন্তরণে আয়াস প্রকাশ করিয়া জলে আঘাত কর, সন্তরণ করিতে পারিবে না, জলমগ্ন হইয়া যাইবে। যদি যোগী হইতে চাও, আপনাকে সহজাবস্থায় ছাড়িয়া দাও, টানাটানি

করিয়া কিছু হইবে না। সহজাবস্থায় আপনাকে ছাড়িয়া দিলে ফল লাভ হইবে, ব্রহ্ম তোমার বক্ষে সহজে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবেন। হে মনুষ্য, আধ্যাত্মিক অবস্থা সহজ এবং স্বাভাবিক। শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রকাণ্ড যোগের ব্যাপারও সহজ। সহজ অবস্থায় থাকিয়া সহজ উপায় অবলম্বন কর, সমুদয় বিকৃত পরিশ্রম দূর করিয়া দাও। জলে নামিলে যেমন সহজে ডোবা যায় তেমনই ব্রহ্মেতে ডুবিতে পারিবে, পক্ষীর ন্যায় সহজে উর্দ্ধে উড়িয়া যাইবে। সহজ পথে চল, স্বভাবের উপর নির্ভর কর, ঈশ্বর তোমাকে, আশ্চর্য্য সুধা পান করাইবেন।